তফসীরে আইনী

আমপারা

মাওলানা হাফেয শায়খ
আইনুল বারী আলিয়াবী

2018

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমার উপরে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যাতে প্রত্যেক বিষয়েরই বর্ণনা আছে আর আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পিত ব্যক্তিদের জন্য সুপথপ্রাপ্তি ও (আল্লাহ্র) করুণার উপাদান এবং সুসংবাদও আছে (সূরা নাহ্ল, ৮৯ আয়াত)।

তফসীরে আইনী

আমপারা—প্রথমার্ধ

মূল উর্দু

মোজাদ্দেদ ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ)

বাংলা তরজমা ও সংযোজনায়

মাওলানা হাফেয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী

সিনিয়র অধ্যাপক কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া এবং সম্পাদক আহলে হাদীস মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা

এম.এম. ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট, রেকর্ড, ডিপ. ইন উর্দু ফাষ্ট ডিভিশন ফাষ্ট, রেকর্ড প্রাইজ ও স্কলারশিপ প্রাপ্ত, এম. এ.

http://islaminonesite.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

উৎসর্গ

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সব আমল তাথেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে যায়, কিন্তু তিনটি নয়। তা হল সদাকায়ে জা-রিয়াহ, কিংবা এমন বিদ্যা যদ্বারা উপকার পাওয়া যায় অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দোআ চায় (মুসলিম, মেশকাত, ৩২ পৃষ্ঠা)।

আজ ১৪ই রমাযান ১৪০১ হিজরী থেকে ৯৬ বছর ২ মাস ৬ দিন আগে ১৩০৫ হিজরীর ৮ই রজব হতে ৩রা শাবান পর্যন্ত মাত্র ২৫ দিনে সুদীর্ঘ ২২২ পৃষ্ঠা সম্বলিত আমপারার উর্দু তফসীর 'তরজমা-নুল কোরআন বেলাতা-য়েফিল বায়ান' লিখে যিনি উপকারী বিদ্যা হিসাবে ভারতের উর্দুভাষী ভায়েদের জন্য অনুপম সওগাত রেখে যান, অখণ্ড ভারতের সেই মহামনীষী, আরাবী বর্ণমালার প্রতি বর্ণে কমপক্ষে একখানা বই লিখে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী ও বিশ্বের লেখনী জগতে ভারতের মুখ উজ্জ্বলকারী মহাবিদ্বান **ইমাম নওয়াব সিদ্দীকী হাসান খান** (রহঃ) এর রূহের শান্তি ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য এবং এই আমলের কাণ্ডালের পরকালের পাথেয় স্বরূপ "তফসীরে আইনী" সাদাকায়ে জা-রিয়াহ-দানকারী আল্লাহ্‌র দরবারে উৎসর্গিত হল।

রব্বানা তাকাব্‌বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্ সামীউল আলীম

মোর এই নগণ্য কীর্তি স্মরণ করাবে মম স্মৃতি
তাই মম অগোচরে দুআ করিও মোর তরে।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অনুবাদকের আরয

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ، اَلصَّلٰوةُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَرِضْوَانُ اللّٰهِ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُبَلِّغِيْنَ ، وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَى الْمُفَسِّرِيْنَ لِلْكِتَابِ الْمُبِيْنِ وَعَلَى الْمُتَّبِعِيْنَ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذِى الْعَرْشِ الْمَكِيْنِ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ مَعَ الْاَرَضِيْنَ وَالْحَسْرَةُ عَلَى الْغَافِلِيْنَ عَنِ الْقُرْاٰنِ الْمُبِيْنِ وَوَفَّقَنَا وَاِيَّاهُمُ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ، بِمَا يُحِبُّ وَيَرْضٰى مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ ، اَمَّا بَعْدُ :

যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তারা মুসলিম খেতাবধারী। আরাবী মুসলিম শব্দের শাব্দিক অর্থ আত্মসমর্পিত। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, মুসলমানরা কার কাছে আত্মসমর্পিত? সোজা কোথায় উত্তর হল যে, ইসলামী-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানই ধর্ম্মের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পিত। যে ব্যক্তি কারো কাছে নিজেকে সঁপে দেয় তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলতে কিছুই থাকে না। তাই কোন মুসলমানই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া এক পা-ও নড়তে পারে না। এইজন্য মহানবী (সঃ) মোমেনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْاَنِفِ حَيْثُ مَا قِيْدَ انْقَادَ অর্থাৎ মোমেনের উদাহরণ কেবল ঐ উটের মত যার নাকে লাগাম দেওয়া আছে। তাকে যেদিকেই টানা হয় সে সেইদিকেই বশীভূত হয় (ইবনে মাজা, ৫ পৃষ্ঠা)।

এখন প্রশ্ন হল যে, মোমেনের ঐ লাগাম কি? বিশ্বনবীর এই ঘোষণা : تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, মোমেনের ঐ লাগাম কোরআন এবং হাদীস। সুতরাং

* আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ ছেড়ে দিয়ে গেলাম। যতদিন তোমরা ঐ দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা দিশেহারা হবে না। তা হল আল্লাহ্‌র কেতাব এবং তাঁর রসূলের পদ্ধতি (মোআত্তা ইমাম মালেক, মেশকাত, ৩১ পৃষ্ঠা)।

http://islaminonesite.wordpress.com

যিনি মুসলমান তার নাকে লাগানো রয়েছে কোরআন ও হাদীসের লাগাম। তাহলে কোন মুসলমান কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে কি? না কখনই না। তাই কাজ চালানো মত কোরআন ও হাদীসের কিছু জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুসলমানেরই জন্য অপরিহার্য এবং অবশ্য কর্তব্য।

কোরআন ও হাদীসের ভাষা যেহেতু আরাবী সেহেতু আরাবী না-জানা লোকেরা কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য নিজ মাতৃভাষায় ওদের অনুবাদ ও তর্জমার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ওদের অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। প্রায়ই মুসল্লী নামাযে আমপারার সূরাগুলো পড়ে এবং অর্থ না জানার কারণে তোতাপাখীর বুলির মত তা আওড়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি ওগুলোর অর্থ জানতে পারে তাহলে তা পড়ার সময় তাকে খুব মজা লাগে। সুতরাং কমপক্ষে আমপারার কিছু সূরা মুখস্থ করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য এবং ওর অর্থ জানা উত্তম কার্য। এই উত্তম কাজে সহযোগিতার জন্য সহজ ও সরল বাংলায় আমপারার তর্জমা ও তফসীর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উক্ত বাঞ্ছনীয় কর্তব্যেরই ফলশ্রুতি আপনার হাতের এই "তফসীরে আইনীটি"। এই তফসীরটি হিজরীয় তের শতকের মোজাদ্দেদ, বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী ভারতীয় মহামনীষী ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) রচিত অতুলনীয় উর্দু তফসীর "তরজুমা-নুল কুরআ-ন বিলাতা-য়িফিল বায়ান" এর আমপারা খণ্ডের প্রথমার্ধের বঙ্গানুবাদ।

তফসীরটির গুরুত্ব: কোরআনের তফসীর লেখার পদ্ধতি দু-রকম। এক, কোআনের তফসীর কোরআনেরই কোন আয়াত দিয়ে অথবা মহানবীর হাদীস দিয়ে। দুই কোরআনের তফসীর ব্যক্তিগত যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে (তফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন: من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের রায় দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা করে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিক (তিরমিযী, মেশকাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)। সুতরাং দ্বিতীয় পদ্ধতি পরিত্যাজ্য। তথাপি তফসীর বির রায় বাজারে বেশ কিছু পাওয়া যায়। প্রথম পদ্ধতি অবলম্বনে আজ পর্যন্ত যত তফসীর লেখা হয়েছে তন্মধ্যে বিশ্বজনপ্রিয় এবং জগবিদ্বখ্যাত তফসীর হাফেয ইবনে কাসীর (মৃত, ৭৭৪ হিঃ) রচিত তফসীর ইবনে কাসীর এবং তারপরে ইমাম শওকানী (মৃত, ১২৫০ হিঃ) প্রণীত তফসীর ফাতহুল কাদীর। বর্তমানে উক্ত তফসীর দুটি মদীনা শরীফের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরআন ও হাদীস কলেজের বিভিন্ন ক্লাশে সিলেবাস হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। অতঃপর উক্ত দুই তফসীরের উপর ভিত্তি কোরে এবং অন্যান্য অনেক তফসীর মন্থন কোরে বহু অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করতঃ এই উপমহাদেশের বহুমুখী মনীষী ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত, ১৩০৬ হিঃ) একটি তফসীর লেখেন আরাবীতে, ১০ খণ্ডে

প্রায় ৫ হাযার পৃষ্ঠায়। তার নাম ফতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কোরআন। এই তফসীরটির তত্ত্বগুণে মুগ্ধ হোয়ে উসমানী খেলাফতের বাদশাহ সুলতান আবদুল হামীদ খান ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানকে ২নং মজীদী মেডেল দান করেন (মাআ-সেরে সিদ্দীকী, ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)। অতঃপর উক্ত নওয়াব সাহেব নিজেই তফসীর ইবনে কাসীর এবং স্বীয় ফতহুল বায়ানের সারাংশ লেখেন উর্দুতে, ১৫ খণ্ডে প্রায় ২ হাযার পৃষ্ঠায় যার নাম দেন তরজুমানুল কোরআন বিলাতা-য়িফিল বায়ান। এই তফসীরটি সম্পর্কে কোন সুক্ষ্মদর্শী মন্তব্য করেন এ বলে: گویا کوزے میں سمندر بھر دیا অর্থাৎ ডাবরের মধ্যে যেন সাগর ভরে দিয়েছেন। এই ডাবরে ভরা সাগরটির আমপারা খণ্ডের অনুবাদ আমি আহলে হাদীস পত্রিকার ১ম বর্ষের ৭ম / ৮ম যুগ্মসংখ্যায় ১৯৭৩ সালের জুনে শুরু করি এবং সুদীর্ঘ ৭ বছর ৩ মাস ধরে ধারাবাহিক তর্জমা কোরে পত্রিকার ৮ম বর্ষের ১০ম সংখ্যায় ১৯৮০ এর আগষ্টে শেষ করি— ফলিল্লা-হিল হামদ! অতঃপর ফী সাবীলিল্লাহ এটাকে একবার ছাপবার জন্য পঃ বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলে হাদীসকে অনুমতি দিই।

ফাণ্ডের ব্যবস্থাকরণ প্রসঙ্গ: তারপর গুণের সমাদরকারী অনেক পাঠকের তরফ থেকে ঐ অনুবাদিত তথ্যগুলো বই আকারে ছাপাবার অনুরোধ-উপরোধ আসতে থাকায় ওটাকে গ্রন্থের রূপ দেওয়ার চেষ্টা নিতে থাকি। এমনই সময় করুণাময়ের অপার কৃপায় মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার আহলে হাদীস ভায়েরা বেলডাঙ্গা থানা জমঈয়তে আহলে হাদীসের তরফ থেকে বইটি ছাপাবার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় পঃ বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় জনাব আঃ কাইয়ুম খান সাহেব এবং আমি বেলডাঙ্গা থানা জমঈয়তের মিটিংয়ে ১৫ই জুন ১৯৮০ শরীক হই এবং তফসীরটি ছাপবার জন্য বেলডাঙ্গা থানার জামাআতী ভায়েদের ৯ হাযার টাকা চাঁদা তুলে দেবার অনুরোধ জানাই। তারা আমাদের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে ১০ হাযার টাকা চাঁদা তুলে দেন। ফলে তফসীরটির প্রথমার্ধ আজ প্রকাশ পেল। আমাদের সবার মেহনত কিছুটা সার্থক হল। আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে আরো দ্বীনী কাজের তওফীক দিন—আমিন!

প্রথমার্ধ কেন: প্রথমে অনুমান ছিল যে, গোটা আমপারার তফসীরটি আড়াই শো পৃষ্ঠার কিছু কম বা বেশী হবে। কিন্তু ছাপার সময় কোরআনের সূরা এবং তফসীরের উদ্ধৃতিগুলো আরাবীতে দেওয়ায়, কতিপয় সূরার উচ্চারণ বাংলাতে দেওয়ায় এবং কিছু তথ্য সংযোজন হিসেবে যোগ করায় তফসীরটির কলেবর ৪০০ পৃষ্ঠারও বেশী হতে চায়। তাই আমাদের ফাণ্ড এবং পাঠকদের ক্রয়-সংগতির দিকে লক্ষ্য রেখে বইটিকে দুভাগে ভাগ করতে বাধ্য হই। ফলে চলতি রমাযানে তফসীরটির প্রথমার্ধ বের হল এবং দ্বিতীয়ার্ধ যত জলদি সম্ভব বের করা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা রইল ইন-শা-আল্লাহ!

http://islaminonesite.wordpress.com

আয়াতের বাংলা-উচ্চারণ কেন: বর্ত্তমান নাস্তিকতার যুগে আল্লাহ্‌র রহমতে যখন কোন নাস্তিকের সুমতি হয় এবং নামাযের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায় তখন বাল্যকালে আরাবীতে কোরআন পড়ার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি নামায পড়তে চরম অসুবিধা বোধ করেন এবং বাংলা উচ্চারণ সম্বলিত কোরআন খোঁজ করতে থাকেন। তাই ঐসব ভায়েদের সাময়িক অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কাজ চালানো মত কতিপয় সূরার বাংলা উচ্চারণ এই তফসীরে দেওয়া হল। তবে এ প্রসঙ্গে এটাও জেনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর কোন ভাষার সঠিক উচ্চারণ অন্য ভাষায় সব জায়গায় সম্ভব নয় বলে আরাবী আয়াতের বাংলা-উচ্চারণের উপর সব সময় ভরসা করা মোটেই চলবে না। তাই যত শীঘ্র সম্ভব আরাবী উচ্চারণে কোরআন পড়া অভ্যাস করতেই হবে। অনেক সময় উচ্চারণ ভুলের কারণে এবং টানটোনে কমবেশী হওয়ার দরুণে একটি শব্দের অর্থ আকাশ-পাতাল ফারাক হোয়ে যায় এবং ঐ ভুল-পাঠক কাফেরের পর্যায়েও পৌঁছে যায়। তাই আরাবী-ফার্সী শব্দের বাংলা উচ্চারণগুলো সাধ্যমত চলনসই করার জন্য এই উপমহাদেশের দুই রত্ন ডঃ মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি অনুসৃত 'ফারহাঙ্গে রব্বানীতে' ব্যবহৃত-উচ্চারণের অনুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে 'নামায' যাকাত, রোযা, অযু, রমাযান ও হযরত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে প্রচলিত বানান অনুযায়ী 'জ' বর্ণ না দিয়ে 'য' বর্ণ দিয়ে লেখা হয়েছে। এবং টানগুলো বোঝাবার জন্য দীর্ঘ ঈকার (ী), দীর্ঘ ঊ কার (ূ) ও ড্যাস (—) ব্যবহার করা হয়েছে। আরাবীর 'আয়েন' অক্ষর বোঝাবার জন্য কোন কোন বর্ণের উপরে ডানদিকে কমা (,) দেওয়া হয়েছে।

ভাষা প্রসঙ্গে: বর্ত্তমান পৃথিবীর সব ভাষারই এখন সহজ, সরল ও কথ্যভাষার যুগ। তাই যুগের সাথে তাল রেখে আমি এই তফসীরে আরাবী সাহ্‌লে মুমতানার মত অতি সহজ, সরল ও কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছি। বাঙালী মুসলমানদের ভাষায় আরাবী-ফারসী শব্দ বহুল প্রমাণে ব্যবহৃত হয়। যার প্রতিফলন কলকাতার দৈনিক পত্রিকা যুগান্তর, আনন্দ বাজার ও আজকালে দিন দিন বাড়ছে। তাই আমি বাংলাভাষার বিপ্লবী কবি, কাব্যে আমপারার সার্থক অনুবাদক কাযী নযরুল ইসলাম এবং রম্যরচনায় অনন্য বাকশৈলীর দীপালী সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুকরণে আরাবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলা শব্দ বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে ব্যবহার করেছি।

অনুবাদ সম্পর্কে: নওয়াব সাহেবের তফসীরে সন্নিবিষ্ট কতিপয় আরাবী ও ফারসী কবিতা ছাড়া বাকি সমস্ত তথ্যই আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি। কিন্তু কোরআনী আয়াতের তাঁর কৃত তর্জমার অনুবাদ আমি না কোরে ১৫ খানা উর্দু ও বাংলা তর্জমা সামনে রেখে এবং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটিয়ে আয়াতগুলোর তর্জমা করেছি। যে কোন বিষয় তর্জমা করার ব্যাপারে আমি পারতপক্ষে আক্ষরিক অনুবাদের পক্ষপাতী। প্রয়োজনবোধে বন্ধনীর মধ্যে দুচারটি কথা বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়টি আরো

পরিষ্কার করারও ধ্বজাবাহী। তবে কোন জায়গায় যদি আক্ষরিক অনুবাদ আদৌ সম্ভব না হয় তাহলে অগত্যায় ভাবানুবাদ করতে আমার নেই কোন আপত্তি। আয়াতের তর্জমার ব্যাপারে আমার মানসগুরু ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (রহঃ) অনুকরণে ক্ষেত্রবিশেষে কোন বিষয় পরিষ্কার করার জন্য বন্ধনীর মধ্যে কিছু শব্দ বাড়িয়ে আমি অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তফসীরের মধ্যে উদ্ধৃতি হিসেবে যেসব আয়াত এসেছে ওগুলোর সূরার নাম এবং আয়াত নম্বর নওয়াব সাহেব দেননি। আমি তা দিয়ে দিয়েছি। বাংলা অনুবাদের তফসীরের মধ্যে কিছু উপশিরোনামাও আমি তৈরী কোরে দিয়েছি, যা নওয়াব সাহেবের উর্দু তফসীরে ছিল না।

সংযোজনের কারণ: আমরা তফসীরটি ছাপবার যখন মনস্থ করি এবং আহলে হাদীস পত্রিকায়ও তা প্রকাশ করি তখন আমার সম্পর্কে সুধারণা পোষণকারী কিছু শিক্ষাবিদ আমাকে অনুরোধ করেন যে, ঐসাথে আপনি কিছু সংযোজনও করে দিন। ফলে তাঁদের পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত মনে করায় আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে আরাবী, উর্দু ও বাংলা ২৫ খানা তফসীর যোগাড় করি এবং আমার সীমিত জ্ঞান মোতাবেক ঐসব রত্নাকর থেকে তত্ত্বপূর্ণ তথ্যের মনিকাঞ্চন চয়ন কোরে তফসীরটিকে সমৃদ্ধ করার যথাসাধ্য মেহনত করি। যেসব তফসীর থেকে সংযোজনের তথ্য আমি আহরণ করেছি তাদের সবারই তালিকা প্রমাণপঞ্জীতে দিয়েছি।

তফসীরটির নামকরণ: নওয়াব সাহেবের উর্দু তসীরটির নাম খাঁটি আরাবী এবং নামটিও বেশ বড়। অনুবাদ গ্রন্থের ঐ একই নাম রাখলে একজন বাঙালী পাঠক বুঝতেই পারবেন না যে, এটা আরাবী তফসীর, না উর্দু বা বাংলা। তাই তফসীরে সানায়ী, তফসীরে হাক্কানী ও তফসীরে মাজেদী প্রভৃতির অনুকরণে আমি এই অনুবাদগ্রন্থের নাম দিয়েছি তফসীরে আইনী!

ছাপার ভুল: এই তফসীরের প্রায়ই অংশের প্রুফ আমি নিজে ২/৩ বার কোরে দেখেছি এবং কখনো কখনো সফরে যাওয়ার ফলে, কোন কোন প্রুফ আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। সেজন্য কোন কোন জায়গায় ছাপার ভুল কিছু কিছু থেকে যেতে পারে। তবে তেমন কোন মারাত্মক ভুল আমার নজরে পড়েনি। তাই শুদ্ধিপত্র দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমার জ্ঞানমতে তথ্যের কোন ভুল এতে নেই। কিন্তু মহানবী (সঃ) বলেন, প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারা নিজের ভুল স্বীকার করে যারা (তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী, মেশকাত, ২০৪ পৃষ্ঠা)। সুতরাং মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। যেমন তফসীর লিখতে গিয়ে ভারত-পাকের নিম্নোক্ত তিন বিদ্বান মারাত্মক ভুল কোরে ফেলেছেন। (১) জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদূদী (রহঃ) তদীয় তফসীরে সূরা তা-হার ৬৬নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে "মিন সিহ্‌রিহিম" من سحرهم শব্দ দুটি বাদ দিয়ে ফেলেছেন (তাফহীমুল কোরআন,

http://islaminonesite.wordpress.com

আমপারা, ২৯৮ পৃষ্ঠা, জে, কে, প্রেস, দিল্লী ছাপা, মার্চ ১৯৭৩ সংস্করণ)। (২) শাহ আবদুল আযীয মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তদীয় তফসীরে সূরা ইউনুসের ৯০নং আয়াতের বরাত দেবার সময় একটি শব্দ آنت (আন্তা) বাড়িয়ে ফেলেছেন (তফসীর ফতহুল আযীয, উর্দু তর্জমা, আমপারা, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, কাইয়ুমী কানপুর ছাপা, ১৯৫৫ ইং সংস্করণ)। (৩) দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুফতী মওলানা মোহাম্মাদ শফী (রহঃ) তদীয় তফসীরে বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, ৩৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত

সহীহ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটাকে রসুলের হাদিস বলা ঠিক নয়। অবশ্য এটা কোন বিজ্ঞ দার্শনিকের উক্তি হতে পারে (মাআ-রিফুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, ৭৭৫ পৃষ্ঠা, দেওবন্দ মোস্তাফায়িয়্যাহ ছাপা)। অতএব ওঁদের মত আমার দ্বারাও ভুল হোয়ে যেতে পারে। তাই বিনীত আরয করছি, কোন সুহৃদশী যদি এই তফসীরে আমার কিংবা নওয়াব সাহেবের কোন ভুল তথ্য খুঁজে পান তাহলে হাওয়ালা সহকারে সেটা জানালে বাধিত হব। এবং এটাকে আরো তত্ত্ববহুল ও হৃদয়গ্রাহী করার সুপরামর্শ দিলে আগামী সংস্করণে তা করার চেষ্টা নেব ইন-শা-আল্লাহ!

কৃতজ্ঞতার মাশুল: অনুবাদ গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমানে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্তির দিক দিয়ে সবার অগ্রণী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ডঃ মোঃ উসমান গনী (এম,এ, পি,এইচ,ডি, ডি,লিট) সাহেব এবং পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সুযোগ্য সেক্রেটারী জনাব নজমুল আলম (এম,এ, ডব্লিউ, বি,সি,এস) সাহেব ও মুর্শিদাবাদের কৃতী শিক্ষাবিদ হযরত মওলানা হায়াতুল্লাহ আযহারী সাহেবগণ সারগর্ভ, জ্ঞানগর্ভ ও সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি। বেলডাঙ্গা ও নওদা থানার যেসব ভায়েরা চাঁদা দিয়ে তফসীরটি ছাপিয়ে পঃ বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলে হাদীসের অর্থনৈতিক ফাণ্ড সুদৃঢ় করার এবং আমার নগণ্য খেদমতটুকু জনগণকে উপহার দেবার সুযোগ কোরে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি জমঈয়তের তরফ থেকে সেক্রেটারী হিসেবে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে গ্রন্থকার হিসেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তফসীরটির বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ মৌলানা আবদুন নূর ভাই ও জনাব আঃ কাদের এবং জনাব ইলিয়াস সাহেবদের সহযোগিতা ধন্যবাদ যোগ্য। নওয়াব সাহেবের উর্দু তফসীর গ্রন্থটি অনুবাদ করার জন্য মেটিয়াবুজ-বদরতলা শেখপাড়া জামে মসজিদের মোতাওয়াল্লী মরহুম ডাঃ আবুল কাসেম (রহঃ) আমাকে তা দেওয়ায় তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং সূরা ফাতেহা তর্জমা করার জন্য উক্ত তফসীরের ১ম পারাটি আমার পিতৃতুল্য হিতাকাংখী হুগলী-বড়ম্বার শ্রদ্ধেয় মওলানা আবদুল খবীর রহমানী সাহেব দেওয়ায় তাঁকে আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি। এছাড়া আর যাঁরা বিভিন্ন উপায়ে তফসীরটি ছাপার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই দিলী

মোবারকবাদ ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তরফ থেকে বাংলাভাষী ভায়েদের কাছে কোরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্য লিখিত ও মৌখিকভাবে প্রচারের চেষ্টা চলছে। যেসব আধুনিক শিক্ষিত ভায়েরা মৌখিক তবলীগ করতে গিয়ে কোরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্য সম্বলিত নির্ভরযোগ্য বই না পাওয়ায় কোন বিশেষ জামাআতের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা মনগড়া দোআর নেসাবী বই এবং জায়গায় জায়গায় মনগড়া ব্যাখ্যা সম্বলিত আধুনিক তফসীর পড়তে ও পড়াতে বাধ্য হন তাদের জন্য এই তফসীরটি এক অমূল্য সওগাত, যা মনগড়া হাদীস এবং মনগড়া তফসীর থেকে মুক্ত। তাঁরা এই তফসীরটি নিজেরা পড়ে বহু অশ্রুত তথ্য এবং অজ্ঞাত তত্ত্ব জানতে পারবেন এবং মৌখিক তবলীগের সময় এর দ্বারা তালীমে কোরআনের দর্স দিয়ে তৃপ্ত হবেন। কোরআন পঠন ও পাঠন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল বলেন: خيركم من تعلم القرآن وعلمه অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই-ই উত্তম যে নিজে কোরআন শেখে এবং অপরকে শেখায় (বোখারী, মেশকাত, ১৮৩ পৃষ্ঠা)। উক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে করুণাময়ের কাছে দোআ করছি, আল্লাহ্ গো! তোমার রসূলের ফরমানে অনুপ্রাণিত হোয়ে এই নগণ্য খেদমতটুকু তোমার বান্দাদের সামনে পেশ করছি। তাই তুমি এই নির্ভেজাল তফসীরের পঠন ও পাঠনকারীদের সাথে এই অধমকেও 'উত্তম-ব্যক্তিদের' মর্যাদা দিও এবং যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল কোরে থাকি তাহলে ক্ষমার পরশে ধন্য কোরে নিও আমিন, ইয়া রব্বাল আলামীন! ইতি—

১৪ই রমাযান, ১৪০১ হিজরী — গ্রন্থকার
১৭ই জুলাই, ১৯৮১ ইংরাজী — শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

আল্লাহ্‌র অশেষ হাম্‌দ যে, প্রায় এগার বছর পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পেল। এতে ৯২ পৃষ্ঠা থেকে শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলোতে হুযূর ও হযরত শব্দের বদলে নবী কিংবা রসূলুল্লাহ (স:) শব্দ লেখা হয়েছে এবং খোদার স্থলে আল্লাহ্ আর বিন এর জায়গায় ইবনে লেখা হয়ছে। এ বইটি দুটি প্রেসে লেসার কম্পোজ করায় টাইপটা দুরকম হয়েছে। এবং অফসেটে ছাপায় সাইজটা আগের চেয়ে ছোট হয়েছে। এর স্বত্ব আমার। তাই এটাকে দ্বিতীয়বার ছাপার জন্য প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলে হাদীস প: বঙ্গ:-কে আবার অনুমতি দিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার
শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী
শুক্রবার ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯২ — এস ১০২ মারে রোড, কলিকাতা ১৮

http://islaminonesite.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরায়ে ফা-তেহার ফযীলত	১৩
আউযোবিল্লার গুরুত্ব, নামাযে সূরায়ে ফা-তেহার গুরুত্ব	১৫
শয়তানের ব্যাখ্যা	১৬
বিসমিল্লার ব্যাখ্যা	১৭
অনুবাদকের সংযোজন	২১
সূরা শব্দের ব্যাখ্যা	২২
আয়াতের সংজ্ঞা	২৩
সূরাতুল ফা-তেহা, তরজমা ও তফসীর	২৪
এবাদতের তাৎপর্য্য	২৮
হেদায়াত ও সেরা-তের ভাবার্থ	৩০
পুরস্কৃত বান্দা কারা, ক্রোধের পাত্র ও পথভ্রষ্ট কারা	৩১
আমীনের রহস্য	৩৪
সূরাতুন না-স তরজমা ও তফসীর	৩৬
কোরআন খতমের পর কর্ত্তব্য ও সংযোজন	৪১
সূরা ফালাকের গুরুত্ব	৪৩
সূরা না-স ও সূরা ফালাক অবতীর্ণের কারণ	৪৩
সূরা না-স ও ফালাকের ফযীলত	৪৪
সূরাতুল ফালাক, তরজমা	৪৫
তফসীর	৪৬
অনুবাদকের সংযোজন	৫০
রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর যাদু সত্য না মিথ্যা	৫২
মোআওবেযাতায়ন কোরআন কি না	৫৪
সূরা না-স ও ফালাকের বৈশিষ্ট্য	৫৫
সূরায়ে এখ্লাস	৫৬
সূরাটি অবতীর্ণের কারণ	৫৬
সূরাটির ফযীলত ও মাহাত্ম্য	৫৭
সূরাতুল এখ্লাস ও তরজমা	৬২
সূরাটির সারাংশ	৬২
সামাদ শব্দের ভাবার্থ, কুফুঁউন শব্দের ব্যাখ্যা	৬৩
সংযোজন	৬৫
সূরায়ে তাব্বাত ও তরজমা	৬৮

সূরাটি নাযেলের কারণ ও তফসীর	৬৯
অনুবাদকের সংযোজন	৭৩
তাব্বাত ও তাব্বা শব্দের অনুবাদ রহস্য	৭৫
সূরা লাহাবের নীতি শিক্ষা	৭৬
সূরায়ে নাস্র	৭৭
তরজমা ও তফসীর	৭৮
সংযোজন	৮১
সূরায়ে কা-ফেরূনের ফযীলত	৮২
তরজমা ও তফসীর	৮৩
সূরাটি নাযেলের কারণ	৮৬
'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যা	৮৭
সংযোজন	৮৮
সূরাটির অন্যান্য নাম	৮৮
সূরাটির ফযীলত	৮৯
সূরায়ে কাওসার	৮৯
কাওসার শব্দের তফসীর	৯০
নাহর শব্দের ব্যাখ্যা	৯২
আবতারের ভাবার্থ ও সূরা কাওসার অবতীর্ণের কারণ	৯৪
সংযোজন	৯৪
সূরায়ে আরাআইতা ও তরজমা	৯৬
তফসীর	৯৮
সংযোজন	৯৯
সূরায়ে কোরাইশ	১০২
তরজমা ও তফসীর	১০৪
সংযোজন	১০৫
সূরাটির বৈশিষ্ট্য	১০৯
সূরায়ে ফীল এবং তরজমা	১১০
তফসীর	১১০
সংযোজন	১১৭
তফসীর সূরায়ে হুমাযাহ	১১৯
সংযোজন	১২০
সূরায়ে আস্র	১২৩
তরজমা ও তফসীর	১২৪
সংযোজন	১২৬
সূরায়ে তাকাসুর	১২৭

http://islaminonesite.wordpress.com

তরজমা ও তফসীর	১২৯
সূরাটি অবতীর্ণের কারণ	১৩০
নাঈম শব্দের ব্যাখ্যা	১৩৩
সংযোজন	১৩৫
সূরায়ে কা-রেআহ্	১৩৬
তরজমা ও তফসীর	১৩৭
সংযোজন	১৩৯
সূরায়ে আ-দিয়া-ত	১৪১
তরজমা ও তফসীর	১৪২
সংযোজন	১৪৫
সূরায়ে যাল্যাল্লাহ্	১৪৬
তরজমা ও তফসীর	১৪৮
সংযোজন	১৫৩
সূরায়ে লাম্ ইয়াকুন	১৫৫
তরজমা ও তফসীর	১৫৭
সংযোজন	১৬১
সূরায়ে কাদ্র এবং তরজমা ও তফসীর	১৬৪
সূরাটি নাযেলের কারণ	১৬৬
শবে কদরের আলামত	১৬৭
শবেকদর কখন হয়	১৬৮
শবেকদরের দোআ	১৭১
সংযোজন	১৭৩
সূরায়ে এক্রা	১৭৫
তরজমা ও তফসীর	১৭৭
সংযোজন	১৮৪
সূরায়ে তীন	১৯০
তরজমা ও তফসীর	১৯১
সংযোজন	১৯৭
অনুবাদকের সংযোজনের প্রমাণপঞ্জী	২০৪
তফসীরে আইনী সম্পর্কে অভিমত	২০৫
ডঃ মোঃ উসমান গনী সাহেবের মন্তব্য	২০৫
জনাব নজমুল আলম সাহেবের বক্তব্য	২০৭
মাওলানা হায়াতুল্লাহ সাহেবের অভিমত	২০৭
ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের জীবনী	২০৮
বাংলা অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সূরায়ে ফা-তেহার ফযীলত

হযরত আবু হোরায়রার হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আলহামদো লিল্লা-হে রব্বিল আ-লামীন হল উম্মুল কোরআন (কোরআনের মা), উম্মুল কেতাব, সাব্য়ে মাসা-নী (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত) ও মহান কোরআন (তিরমিযী)। একে ফা-তেহা এইজন্য বলে যে, কোরআনে সর্বপ্রথম এই সূরাটি লেখা হয়। নামাযের কেরাআতও এই সূরা দিয়ে শুরু হয়। একে হাম্দ বা প্রশংসাও বলা হয় এবং সলাত বা নামায নামেও অভিহিত করা হয়। সহী কুদসী হাদীসে আছে, আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধাঅর্ধি ভাগ কোরে নিয়েছি। এই হাদীসে 'নামায' বলতে সুরা ফাতেহা বোঝায়। কারণ, এই সুরাটি হল নামাযের শর্ত। এটা না পড়লে নামায হয় না। এর আর এক নাম শেফা বা আরোগ্য। হযরত আবু সায়ীদ থেকে বর্ণিত মরফু হাদীসে আছে যে, সুরা ফাতেহা হল প্রত্যেক বিষের ওষুধ (দারেমী)। অন্য হাদীসে একে ঝাড়ফুঁক মন্ত্র বলা হয়েছে। এক সাহাবী এক সাপে কামড়ানো ব্যক্তির উপর এই সুরাটি পড়েছিলেন। ফলে সে বিষমুক্ত হয়। তাকে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তুমি কি করে জানলে, যে, এটা মন্ত্র ? অর্থাৎ বিষমুক্তির ঝাড়ফুঁক মন্ত্র। ইবনে আব্বাস একে কোরআনের মূলভিত্তি বলতেন। তিনি বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীমকে ফাতেহার মূল বলতেন। এই সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কেউ বলেন, দুবার নাযেল হয়েছিল, একবার মক্কায় এবং অন্যবার মদীনায়। কেউ বলেন, অর্ধেক মক্কায় এবং অর্ধেক মদীনায়। প্রথম মতটাই বেশী ঠিক। অধিকাংশ আলেমের মত তাই। ঐ মতটিকে বাগাভী ও বায়যাভী সঠিকতম বলে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত সুরার নাম এবং সমস্ত সুরা ও আয়াত সমূহের বিন্যাস তাওকীফী। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। কোরআনের একটি টুকরার নাম 'সুরা'। কখনো কোন সুরার নাম একটি হয় আবার কখনো কোন সুরার নাম কয়েকটি হোয়ে থাকে। যেমন সুরায়ে ফাতেহার নাম অনেক। সাহাবায়ে কেরাম সুরাগুলোর নাম কোরআনে লেখেননি। এটা হল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আবিষ্কার এই সুরাতে ২৫টি শব্দ এবং ১১৩টি বর্ণ আছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

একদা রসুলুল্লাহ (সঃ) আবু সায়ীদ খুদরীকে বলেন, আমি তোমাকে কোরআনের একটা খুব বড় সুরা শেখাব মসজিদ থেকে বের হবার আগে। তারপর তিনি সুরায়ে ফাতেহা শিখিয়ে বললেন, এটাই হল সেই সাবয়ে-মাসানী (বারবার পঠিত ৭টি আয়াত) মহান কোরআন (বোখারী, আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)। একদা নবী (সঃ) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে এমন একটা সুরা শিখিয়ে দিই যা তওরাত ও ইনজীলেও নাযেল হয় নি এবং যবুর ও ফোরকানেও অবতীর্ণ হয় নি। তারপর তিনি বলেন, ঐ সুরাটি হল সুরায়ে ফাতেহা (আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবেরের হাদীসে সুরাটিকে খুবই কল্যাণপূর্ণ সুরা বলা হয়েছে (আহমাদ)। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন কোন সুরার মর্যাদা অন্য সুরার চেয়ে বেশী। অধিকাংশ ওলামা তাই বলেন। যদিও আল্লার সমস্ত কালামই মর্যাদাবান, বরং জ্যোতির উপরে জ্যোতিসম। হযরত আবু হোরায়রার মরফু হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন নামায পড়ে যাতে সুরা ফাতেহা থাকেনা সে নামায পূর্ণ হয় না। কোন সাহাবী আবু হোরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি (তাহলে পড়ব কি) ? তিনি বললেন, মনে মনে পড়। আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি নামাযকে (অর্থাৎ সুরায়ে ফাতেহাকে) আমার নিজের এবং আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দা তার প্রার্থনার ফল প্রাপ্ত হয়। যখন সে বলে, "আলহামদো লিল্লা-হে রব্বিল আ-লামীন তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে, 'আর্‌রহমা-নির্‌রহীম' তখন আল্লাহ বলেন আমার গোলাম আমার গুণ গেয়েছে। যখন সে বলে, 'মা-লেকে ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ বলেন, আমার দাস আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। কখনো তিনি বলেন, আমার দাস আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। যখন সে বলে, 'ইয়্যা-কা না'বোদো ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তায়ীন' তখন আল্লাহ বলেন, এটা হল আমার নিজের এবং আমার গোলামের ব্যাপার। গোলাম তাই পাবে যা সে চাইবে। যখন সে বলে, 'এহদেনাস্ সেরা-তাল মোস্তাকীম' তখন আল্লাহ বলেন এটা শুধু আমার বান্দার। বান্দা তার প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হল (মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী)। নাসায়ীর শব্দে আছে যে, অর্ধেক সুরা আমার এবং অর্ধেক সুরা আমার বান্দার। বান্দা তার প্রার্থনা প্রাপ্ত হয়। আবু যোরআ রেওয়ায়াতটিকে সহী বলেছেন। ইমাম আহমাদও এটাকে বর্ণনা করেছেন। আবু সায়ীদের হাদীসে এই সুরাটিকে সব রকম অসুখের ঔষধ বলা হয়েছে (সায়ীদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী)। ইবনে ওমরের বর্ণনায় প্রত্যেক অসুখের ঔষধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দারেমী ও বায়হাকী)। ইবনে আব্বাস বলেন, একদা রসুলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে জিবরাইল (আঃ) বসে ছিলেন। অকস্মাৎ উপর থেকে এক আওয়াজ শোনা গেল। জিবরাঈল (আঃ) আসমানের দিকে চোখ তুলে বললেন, এটা

আসমানের এক দরজা, যা আজ পর্যন্ত কখনো খোলা হয় নি। ঐ দরজা থেকে এক ফেরেস্তা নামলেন এবং বললেন, আপনার জন্য দুটি জ্যোতির সুখবর, যা আপনাকে দান করা হয়েছে, আপনার আগে আর কোন নবীকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়নি। একটি হল সুরায়ে ফাতেহা এবং অপরটি হল সুরায়ে বাকারার শেষ আয়াতাবলী। আপনি ঐ সুরা দুটির যে কোন বর্ণ পড়বেন সঙ্গে সঙ্গে দুটি জ্যোতি আপনাকে দান করা হবে (মুসলিম, নাসায়ী)।

নামাযে সূরায়ে ফা-তেহার গুরুত্ব

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া অপরিহার্য্য নয়। বরং কোরআনের যে কোন জায়গা হতে কিছু অংশ পড়লে নামায হোয়ে যাবে। বাকি তিন ইমাম এবং অধিকাংশ ওলামার মতে সুরা ফাতেহা পড়া অপরিহার্য্য। এই সুরা বিনা কোন নামাযই হয় না। কারণ, ওবাদাহ ইবনে সা-মেত থেকে মরফুভাবে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, যেব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাযই হয় না (বোখারী ও মুসলিম)। আবু হোরায়রার শব্দ এই, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, সেই নামায যথেষ্ট হয় না যাতে উম্মুল কোরআন পড়া হয় না। (ইবনে খোযায়মা ও ইবনে হিব্বান)। ইবনে কাসীর বলেন, এ ব্যাপারে বহু হাদীস আছে। এই মতটি হাদীসের বাহ্যিক ভাবসম্মত। এর দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, মোক্তাদিকেও সুরা ফাতেহা পড়তে হবে, অন্যথায় তারও নামায হবে না। এই মসলাতে যদিও দু তিন রকম উক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, মোক্তাদীর জন্যও সুরায়ে ফাতেহা পড়া অপরিহার্য্য। এই উক্তির দলীলগুলো খুবই পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। যারা এটাকে অপরিহার্য্য বলে না তাদের দলীলগুলো জোরদার ও প্রাধাণ্যযোগ্য নয়, বরং অত্যন্ত দুর্বল ও অস্পষ্ট।

আউযোবিল্লার গুরুত্ব

কোরআন তেলাঅতের আগে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা অধিকাংশ আলেমের মতে সুন্নত। কারণ, আল্লাহ বলেন إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ যখন তুমি কোরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লার শরণ চাইবে (সুরায়ে নাহ্‌ল ৯৮ আয়াত)। এই কথা বলাতে বান্দার তরফ থেকে তার দুর্বলতা ও অক্ষমতার স্বীকারোক্তি করা হয় এবং বিপদ দূর করার ব্যাপারে আল্লার শক্তি প্রমাণিত হয়। ইবনে কাসীর বলে, আল্লার আশ্রয় প্রার্থনার একটি রহস্য এই যে, ঐ শব্দগুলো বলার ফলে মুখ পবিত্র হোয়ে যায় এবং মুখ থেকে যে সব আজে বাজে ও অশ্লীল কথা বের হয়ে থাকে তা থেকে যবান পাক হোয়ে যায়। আল্লার কাছে পানাহ চাওয়ার হুকুম কোরআনে সাধারণভাবে তিন জায়গায়

http://islaminonesite.wordpress.com

এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, শয়তানের তরফ থেকে কোন প্ররোচনা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লার পানাহ (শরণ) চাও। নিশ্চয়ই তিনি (তোমার আশ্রয় প্রার্থনা) শ্রবণকারী জ্ঞানী (সুরায়ে আ'রা-ফ ২০০ আয়াত)। অন্যত্রে বলেন, তুমি বল, হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে শয়তানের খোঁচা মারা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর হে প্রভু! আমার কাছে তাদের হাযির হওয়া থেকেও তোমার শরণ প্রার্থনা করছি (সুরায়ে মো'মেনুন ৯৭ আয়াত)। তৃতীয় আয়াতটি সুরায়ে হা-মিম সেজদার ৩৬ নং আয়াত। ঐ আয়াতটি এবং সুরায়ে আরাফের সব শব্দগুলি একই। কেবল এখানে "ইন্নাহু সামীউন আলীম" এর জায়গায় "ইন্নাহু হুআস সামীউল অলীম" আছে। এ সম্পর্কে কোন চতুর্থ আয়াত নেই। এখন থাকলো ঐ পানাহ চাওয়ার শব্দাবলী কিরূপ হবে, সে ব্যাপারে মতভেদ কোরে কোন লাভ নেই। বরং ঐ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে যে সব শব্দ এসেছে সেগুলো বলাই যথেষ্ট। আবু সায়ীদ খুদরী বলেন, রসূলুল্লাহ সেঃযখন রাতে নামাযের জন্য উঠতেন তখন বলতেন ঃ-

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَ نَفْثِهٖ-

বাংলা উচ্চারণ ঃ-আউযু বিল্লা-হিস্ সামীয়িল আলীম মিনাশ্ শায়তা-নির্‌রজীম মিন হামযিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফসিহী (সুনান গ্রন্থাবলী)। উবাই ইবনে কা'ব এর রেওয়ায়াতে মরফুভাবে এই শব্দগুলো এসেছে ঃ-আউযু বিল্লা-হি মিনাশ্ শায়তা-নির্‌রজীম। অন্য বর্ণনায় এই শব্দগুলো আছে ঃ-আল্লা হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাশ্ শায়তা-নির্‌রজীম। একটি যয়ীফ ও সূত্রছিন্ন (মোনকাতা) হাদীসে এইশব্দগুলো ইবনে আব্বাস থেকে পাওয়া যায় ঃ-আসতায়ীযু বিল্লা-হিস সামীয়িল আলীম মিনাশ শায়তা-নির্‌রজীম। মোট কথা উক্ত শব্দাবলীর মধ্যে যে কোন শব্দ দিয়ে আউযো পড়া যায় তা যথেষ্ট হবে। চায় কেউ তা চিল্লে পড়ে কিংবা আস্তে, সব রকমই চলবে।

শয়তানের ব্যাখ্যা

শয়তান তাকে বলে যার প্রকৃতি মানুষের প্রকৃতি থেকে আলাদা তার দুরাচারের কারণে। সে প্রত্যেক জিনিষ থেকে স্বতন্ত্র। তারপর প্রত্যেক উদ্ধত ও বিদ্রোহী-জিন হোক বা মানুষ অথবা অন্য কোন জন্তু হোক-তাকে শয়তান বলা হয়। আল্লাহ বলেন, এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানুষ শয়তানকে দুশমন বানিয়ে দিয়েছি। যারা একে অপরকে রংচংয়ের কথা শিখিয়ে দেয় (সুরায়ে আনআ-ম ১১২ আয়াত)। এর দ্বারা বোঝা যায়, শয়তানের কাজ হল লোককে ধোকা দেওয়ার জন্য মিথ্যা কথাকে রংচং চড়িয়ে একে অপরকে বলা। আবু যর থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ

(সঃ) বলেন, হে আবু যর! তুমি মানুষ ও জিন শয়তান থেকে আল্লার পানাহ চাও। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হুযুর! মানুষের মধ্যেও শয়তান হয় নাকি? নবীজি বললেন, হাঁ (মোসনাদে আহমাদ)। আবু যর থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে কালো কুকুরকে শয়তান বলা হয়েছে (মুসলিম)। 'রজীম' এর দুটি অর্থ। এক-নিজের কুমন্ত্রনা দ্বারা মানুষকে খোঁচা মারা এবং কুপ্ররোচনার জালে ফাঁসানো। দ্বিতীয় হল-নিজে স্বয়ং ভাল থেকে বিতাড়িত, দূরীভূত ও উপেক্ষিত। যেমন আল্লাহ বলেন, আমি ঐ তারাগুলোকে শয়তানদের ছুঁড়ে মারার জন্য বানিয়েছি (সুরায়ে মুল্‌ক ৫ আয়াত)। অন্যত্রে আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক দিক থেকে তাদেরকে হাঁকিয়ে ফেলে দেওয়া হয় (সুরায়ে আসস-ফ্‌ফা-ত, ৮ আয়াত)। তিনি আরো বলেন, যে চুরি কোরে শোনে তার পেছনে আগুনের গোলা তাড়া করে (সুরায়ে হিজর ১৮ আয়াত)। ইবনে কাসীর শেষ অর্থটিকে প্রসিদ্ধ ও সঠিকতম বলেছেন।

বিসমিল্লার ব্যাখ্যা

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম-পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে (পড়া) শুরু করছি। মহান সাহাবীগণ আল্লার পবিত্র গ্রন্থ উক্ত বরকতময় বাক্যটি দিয়ে শুরু করেছিলেন। সমস্ত আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, বিসমিল্লাহ বাক্যটি উনিশ পারা সুরায়ে নামালের একটি আয়াত। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, প্রথমে রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সুরার সাথে অপর সুরার পার্থক্য জানতেন না। পরিশেষে "বিসমিল্লাহ" অবতীর্ণ হয় (আবু দাউদ ও মোস্তাদরকে হাকেম)। উভয়ের সনদ বিশুদ্ধ। উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, কোরআনের প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ একটি স্বতন্ত্র আয়াত। কোন ব্যক্তি যখনই কোরআনের সূরা পড়বে-চায় নামাযে হোক কিংবা তেলাঅতে-সে যেন প্রথমে বিসমিল্লাহ অবশ্যই পড়ে। উম্মে সালমা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের মধ্যে সূরা ফা-তেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়েন এবং ওকে সূরায়ে ফাতেহার একটি আয়াত মনে করেন (ইবনে খোযায়মা)। এর সনদে দুর্বলতা আছে। সাহাবী ও তাবেয়ীদের একটি দল বলেন যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরায়ে তওবা ছাড়া কোরআনের প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের মত তাই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক বিসমিল্লাকে কোন সূরারই আয়াত মনে করেন না। প্রথম মতটি জোরদার ও সঠিকতর। এই কারণেই সূরা ফাতেহা যখন চিল্লে পড়া হবে তখন বিসমিল্লাহও চিল্লে পড়তে হবে। সাহাবী ও তাবেয়ীদের একদল এবং সালাফ ও খালাফ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের এক জামাআতের অভিমতও তাই। খাতীব বাগদাদী বলেন, চারজন খলিফা বিসমিল্লাহ চিল্লে পড়তেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি গরীব বা অভিনব। ইবনে কাসীর (রেহঃ) সেইসব সাহাবী ও তাবেয়ীদের নাম লিখেছেন যাঁরা চিল্লে পড়তেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

তারপর তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ যখন সূরায়ে ফাতেহার কিছু অংশ তখন তা চিল্লে পড়াই উচিত। একদা আবু হোরায়রা (রাযিঃ) চিল্লে বিসমিল্লাহ পড়ে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নামাযের অধিক সাদৃশ্য পেশকারী (নাসায়ী, ইবনে খোযায়মা, ইবনে হিব্বান ও হাকেম)। দারকুতনী, বায়হাকী ও খতীব হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনে আব্বাস থেকে মরফুভাবে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিসমিল্লাহ চিল্লে পড়তেন। হাকেম এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তাঁকে কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে কেরাআত পড়তেন ? তিনি বলেন, হুযুর (সঃ) টেনে টেনে পড়তেন। তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম পড়ে দেখিয়ে বললেন, বিসমিল্লাকে এইভাবে টানতেন, আররহমা-নকে এরূপ আররহীমকে এইরূপ (বোখারী)। উম্মে সালমা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কেরাআতগুলো আলাদা আলাদা পড়তেন। যেমন বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম * আলহামদো লিল্লা-হে রব্বিল আ-লামীন আররহমা-নির রহীম * মালেকে ইয়াওমিদ্দীন * দারকুতনী বলেন, এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। অর্থাৎ হুযুর (সঃ) প্রত্যেক আয়াতে ওয়াক্‌ফ করতেন ও থামতেন এবং একটি আয়াতের সাথে অন্য আয়াতকে মেলাতেন না। কিছু লোক যারা বিসমিল্লার রহীম শব্দের 'মিম' বর্ণটিকে আলহামদুর 'আল' বর্ণের সাথে মিলিয়ে কোন আমল প্রভৃতির জন্য রহীমিল হামদু লিল্লা-হি---পড়ে থাকেন। এরূপ পড়া সুন্নতের খেলাফ। কখনো এরূপ পড়া উচিত নয়। বরং প্রত্যেক আয়াত কেটে কেটে আলাদা আলাদা পড়া উচিত। যাতে সুন্নত মোতাবেক হয়।

ইবনে কাসীর বলেন, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ রহেমাহুমুল্লার মতে নামাযে বিসমিল্লাহ চিল্লে পড়া হবে না। কিন্তু কেউ যদি চিল্লে অথবা চুপ করে পড়ে তাহলে ওঁরা তার নামাযকে অশুদ্ধ বলেন না। এটা মন্দের ভাল। ফতহুল বায়া-নে বলা হয়েছে যে, বিসমিল্লা নীরবে পড়ার হাদীসগুলো যদিও বিশুদ্ধ, কিন্তু চিল্লে পড়ার হাদীসগুলো প্রাধান্যযোগ্য। কারণ, এই হাদীসগুলোর সূত্র অধিক বিশুদ্ধ। এইজন্য এই মতটা গ্রহণ করা অধিকতর সঙ্গত। বিশেষ কোরে যখন নীরবে পড়ার হাদীসগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। ঐ ব্যাখ্যা একথার তাগিদ দেয় যে, বিসমিল্লাহ কোরআনের অঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং একটি আয়াত হিসেবে যেমন প্রমাণিত তেমনি কোন সূরার আগে পার্থক্যকারী হিসেবেও প্রমাণিত। অর্থাৎ যে সূরার আগে বিসমিল্লাহ আছে তার সাথে বিসমিল্লাকেও চিল্লে পড়া উচিত। সারকথা এই যে, বিসমিল্লাহ হল সূরায়ে ফা-তেহা ও প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত। উহা চিল্লে ও চুপ কোরে পড়ার হুকুম ঐরূপ যেমন সূরায়ে ফাতেহার হুকুম। সূরা ফাতেহা যেখানে চিল্লে পড়া হবে বিসমিল্লাহও সেখানে চিল্লে পড়তে হবে। এবং

যেখানে সূরায়ে ফাতেহা নীরবে পড়া হবে সেখানে বিসমিল্লাহ নীরবে পড়তে হবে। এইভাবে পড়লে সমস্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি হোয়ে যায়, মতভেদ দূর হয় এবং ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইবনে আব্বাস বলেন, একদা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বিসমিল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি (সঃ) বলেন, আল্লার নামের মধ্যে এটা একটা নাম। এর এবং আল্লাহর এসমে আকবার অর্থাৎ আ'যমের মেহান নামের) মধ্যে অতটা নৈকট্য আছে যতটা দুই চোখের কালো ও সাদার মধ্যে আছে (ইবনে আবী হাতেম)। অন্য সনদ দ্বারা ইবনে মারদাওয়াহেও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মসউদ বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের দারোগা থেকে বাঁচিয়ে দিন তাহলে সে যেন বিসমিল্লাহ পড়ে। ওর প্রত্যেক হরফ জাহান্নামের এক একটা পাহারাদারের জন্য ঢাল হোয়ে যাবে (কুরতুবী)। ইবনে আতিয়্যাহ এই বর্ণনার সমর্থন করেছেন এই দলীল পেশ করে যে, একজন মুসল্লী একদা "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ হামদান কাসীরান তাইয়েবান মোবা-রকান ফীহ" বলেছিল, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি ৩০ জনেরও বেশী ফেরেস্তাকে দেখলাম যে, তারা এই বাক্যটি নেবার জন্য তাড়াহুড়ো করছেন। কারণ এই বাক্যটিতে ৩০ এর অধিক হরফ বা বর্ণ আছে। তাছাড়া এটা এমন একটি বাক্য যা কোন ব্যক্তি নিজেকে বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে বলতে পারে না। একদা আবু তামীমা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে একটি সওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন। আরোহনটি হঠাৎ ঠোকর খায়। ফলে ঐ সাহাবী বলেন, "তাঁয়েসাশ্ শায়তান" অর্থাৎ শয়তান ধ্বংস হোক তখন হুযুর (সঃ) বললেন, তুমি এরূপ বলনা। কারণ, এরূপ বললে সে নিজকে খুব বড় মনে করে। অর্থাৎ খুশিতে ফুলে মোটা হোয়ে যায়। সে বলে যে, আমি আমার শক্তি দ্বারা ওকে পটকে দিয়েছি। সুতরাং তুমি বিসমিল্লাহ বল। কারণ, একথা বললে সে কুঁকড়ে মাছির মত ছোট্ট হোয়ে পড়ে (মোসনাদে আহমাদ)। নাসায়ীর শব্দ আমালুল ইয়াওমে আললায়লার মধ্যে মরফুভাবে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সে ফুলে ঘরের মত হোয়ে যায় এবং বিসমিল্লাহ বললে সিটকে মাছির মত ছোট্ট হোয়ে পড়ে। এটা হল বিসমিল্লার বরকতের ফল। ইবনে কাসীর বলেন, এইজন্য প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক কথার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা উত্তম। যেমন বইয়ের ভূমিকায়, পায়খানায় ঢোকার সময়, অযুর প্রথমে। কিছু আলেমের মতে অযুর প্রথমে বিসমিল্লাহ বলা অজেব ও অপরিহার্য্য। এরূপ যবহের সময়, খাবার সময় ও স্ত্রী সহবাসের সময় বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব ও পছন্দনীয় কাজ। কারো মতে অজেব ও অবশ্য কর্ত্তব্য। এ ব্যাপারে বহু হাদীস আছে।

আবু হোরায়রার হাদীসে মরফুভাবে এসেছে যে, আল্লার ৯৯টি নাম আছে। যে ব্যক্তি ওগুলো মুখস্থ করল সে বেহেস্তে যাবে (বোখারী ও মুসলিম)। আল্লাহ

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন ঃ- وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ আল্লার বহু উত্তম নাম রয়েছে, তোমরা তদ্বারা তাঁকে ডাকো (সুরায়ে আ'রা-ফ, ১৮০ আয়াত)। অন্যত্রে তিনি বলেন ঃ- اُدْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى۔

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ডাকো অথবা রহমানকে, যে নামেই তোমরা ডাকো, তাঁর বহু উত্তম নাম রয়েছে (সুরায়ে বানী ইসরাইল ১১০ আয়াত)। কোন কোন তত্ত্বদর্শী মনীষী বলেন, আল্লাহ শব্দটি মহান নাম। কোরআনে এই নামটি ২ হাযার ৩ শো ৬০ জায়গায় এসেছে। 'রহমান শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিজীবের জন্য বলা যায় না। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লার কিছু নাম এমনও আছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন রউফ ও রহীম শব্দ দুটি রসুলুল্লার ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে ঃ- حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ কিংবা সামীউন বাসীর শব্দ দুটি প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। যেমন সুরায়ে দাহ্‌রে আছে ঃ- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا۔ এরই বিপরীত হল আল্লাহ এবং রহমান শব্দদ্বয়। এ শব্দ দুটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ব্যবহার করা সিদ্ধ নয়। কোন কোন কাফের-কোরায়েশ রহমান শব্দটি মোসায়লামাহ কাযযাবের নামের সাথে ব্যবহার করেছেন। সেইজন্য আতা খোরাসানী বলেন, বিসমিল্লাহ-তে রহমানের পরে রহীম শব্দটি এইজন্যই এসেছে যে, আররহমান ও আররহীম গুণবাচক দুটি নামই এক সাথে কেবল আল্লার সাথে আছে, অন্য কারো সাথে এই দুটি শব্দ একত্রে মিলিয়ে বলা হয়নি। যেমন নিজেদের মূর্খতার কারণে হিংসাবশতঃ কোন কোন আরব র'হমান' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ব্যাপারেও ব্যবহার করেছেন। এই কারণে উক্ত দুটি গুণের একত্র সমাবেশ উপরোক্ত সন্দেহ দূরকারী। রহীম শব্দের তুলনায় রহমান শব্দে মোবালাগা বা আধিক্য প্রকাশ ভাব আছে। ইবনে জরীরের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারে যেন সবারই ঐক্যমত আছে, রহমান তিনি, যিনি সবারই উপরে রহম করেন এবং রহীম তিনি, যিনি কেবল মোমেন ও বিশ্বাসীদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। কিংবা রহমান তিনি, যিনি ইহকাল ও পরকাল দুজায়গাতেই রহম করেন এবং রহীম তিনি, যিনি কেবল পরকালে দয়া দেখাবেন। কিন্তু দোআয়ে মা-সুরাহ্‌তে আছে ঃ- رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের রহমান এবং উভয়েরই রহীম। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথম উক্তিটি অধিক ঠিক। আল্লা-হো আ'লাম। ইবনে মোবারক বলেন, রহমান তিনি যাঁর কাছে তুমি চাইলে দেন এবং রহীম তিনি যাঁর কাছে না চাইলে তিনি রাগ করেন। এর প্রমাণ আবু হোরায়রার এই হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লার কাছে কিছু চান না, আল্লাহ তার উপরে রাগ করেন (তিরমিযী)। খোদা গো! আমরা তোমার কাছে এই ভিক চাচ্ছি যে, তুমি দুজগতে আমাদের শান্তি

ও নিরাপত্তা দান কর এবং এই দোআ কবুল করে তুমি আমাদের ঝুলি ভরে দাও- আল্লা-হুম্মা আমিন!

অনুবাদকের সংযোজন

আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলূসী (রহঃ) সূরায়ে ফাতেহার ২২ টি নাম বর্ণনা করেছেন। তা হল এই (১) ফা-তেহা (২) ফা-তেহাতুল কেতাব (৩) ফা-তেহাতুল কোরআন (৪) উম্মুল কোরআন (৫) সূরাতুল হাম্‌দ (৬) সূরাতুল কান্‌য (৭) সূরাতুস সলা-ত (৮) সূরাতুল মোনা-জা-ত (৯) সূরাতুদ দোআ (১০) সূরাতুস সওয়া-ল (১১) সূরাতুত তাফভীয (১২) কা-ফিয়া (১৩) ওয়া-ফিয়া (১৪) শা-ফিয়া (১৫) শেফা। (১৬) সাব্‌য়ে মাসা-নী (১৭) তালীমুল মাস্‌আলাহ (১৮) রুক্‌য়্যাহ (১৯) নূর (২০) উম্মুল কেতাব (২১) আল আসা-স (২২) আশ্‌শুক্‌র (তফসীর রূহুল মাআ-নী ১ম খণ্ড, ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠা)। এই সূরা ১ শো বার পড়ে যে দোআ করা হয় তা আল্লাহ তাআলা কবুল করেন (মোসনাদে দারেমী)। ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে, সূরায়ে ফাতেহা কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান (মোসনাদে বোখারী)। হযরত আনাসকে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যখন তুমি বিছানায় তোমার দেহের এক পার্শ্ব রাখবে এবং সূরায়ে ফাতেহা ও কুল হুআল্লা-হো আহাদ পড়বে তখন তুমি মরণ ছাড়া বাকি সমস্ত জিনিষ থেকে নিরাপদে থাকবে (মোসনাদে বায্‌যা-র)। হযরত জাবের থেকে বর্ণিত যে, সূরা ফাতেহা মৃত্যু ছাড়া প্রত্যেক রোগের ওষুধ (ফাওয়া-য়েদে খালয়ী)। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন সূরা ফাতেহা বিষেরও ওষুধ (সুনানে সায়ীদ ইবনে মনসূর এবং বায়হাকীর শোআবুল ঈমান)। আবু সোলায়মান বলেন, একবার রসুলুল্লার কতিপয় সাহাবী কোন যুদ্ধে শরীক ছিলেন। সেখানে তাঁরা একদা কোন এক মৃগী রোগীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোগীটি বেহুশ হোয়ে পড়েছিল। তাঁদের কেউ সূরা ফাতেহা পড়ে রোগীটির কানে ফুঁক দেয়। ফলে সে ভাল হোয়ে যায়। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সঃ) খবরটি পেয়ে বলেন, উহা উম্মুল কোরআন (কোরআনের মূল) এবং প্রত্যেক রোগের ওষুধ (সা'লাবী, তফসীরে মযহারী, ১ম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কোরআনের সমস্ত অংশের তুলনায় সূরায়ে ফাতেহা যথেষ্ট। দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় যদি সূরায়ে ফাতেহাকে রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় গোটা কোরআনকে রাখা হয় তাহলে কোরআনের চেয়ে সূরায়ে ফাতেহা সাতবার প্রাধান্য পাবে (আবু নোআইম ও দায়লামী)। তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতেহা পড়ে সে যেন তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও ফোরকান পড়ে (ফোযায়েলে আবু ওবায়েদ)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম পড়ে, তারপর সূরায়ে ফাতেহা পড়ে, ফের আ-মীন বলে, তার জন্য আসমানের সমস্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

মোকাররাব ফেরেশ্‌তা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (দায়লামী, তফসীর ফতহুল কাদীর, ১৬ ও ২৬ পৃষ্ঠা)।

এই সূরাতে ৭-টি আয়াত, ২৭-টি শব্দ এবং ১৪০-টি অক্ষর আছে। এর মধ্যে কোন আয়াত নাসেখ ও রহিতকারী এবং মনসূখ ও রহিত নেই (তফসীরে আযীযী, ১ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠা।)

তফসীরের বিখ্যাত রাবী যাহহাক (রহঃ) ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরায়ীল (আঃ) সর্বপ্রথম যখন মোহাম্মাদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হন তখন তিনি বলেন, হে মোহাম্মাদ! আপনি বলুন ঃ—আস্তায়ীযো বিল্লা-হিস সামীয়িল আলীম মেনাশ্ শায়তা-নির রজীম (অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে প্রার্থনা-শ্রবণকারী-জ্ঞানী আল্লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তারপর তিনি বলেন, বলুন ঃ— বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম * একরা বেসমে রব্বেকাল লাযী খালাক (তফসীরে কাবীর, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)। ইমাম রাযী ১৩-টি আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, নবীগণও সর্বদা আল্লার কাছে ইনসান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে শরণ চাইতেন। হযরত আনাস থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দিনে দশবার আল্লার পানাহ চায় তার জন্য আল্লাহ তাআলা ১টা ফেরেশ্‌তা নির্দিষ্ট করে দেন, যিনি তার কাছ থেকে শয়তানকে হাঁকিয়ে বেড়ান (ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯)। আল্লামা আবু বাক্‌র তিউনিসি উল্লেখ করেছেন, সমস্ত জাতির পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক (আসমানী) গ্রন্থই বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেছেন (রূহুল মাআনী ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)। সমস্ত নবীগণ যেকোন সৎকাজ বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করতেন। যেমন নূহ (আঃ) কিশ্‌তি চড়েন বিসমিল্লা-হে মাজ্‌রেহা বলে এবং সোলায়মান (আঃ) বিলকিসকে চিঠি লেখা শুরু করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দিয়ে (কাবীর, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা)।

সূরা শব্দের ব্যাখ্যা

আরবী সূরা শব্দের অর্থ উচ্চতা (লেসা-নুল আরব)। কিংবা উচ্চ স্তর (মোফরাদাতে রাগেব)। দুনিয়ার সমস্ত গ্রন্থকে যেমন বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয় তেমনি কোরআনের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ কোরে তার প্রত্যেক অধ্যায়কে সূরা বলা হয়। সুতরাং এক একটি সূরা যেন এক একটি উচ্চ সৌধের ন্যায়। এই উচ্চতা ও মহাত্ম্যের কারণে কোরআনের অধ্যায়কে সূরা বলা হয়েছে। কোন শহরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তার চারদিকে যে দেওয়াল দেওয়া হয় তাকেও সূরাহ বলা হয়। কোরআনের সূরাগুলো তার বিষয়বস্তুকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এই কারণেও ওদেরকে সূরা নাম দেওয়া হয়েছে। কমপক্ষে ৩-টি আয়াত বা তার চেয়ে বেশী আয়াতের সমন্বয়ে সূরা গঠিত হয়। রসুলুল্লাহ (সঃ) নিজে গোটা কোরআনকে

বিভিন্ন সূরায় ভাগ কোরে দেন এবং প্রত্যেকটির নামও তিনিই দিয়ে যান। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ঐ নামগুলো কোরআনে লেখেননি। কারণ, তাঁরা কোরআনে আল্লার অবতীর্ণ করা শব্দ ছাড়া অন্য একটি শব্দও লিখতেননা। যেমন সূরাগুলোর নাম কিংবা ফা-তেহার পর আমিন শব্দটি। কারণ, কোন ব্যক্তি যেন সন্দেহে না পড়ে যে, ঐ নামগুলো এবং আমিন শব্দটিও কোরআনেরই অঙ্গ। (তফসীর আলমানার ১ম খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)। কোরআনে মোট ১১৪-টি সূরা আছে।

আয়াতের সংজ্ঞা

আরবী আয়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ চিহ্ন। কোরআনী সূরার প্রত্যেক বাক্যটিকে পরিভাষায় আয়াত বলা হয়। প্রত্যেক বাক্য যাতে কোন বিধিনিষেধ আছে কিংবা যার মধ্যে কোন একটি স্বতন্ত্র ভাব বিদ্যমান আছে তাকেই আয়াত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (মোফরাদাতে রাগেব)। কোরআনের সমস্ত আয়াত গণনা করা হয়েছে। সঠিক মতে মোট আয়াত সংখ্যা হল ৬৬১৬ (এতকান ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭)।

—সংযোজন শেষ— এস, এ বারী

*

http://islaminonesite.wordpress.com

সূরাতুল ফা-তেহা

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

বাংলা উচ্চারণ ঃ–১। আল্‌হামদু লিল্লা-হি রবিবল আ-লামীন। ২। আর্‌রহমা-নির রহীম। ৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। ৪। ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তায়ীন। ৫। এহ্‌দিনাস্ সিরা-ত্বল মোস্তাকীম। ৬। সিরা-ত্বল লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলায়হিম। ৭। গায়রিল মাগ্‌যুবি আলায়হিম অলায্ য-ল্লীন।

তরজমা

১। সবরকম প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ২। (যিনি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময়। ৩। (যিনি) প্রতিফল দিনের একমাত্র প্রভু। ৪। (উক্ত গুণসম্পন্ন খোদা গো!) আমরা কেবল তোমারই উপাসনা করি এবং কেবল তোমারই কাছে সবরকম সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫। তুমি আমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দাও। ৬। সেইসব লোকদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ। ৭। যারা (তোমার) রাগের পাত্র নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়।

তফসীর

হামদ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ–যখন কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কোন ভাল কাজ করে এবং অন্য ব্যক্তি তার মাহাত্ম্যের কারণে ঐ কাজের প্রশংসা নিজ মুখে প্রকাশ করে তখন তাকে হামদ ও প্রশংসা বলা হয়। এই প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লারই জন্য

সীমাবদ্ধ। অন্যের জন্য সঙ্গত নয়। হাদীসে আছে ঃ– اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ অর্থাৎ খোদা গো! তোমারই জন্য সবরকম প্রশংসা ইবনে আব্বাস বলেন, আল্‌হামদো লিল্লা-হ কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া বাক্য। কোন বান্দা যখন এই বাক্য উচ্চারণ করে তখন আল্লাহ বলেন ঃ দেখ, আমার দাস আমার শুকরিয়া আদায় করেছে। হাকাম ইবনে ওমায়র বলে, রসুলুল্লাহ (সঃ)বলেছেন, যখন তুমি আল্‌হাম্‌দো লিল্লা-হে রব্‌বিল আলামীন বললে তখন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাকে অধিক দান করবেন (ইবনে জরীর)। ইবনে আম্‌র এর মারফু শব্দ এই যে, আলহামদো লিল্লাহ হল কৃতজ্ঞতার মূল। যে ব্যক্তি আল্লার তারীফ করে না সে আল্লার শুকরিয়া আদায় করে না (মোসান্নাফ আবদুর রাযযাক, খাত্তাবী, হাকীম তিরমিযী, বায়হাকী)। কোরআন পাকে নূহ আলায়হেস সালামকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলা হয়েছে। কারণ, তিনি আল্লার খুবই হামদ ও প্রশংসা করতেন। জাবের থেকে মরফুভাবে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, উত্তম যেক্‌র হল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ এবং উত্তম দোআ হল আলহামদো লিল্লা-হ (নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান ও উত্তম বলেছেন। আবু মালেক আশআরীর শব্দ এই যে, আলহামদো লিল্লাহ পাল্লাকে ভরে দেয় (মুসলিম, নাসায়ী ও আহমাদ)। আনাসের মরফু শব্দ এই যে, হামদ ও প্রশংসার চেয়ে আল্লার কাছে আর কোন বস্তু অত প্রিয় নয়। আবু হোরায়রার হাদীসে আছে, প্রত্যেক ভাল কাজ, যা আল্লার হাম্‌দ দিয়ে শুরু করা হয় না, তা বরকত থেকে বঞ্চিত হয় (আহলে সুনান, ইবনে হিব্বান ও বায়হাকী)। আনাস থেকে মরফুভাবে বর্ণিত আছে, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি খুশী হন যে ব্যক্তি প্রত্যেক লোকমা (গ্রাস) ও প্রত্যেক ঢোক পান করার সময় আল্লার প্রশংসা করে (মুসলিম)।

রব্ব শব্দের ব্যাখ্যা ঃ–কোন জিনিষের মালিক, অভিভাবক, তদবীর কারক, সংশোধক ক্ষতিপূরক ও প্রতিষ্ঠাতাকে রব্ব বলে। উপাস্যকেও রব্ব বলা হয়। এই সমস্ত অর্থগুলো আল্লাহ পাকের মধ্যে বিদ্যমান। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য 'রব্ব' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধবাচকে হয়। যেমন রব্বুদ দা-র ঘরের মালিক। বিনা সম্বন্ধবাচকে কেবলমাত্র আল্লারই জন্য বলা হয়। কেউ কেউ একথাও বলেন যে, এই নামটিও এসমে আ'যম (মহান নাম)। আলামীন হল আলম শব্দের বহুবচন। আলম বলা হয় আল্লাহ ছাড়া যা কিছু মওজুদ আছে তাকে। আলম শব্দের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিজগতই অন্তর্ভুক্ত। কেউ বলেন, আলম শব্দটি আলা-মত শব্দ থেকে উৎপন্ন। এইসব সৃষ্টবস্তু সৃষ্টিকর্ত্তার আলামত ও চিহ্ন। ইবনুল মো'তয্‌য কি সুন্দর কথা বলেছেন ঃ–

فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد
وفى كل شيئى له آية تدل على انه واحد

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থাৎ কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার কোন অস্বীকারকারী কি করে আল্লার না ফরমানী করে অথবা কি করে সে তাঁকে অস্বীকার করে ? পক্ষান্তরে প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে । যা একথা প্রমাণ করে যে, তিনি একক । কেউ বলেন. প্রত্যেক যুগের লোককে আলম বলা হয় । ইবনে আব্বাস বলেন, আলমের ভাবার্থ হল মানুষ ও জিন । কেউ কেউ এদের সাথে ফেরেস্তা ও শয়তানকেও সংযোজিত করেছেন । কিন্তু প্রথম উক্তিটাই সঠিকতর । কারণ, ফেরআওন যখন মুসা আলায়হেস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রব্বুল আলামীন কে ? তখন জওয়াবে তিনি বলেন, رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ আকাশমণ্ডল ও যমীন এবং ওদের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবারই রব্ব যিনি, তিনি (সুরায়ে শোআরা ২৪ আয়াত) । এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা আলম থেকে আলাদা ও ভিন্ন স্বত্তা, আলমের অন্তর্ভুক্ত নয় । এইজন্য কোরআনে এসেছে যে, রহমান আরশের উপরে আছেন । আলমের গণনায় মতভেদ আছে । কেউ বলেন, চোদ্দ হাযার । কেউ বলেন, সতের হাযার । কারো মতে আঠার হাযার । কারো মতে আশী হাযার । সঠিক কথা এই যে, আলেমুল গায়েব অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেননা যে, আলমের প্রকৃত সংখ্যা কত । কা'ব পাদ্রী বলেন, কেউই জানেনা যে, আলমের সংখ্যা কত একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ছাড়া । আমি বলছি, কোরআনে আল্লাহ নিজেই বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ কেউই জানেননা যে, তোমার প্রভুর সৈন্য কত তিনি ছাড়া (সুরায়ে মোদ্দাসসের ৩১ আয়াত) ।

রহমান ও রহীম শব্দের ব্যাখ্যা ঃ–রব্বুল আলামীন শব্দের মধ্যে একরকম ভয় দেখানো ভাব ছিল । সেইজন্য তারপরে রব্বের গুণ হিসেবে আররহমান ও আররহীম নাম দুটি উল্লেখ কোরে বান্দাকে সান্তনা দেওয়া হয়েছে । ফলে ভীতি প্রদর্শনকে সান্তনাদানের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিসমিল্লার মধ্যে রহমান ও রহীম এর উল্লেখ করার পর পুনরায় রব্বুল আলামীনের পরে রহমান ও রহীম এর পুনরাবৃত্তির কারণ এই যে, প্রত্যেক জিনিষের চেয়ে আল্লার দৃষ্টি তাঁর রহমত ও করুণার দিকে বেশী । কিংবা সৃষ্টিজীবের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পড়ে খোদার রহমতের । হযরত আবু হোরায়রা থেকে মরফুভাবে এসেছে, মোমিন যদি জানতে পারে ঐ শাস্তির কথা যা আল্লার কাছে আছে তাহলে কোন ব্যক্তিই বেহেস্তের আকাঙ্খা করবে না । আর কাফের যদি ঐ দয়ার কথা জানতে পারে যা আল্লার কাছে আছে তাহলে তাদের কেউই তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হবে না (মুসলিম) ।

মা-লেকে ইয়াও মিদ্দীন ঃ–বিচার দিনের কর্ত্তা । বিচার দিন হল সেই দিন যেদিন সমস্ত সৃষ্টিজীবের হিসাব-নিকাশ হবে তার আমল ও কৃতকর্মের, চায় তা ভাল হোক কিংবা মন্দ । প্রত্যেক কর্মী তার প্রতিফল পাবে । তবে কারো কারো দোষ

মাফ করে দেওয়া হবে । কোরআনে ঐ দিনের তফসীর এইভাবে এসেছে ঃ– وَمَا اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ অর্থাৎ তুমি জান কি বিচার দিন কি ? তা হল সেইদিন যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না । সেদিন কেবল আল্লারই হুকুম চলবে (সুরায়ে এনফেতার শেষ আয়াত) । সেদিনের মালিক ও হাকিম হবার অর্থ এই যে, আল্লাহ ছাড়া সেদিনে আর কারো হুকুম চলবে না, যেমন তারা দুনিয়ায় হুকুম চালাতো । অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী আলেমরা এই অর্থ করেছেন । আল্লাহ বলেন ঃ– لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۝ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ আজকের (কেয়ামতের) দিনে রাজত্ব কার ? একমাত্র আল্লার যিনি একক প্রভাবশালী (সুরায়ে মো'মেন ১৬ আয়াত) । কার সাধ্য সেদিনে তাঁর বিনা হুকুমে কেউ মুখ দিয়ে কোন কথা বলতে পারে ? আবু হোরায়রার হাদীসে মরফুভাবে এসেছে যে, সেদিন আল্লাহ মুঠোর মধ্যে নেবেন যমীনকে এবং ডান হাতে আসমানকে । তারপর তিনি বলবেন, আমি হলাম শাহানশাহ ! কোথায় গেল যমীনের বাদশারা, কোথায় গেল অত্যাচারী ও অহঙ্কারীরা ? (বোখারী ও মুসলিম) । সহীহায়নের অন্য রেওয়ায়াতে আবু হোরায়রা থেকেই মরফুভাবে বর্ণিত আছে, আল্লার নিকট সবচেয়ে লাঞ্ছিত নাম সেই ব্যক্তির, যার নাম হল মালেকুল আমলা-ক বা শাহানশাহ । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেই কোন সম্রাট আল্লাহ ছাড়া । দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে যে মালেক বা রাজা ও বাদশাহ বলা হয় তা পরোক্ষভাবে । এই পরোক্ষভাব কোরআনেও আছে । যেমন আল্লাহ বলেন ঃ– اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহরূপে পাঠিয়েছেন (সুরায়ে বাকারাহ ২৪৭ আয়াত) । অন্যত্রে আছে ঃ– وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ অর্থাৎ তাদের পেছনে এক বাদশাহ রয়েছেন । (সুরায়ে কাহফ্ ৭৯ আয়াত) । আর এক জায়গায় আল্লাহ বলেন ঃ– وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا এবং তিনি তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন (সুরায়ে মায়েদাহ ২০ আয়াত) । সহীহায়নে আছে ঃ– مَثَلُ الْمَلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ । মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন আয়াতে মা-লিকি مَالِكِ শব্দটি মালিকও (مَلِكِ) পড়া হয়েছে । দুরকমই কেরাআত প্রমাণিত আছে । ঐ দিনের মালিক বলাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ঐদিন ছাড়া আল্লাহ তাআলা অন্য দিনের মা-লেক কিংবা মালেক নন । কারণ, ওর আগেই তো 'রব্বুল আলামীন' শব্দটি বলা হয়েছে যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই শামিল আছে । এই আয়াত দ্বারা পরকালের পুনরুত্থান প্রমাণিত হয় এবং কেয়ামত সঙ্ঘটিত হবার কথা জানা যায় । যারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী তারা কাফের । এই পুনরুত্থান সশরীরে হবে , কেবল রূহানী ও আধ্যাত্মিক নয় । সেদিন আমলের হিসাবে নিকাশ প্রকৃতপক্ষেই হবে, কাল্পনিক ও পরোক্ষভাবে নয় ।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইয়্যাকা না'বোদো অইয়্যাকা নাস্তায়ীন ঃ–এই আয়াতে ভাগ্য অস্বীকারকারী এবং নিজেকে অসহায় মনেকারী উভয় প্রকার লোকেদের প্রতিবাদ রয়েছে। এখানে বহুবচন শব্দ প্রয়োগের কারণ এই যে, এই বাক্যের উচ্চারণকারী যেন সমস্ত একত্ববাদী বান্দার তরফ থেকে খবর দিচ্ছে। এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, তোমরা জামাআতবদ্ধ হোয়ে থাকো। জামাআত বলতে আহলে-সুন্নাত বোঝায়। সুন্নত বলা হয় রসুলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীসকে। এবাদত ও উপাসনা হল সাহায্য প্রার্থনার অসীলা। এইজন্য প্রথমে না'বোদো এবং তারপর নাস্তায়ীন বলা হয়েছে। "ইয়্যা-কা" শব্দটি না'বোদো ও নাস্তায়ীন শব্দদ্বয়ের আগে প্রয়োগের কারণে উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনা কেবলমাত্র আল্লার সাথে সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং একথা বোঝা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পূজার যোগ্য নয় এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা উচিত নয়। অতএব যখনই পূজা হবে তখনই আল্লাহকে পূজতে হবে এবং যখনই কোন সাহায্য চাইতে হবে তখন তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

সে কোন্ জিনিষ যা নেই খোদার কাছে
তা তোমরা চেয়ে থাক অলীদের কাছে ?

এবাদতের তাৎপর্য

অত্যন্ত অপমান ও নিজকে তুচ্ছজ্ঞান করার নাম হল এবাদত। এই হেয় ও তুচ্ছভাব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে প্রকাশ করা উচিত নয়। উপাসনা এবাদতের একটি নগন্য স্তর। এস্তেআনাত হল কাউকে একথা বলা যে, আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার দায় উদ্ধার করে দিন। ধর্মীয় সমস্ত ব্যাপার ঐ দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইজন্য কোন কোন সালাফ ও পূর্ববর্তী আলেম বলেছেন, সুরায়ে ফা-তেহা হল গোটা কোরআনের মূল এবং ফাতেহার মূল আছে এই দুটি বাক্যে। কারণ প্রথম বাক্যে শেরকের প্রতি বিরূপভাব রয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে নিজ শক্তি ও সামর্থের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করার পর নিজের প্রতিটি কাজকে মহান আল্লার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। এই ভাব অন্যান্য আয়াতেও পাওয়া যায়। যেমন– فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তুমি তাঁর এবাদত কর এবং তাঁরই উপরে ভরসা কর (সুরায়ে হূদ শেষ আয়ত)। قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ তুমি বল, তিনিই করুণাময়, আমরা তাঁর উপরে ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপরে ভরসা করেছি (সুরায়ে মুল্‌ক, ২৯ আয়াত)। رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا- অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক যিনি, তিনি ছাড়া পূজার যোগ্য আর কেউ নেই। সুতরাং তুমি তাকেই অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর (সুরায়ে মোযযামমেল ৯ আয়াত)। এই সুরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রশংসা

করেছেন, উত্তম গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন এবং বান্দাদেরকে হুকুম করেছেন যে, তোমরাও ঐভাবে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা কর। এইজন্যে যে ব্যক্তি সুরায়ে ফাতেহা পড়তে সমর্থ হোয়েও তা পড়েনা তার নামায শুদ্ধ হয় না। যেমন বোখারী ও মুসলিমে হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত থেকে মরফূভাবে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সুরায়ে ফাতেহা পড়েনা তার নামাযই হয় না।

ইবনে কাসীর বলেন, এবাদত একটি উচ্চ মর্যাদা। বান্দা ঐ মর্যাদা দ্বারা সম্মানিত হয়। কারণ, এবাদতের দ্বারা বান্দার সম্পর্ক আল্লার সাথে জুড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ স্থানে স্বীয় রসুলকে "আব্‌দ" শব্দ দ্বারা অভিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ (সুরায়ে কাহ্‌ফ প্রথম আয়াত)। অন্যত্রে বলেন ঃ– وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ (সুরায়ে জিন, ১৯ আয়াত)। আর এক জায়গায় বলেন ঃ– سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا (সুরায়ে বাণী ইসরাইল প্রথম আয়াত)। মোটকথা কোরআন নাযেলের সময়, লোকদের আল্লার দাঅত দেবার সময় এবং মে'রাজের সময় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসুলকে 'আব্‌দ' শব্দ দ্বারা অভিহিত করেছেন। বিরোধীদের বিরোধিতায় যখন রসুলুল্লার মন খারাপ হয় তখন তাঁকে এবাদতের হুকুম দিয়ে আল্লাহ বলেন وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তুমি তোমার প্রভুর এবাদত করতে থাক (সুরায়ে হিজ্‌র শেষ আয়ত)। সুফীরা বলেন যে, পুণ্যের আশা ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য এবাদত করা অর্থহীন। বরং এবাদত খাস কোরে আল্লারই উদ্দেশ্যে হওয়া চাই। জান্নাত ও জাহান্নামের স্বার্থ রাখা উচিত নয়। একথাগুলো ঠিক নয়। কারণ, এক দেহাতী আরবের হাদীসে আছে, যখন সে একথা বলে যে, আমি তোমার এবং মোআযের মত গুণগুণ করতে পারি না। আমি তো আল্লার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। তখন তার জওয়াবে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তুমিও তো ঐরূপ গুণগুণ করছ। আল্লাহ বলেন ঃ– يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا অর্থাৎ তারা দোযখের ভয়ে এবং বেহেস্তের লোভে আল্লাহকে ডাকে (সুরায়ে সাজদাহ, ১৬ আয়াত)। আবু তালহা বলেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে ছিলাম। এক যুদ্ধে যখন দুশমনদের সাথে আমাদের মোলাকাত হয় তখন হুযুর (সঃ) বলছিলেন ঃ– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ অতঃপর আমি দেখলাম বহু লোক যমীনে পড়ছে এবং আগে ও পিছে থেকে ফেরেস্তারা তাদেরকে মারছে। এই হাদীসটিকে ইমাম বাগাভী ও বারুদী মা'রেফাতুস সাহা-বাহ নামক কেতাবে এবং ইমাম তাবারানী আওসাতে ও আবু নোআইম দালায়েল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এইরূপ আর একটি ঘটনা আছে যে, দামেশকের গভর্ণরের সাথে দুশমনদের লশ্‌করের যখন মোকাবেলা হয় তখন তুমুল যুদ্ধের সময় বাদশাহ বলেন ঃ– يَا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ

http://islaminonesite.wordpress.com

হে খালেদ বিন অলীদ । ঐ সময় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ মওজুদ ছিলেন এবং জেহাদে শরীক ছিলেন । তিনি তখনই বাদশাহকে বলেন, আপনি একি বলছেন ? এইরূপ বলুন :-يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ الخ। তিনি তাই করলেন এবং ঐ শব্দগুলিই বললেন । ফলে আল্লাহ তাকে জয়ী করলেন । এই বরকত সে ঐ কলেমায়ে তওহীদও এবাদতে তাফরীদ (খাঁটি এবাদত) এবং আল্লার সাহায্য প্রার্থনার কারণে লাভ করে । অলিল্লাহিল হাম্দ ।

এহদেনাস্ সেরা-ত্বল মোস্তাকীম :-আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও, সরল পথে অটল রাখ এবং আগামীতেও আমাদেরকে সুপথ দেখাও যেমন বর্তমানে আমাদের সুপথ দেখিয়েছ । অন্যত্রে আল্লাহ বলেন :- وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى যারা সুপথ পেয়েছে তিনি (আল্লাহ) তাদের সুপথপ্রাপ্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন (সূরায়ে মোহাম্মাদ ১৭ আয়াত) । আর এক জায়গায় বলেন :-وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ যারা আমার ব্যাপারে সাধ্যসাধনা করে আমি তাদেরকে আমার পথগুলো অবশ্য অবশ্য বাতলে দেব (সূরায়ে আনকাবুত, শেষ আয়াত) ।

হেদায়াত ও সেরা-তের ভাবার্থ

"হেদায়াত" শব্দের অর্থ হল পথ দেখানোর উদ্দেশ্য সাধনে ঐশী শক্তি যোগানো, মনের মধ্যে ভাবের উন্মেষ ঘটানো, দয়া পরবশ হোয়ে এমন রাস্তা বাতলানো যদ্বারা গন্তব্যস্থানে পৌছানো যায় "মোস্তাকীম" এর অর্থ সোজা ও সমান জিনিষ । ইবনে কাসীর বলেন, সমস্ত তফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, সেরাতে মোস্তাকীম হল সেই খোলা পথ যার মধ্যে কোন রকম বাঁক নেই । সমস্ত ভাষাবিদরাও এই কথাই বলেন । এখানে সোজা পথের ভাবার্থ হল ইসলামের সঠিক পথ । নাওওয়াস ইবনে সামআন বর্ণিত হাদীসে ঐ পথকে ইসলাম বলা হয়েছে । ইবনে কাসীর ঐ হাদীসের সনদকে হাসান ও সহীহ অর্থাৎ উত্তম ও বিশুদ্ধ বলেছেন । ইবনে মসউদ বলেন, সেরাতের ভাবার্থ আল্লার কেতাব । অর্থাৎ আমাদেরকে কোরআনের উপর অমল করার তওফীক দাও । কেউ বলেন, সেরাতের ভাবার্থ হাদীসের পথ অর্থাৎ আমাদেরকে রসুলুল্লার হাদীসের পথ বাতলে দাও । কেউ বলেন, হজ্জের পথ । ইবনে আব্বাস বলেন, আমাদেরকে সত্যধর্মের পথ দেখাও । কেউ বলেন, আমাদেরকে জান্নাতের অধিকারী ব্যক্তিদের পথ বাতলে দাও । এসবের মধ্যে প্রথম উক্তিটি অধিক সঙ্গত । তবে যদি সব অর্থও নেওয়া হয় তাতেও আপত্তি নেই । ইবনে কাসীর বলেন, সেরাত শব্দের ভাবার্থে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের বিভিন্ন প্রকার উক্তি পাওয়া যায় । কিন্তু সবারই ভাবার্থ এক । অর্থাৎ আল্লাহ ও রসুলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং কোরআন ও হাদীসের অনুসরণ । ইবনে মসউদ বলেন, সেরা-তে মোস্তাকীম হল সেই পথ যার উপরে আমরা রসুলুল্লাহ (সঃ) কে বিদায় দিয়েছি ।

পুরস্কৃত বান্দা কারা

সেরা ত্বল লাযীনা আনআমতা আলায়হিম :-তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ-এর ভাবার্থ হল ঐ চার রকম লোক যাদের কথা সূরা নেসার ৬৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :-وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং রসুলের অনুগত হয় তারা সেইসব লোকদের সঙ্গী হয় যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন-যেমন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎশীল ব্যক্তিবর্গ । এঁদের সঙ্গ কতই না উত্তম ! ইবনে আব্বাস বলেন, এখানে আয়াতটির ভাবার্থ হল মুসা ও ঈসা আলায়হেমোস সালামের কওম অর্থাৎ সেইসব ইহুদী ও খৃষ্টান যারা তাদের প্রকৃত ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি । কিংবা রসুলুল্লার সাহাবায়ে কেরাম এবং পূত চরিত্র বংশধরগণ । অথবা সমস্ত ঈমানদার ও খোদা বিশ্বাসী সম্প্রদায় । এর মধ্যে প্রথম উক্তিটি অধিক সঙ্গত । এই আয়াতে একথারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সালাফ সালেহ ও পূর্ববর্তী সৎশীল ব্যক্তিদের অনুসারী হওয়া ভাল । সুতরাং একতেদা ও অনুসরণ এক জিনিষ এবং তকলীদ ও অন্ধ অনুকরণ অন্য জিনিষ । আল্লাহ বলেন :- فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ তুমি তাদেরই পথে চল (সূরায়ে আনআ-ম, ৯০ আয়াত) । অর্থাৎ তারা যেমন দীনদার ও একত্ববাদী ছিল, তেমনি তুমিও দীনদার এবং একত্ববাদের পূজারী হোয়ে যাও ।

ক্রোধের পাত্র ও পথভ্রষ্ট কারা

গায়রিল মাগযুবে আলায়হিম অলায য-ল্লীন :-তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার রাগ রয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্টও নয় । আদী ইবনে হাতেম বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে মরফুভাবে বর্ণিত আছে যে, মাগযুব আলায়হিম ও ক্রোধভাজন হল ইহুদীরা এবং যল্লীন ও পথভ্রষ্ট হল খৃষ্টানরা (আহমাদ ও তিরমিযী) । এইরূপ আবু যর বর্ণিত মরফু রেওয়ায়াতেও ঐ তফসীর বর্ণিত হয়েছে (ইবনে মারদাওয়হে) । সমস্ত সাহাবী ও মোফাসসেরগণও একথাই বলেন । এই তফসীরে কারো মতভেদ নেই । কেউ বলেন, বেদআতের কারণে রাগ হয়েছে এবং সুন্নত থেকে সরে গিয়ে পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে । এটা হল আল্লামা কুরতবীর উক্তি । কেউ বলেন, ওর মধ্যে সমস্ত কাফের-পাপী ও বেদআতী গণ্য । কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে তফসীর রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত । অর্থাৎ ওর ভাবার্থ হল কেতাবধারী ইহুদী ও নাসারা । ওদের রীতিনীতি ঈমানদারদের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন । কারণ ঈমানদারদের নীতি সত্য জ্ঞান ও সঠিক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু ইহুদীরা আমল থেকে বিচ্যুত এবং খৃষ্টানরা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত । এইজন্য ইহুদীদের উপর রাগ করা হয়েছে এবং খৃষ্টানদের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । কারণ, যে ব্যক্তি জ্ঞানী হোয়েও কাজ করে না সে ক্রোধের পাত্র হয় । এর বিপরীত হল ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি মোটেই জ্ঞান রাখে না মূর্খ থাকে ।

http://islaminonesite.wordpress.com

খৃষ্টানরা সত্যকে পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা পথ পায়নি। ফলে তারা পথহারা হয়েই থেকে যায়। ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ই পথভ্রষ্ট এবং ক্রোধগ্রস্থ। কিন্তু ক্রোধগ্রস্থের ব্যাপারে ইহুদীরা খৃষ্টানদের চেয়েও মারাত্মক। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ– من لعنه الله وغضب عليه আল্লাহ যাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং যার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন (সূরায়ে মা-য়েদাহ ৬০ আয়াত)। অন্যত্রে বলেন ঃ–
فباءوا بغضب على غضب তারা গযবের উপর গযব নিয়ে ফিরেছে (সূরায়ে বাকারা ৯০ আয়াত। নাসারাদের গোমরাহী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ– ولا تتبعوا أهواء قوم ... مريم অর্থাৎ তোমরা সেই জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরনা যারা আগে থেকেই পথহারা হয়েছে এবং বহু লোককেও তারা পথভ্রষ্ট করেছে। আর তারা সবাই সঠিক পথ থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। বানী ইসরাইলদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও ঈসার মুখ দিয়ে লা'নত ও অভিসম্পাত করা হয়েছে (সূরায়ে মায়েদা ৭৭-৭৮ আয়াত)। উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, হাদীস ছাড়া কোরআন দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মাগযুব আলায়হিম ও যল্লীন হল ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ।

এই সূরাটির শুরুতে হামদ ও প্রশংসা আছে এবং শেষে যম্ম ও নিন্দা রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সবরকম কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ হল আল্লার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং সবরকম বিপদ ও বিরোধিতার মূল হল আল্লার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাঁর এবাদত ও আনুগত্য থেকে বিরত হওয়া। যার পরিণতি খোদার গযব ও গোমরাহী হয়। এই সূরাতে ৪ রকম বিদ্যার উল্লেখ আছে। এক–মূল বিদ্যা। আলহামদো লিল্লাহ থেকে রহিম পর্যন্ত ওরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আনআমতা আলায়হিম দ্বারা নবীদের সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া যায় এবং মা-লেকে ইয়াও মিদ্দীন দ্বারা পরকালের বিষয় প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বিদ্যা হল শাখাপ্রশাখা বিদ্যা। এই বিদ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিষ আল্লার এবাদত, চায় তা আর্থিক হোক, কিংবা দৈহিক। এই বিদ্যা ইয়্যা-কা না'বোদো দ্বারা প্রমাণিত হয়। তৃতীয় বিদ্যা হল নীতি ও চরিত্র বিদ্যা, যা ইয়্যা-কা নাস্তায়ীন থেকে মোস্তাকিম পর্যন্তর মধ্যে পাওয়া যায়। চতুর্থ বিদ্যা হল ইতিহাস। অর্থাৎ অতীত জাতিসমূহের মধ্যে কারা সচ্চরিত্র ও কারা দুশ্চরিত্র ছিল তার কাহিনী। যা আনআম্‌তা আলায়হিম থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত দ্বারা জানা যায়। এই সূরাটি কোরআনের বিভিন্ন বিদ্যা সম্বলিত হবার ব্যাপারে ইমাম গাযযালী ও ইমাম রাযী বিশদ আলোচনা করেছেন। ইমাম রাযী এই সূরা দ্বারা দশ হাযার মসলা বের করেছেন।

`আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন নাযেলের একটা মহৎ উদ্দেশ্য হল খাঁটি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং শিরক থেকে সবাইকে বিরত রাখা। একথা সবাই জানে যে, আল্লাহ তাআলা তওহীদ প্রচারের জন্যই রসূলদের দুনিয়ায় পাঠান এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই আসমানী কেতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন। এতে কারো যদি

সন্দেহ হয় তাহলে তিনি কোরআন শরীফ নিয়ে গবেষণা করলে বুঝতে পারবেন যে, কোরআন অবতীর্ণের একটা মহৎ উদ্দেশ্য হল তওহীদ প্রতিষ্ঠা। যদি কেউ গোটা কোরআন নিয়ে মাথা ঘামাতে অক্ষম হয় তাহলে সে যেন এই সূরা ফাতেহার মধ্যে চিন্তাভাবনা করে। এর ৩০টি জায়গা হতে খাঁটি তওহীদের বর্ণনা প্রমাণিত হয়। তফসীর ফতহুল বায়ান ও দ্বীনে খালেস প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত ৩০টি বর্ণনা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেন, "যল্লীন" শব্দের উচ্চারণে অনেক (যোয়াদ) ও (যো) বর্ণের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেন। এ ব্যাপারে আলেমদের সঠিক মত এই যে, ঐ গোলমাল ক্ষমাযোগ্য। কারণ, উক্ত দুটি বর্ণের উচ্চারণ খুবই কাছাকাছি। পাশের দাঁতের মাঝখান এবং জিভের মুখপাতের পাশ-কিনারা থেকে "যোয়াদ" উচ্চারিত হয় আর সামনের দাঁতের কিনারা এবং জিবের ডগা দিয়ে "যো" উচ্চারিত হয়। দুটিই হরফ তাজভীদ শাস্ত্রের "মাহজুরাহ রেখ্‌ওয়াহ মোত্‌বাকাহ" পরিভাষার অন্তর্গত। সেইজন্য যদি কেউ এই দুই হরফের মধ্যে পার্থক্য না করতে পেরে এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে সে ক্ষমার পাত্র হবে। থাকলো ঐ হাদীস যাতে বলা হয়েছে ঃ– انا افصح من نطق بالضاد অর্থাৎ যে ব্যক্তি যোয়াদের সঠিক উচ্চারণ করতে পারে তার মধ্যে আমিই সবচেয়ে উচ্চারণ-পটু– হাদীসটি ভিত্তিহীন।

এই সুরাতে ৭টি আয়াত আছে। এত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে আল্লার হামদ, প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা রয়েছে, তাঁর উত্তম নাম ও গুণাবলীর বিবরণ আছে, পরকালের কথাও আছে। বান্দাকে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের শক্তি সামর্থের বড়াই না কোরে নিজেদের হীন মনে করতঃ আল্লার কাছে কাকুতি মিনতি কর এবং তাঁর এবাদতের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে, খোদার খোদায়ীর মধ্যে একত্ববাদ ও তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে এককত্বের প্রমাণ দাও; আল্লাহকে শরীকহীন, নযীর বিহীন ও অদ্বিতীয় মনে কর; দৃঢ় ও মজবুত ধর্মে এবং সেরাতে মোস্তাকীমের সোজা পথে অটল থাকে। যাতে করে তোমরা সর্বশেষে জান্নাতের মধ্যে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎশীলদের সঙ্গ পাবে। এই সুরাতে ভাল ভাল কাজ করার উৎসাহ প্রদান আছে, যাতে ঐ কাজের কাজীরা কেয়ামতের দিনে সৎলোকদের সাথে থাকতে পারে। এতে বাতিল ও মিথ্যা মতবাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনও আছে, যাতে খোদার সত্যিকার বান্দাদের হাশর বাতিল দলের সাথে না হয়।

এনআম ও পুরস্কার খুবই উত্তম জিনিষ। সেইজন্য এর সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা নিজের দিকে করেছেন। আর গযব ও গোমরাহী জঘন্য চীয। সেজন্য ওর কর্তার উল্লেখ করা হয়নি। যদিও দুটো বস্তুরই প্রকৃত কর্তা আল্লাহ নিজেই। যেমন তিনি বলেন ঃ– وغضب الله عليهم অর্থাৎ আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন

http://islaminonesite.wordpress.com

(সুরায়ে ফাত্হ ৬ আয়াত)। অন্যত্রে বলেন :— وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا অর্থাৎ তিনি যাকে পথ ভুলিয়ে দেন তুমি তার কোন পথ প্রদর্শক কখনই পাবে না (সুরায়ে কাহ্ফ ১৭ আয়াত)। আর এক জায়গায় বলেন :— وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথপ্রদর্শকই নেই (সুরায়ে আ'রা-ফ, ১৮৬ আয়াত)। এইরূপ বহু আয়াত আছে যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা পথ দেখানো ও পথ ভোলানোর ব্যাপারে একক শক্তির অধিকারী সে যা চায় তা সে করতে পারে। তারা এর প্রমাণে কোরআনের মুতাশাবেহ ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলো পেশ করে। আর যে আয়াতগুলো তাদের স্পষ্ট বিরোধিতা করে সেগুলোকে তারা ছেড়ে দেয়। এইরূপই অবস্থা হল সমস্ত গোমরাহ ও বাতিল ফের্কার। সহী হাদীসে এসেছে, যখন তোমরা ঐসব লোকদের দেখবে যারা কোরআনের মোতাশা-বেহ (যার অর্থ স্পষ্ট নয়) আয়াতের খোঁজ করে আল্লাহ তাআলা তাদের নামও করেছেন—তাদের থেকে তোমরা দূরে থেকো। ইবনে কাসীর বলেন, খোদার অশেষ হাম্‌দ যে, কোরআনে বেদআতীদের উদ্দেশ্য প্রমাণে কোন সঠিক দলীল নেই। কোরআন তো বাতিল থেকে হককে এবং গোমরাহী থেকে সুপথ প্রাপ্তিকে আলাদা ও পার্থক্য করার জন্যই এসেছে। ওর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কেন থাকবে ? ওটা তো হাকীম ও হামীদ, বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লার তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমীনের রহস্য

সুরায়ে ফাতেহা পড়ার পর আমীন বলা সুন্নত। আমীনের অর্থ হল—আল্লাহ গো এটাকে কবুল কর। এই দোআকে সার্থক কর। (১) অয়েল ইবনে হুজ্র বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) যখন "অলায যল্লীন" বলেন তখন আমি তাঁকে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি শব্দটি লম্বা কোরে বলেন (মোসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও উত্তম বলেছেন। ঐ হাদীসের শব্দে مد بها صوته (মোদ্দা বেহা সওতাহু) শব্দ আছে। যার অর্থ হল তিনি (সঃ) আমীন বলার সময় আওয়াযটি একটু টান দিয়ে বলেন। আবু দাউদে আছে :— رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (রফাআ বেহা-সও্তাহু)। অর্থাৎ তিনি (সঃ) আমীন বলার সময় আওয়াযটি উচ্চস্বরে ও চিল্লে বলেন, নীরবে নয়। অন্য বর্ণনায় মরফুভাবে এসেছে যে, তিনি (সঃ) رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِين (রব্বেগ ফেরলী আ-মীন) বলতেন—তাবারানী। আবু হোরায়রার শব্দ এই যে, যখন তিনি 'অলায য-ল্লীন' পড়তেন তখন আমীন বলতেন। প্রথম

(১) সংযোজন :—আবু মায়সারাহ থেকে বর্ণিত, জিবরায়ীল (আঃ) যখন রসুলুল্লাহকে (সঃ) সূরায়ে ফাতেহা পড়ান। অতঃপর তিনি অলায যল্লীন পর্যন্ত পৌছলে তখন তিনি বলেন, আপনি বলুন, আমীন। ফলে তিনি (সঃ) আমীন বললেন (ইবনে আবী শায়বা, ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)। অনুবাদক।

কাতারের যারা তাঁর কাছাকাছি থাকতেন তারা তা শুনতে পেতেন (আবু দাউদ)। ইবনে মাজায় এতটা বাড়তি আছে :— فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ (ফেইয়ারতাজ্জু বেহাল মাসজিদু)—অর্থাৎ আমীন শব্দ দ্বারা মসজিদ গমগম কোরে উঠতো। ইমাম দারকুতনী বলেন, হাদীসটির সনদ উত্তম। সহীহায়নে (বোখারী ও মুসলিমে) হযরত আবু হোরায়রা থেকে মরফুভাবে এসেছে যে, যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ, যাঁর আমীন বলাটা ফেরেশ্‌তাদের আমীনের মোতাবেক হবে তার আগেকার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। মুসলিম শরীফের শব্দ এই যে, যখন তোমাদের কেউ নামাযে আমীন বলে এবং ফেরেশ্‌তারাও আকাশে আমীন বলে তখন যার আমীন ওদের আমীনের মোতাবেক হয় তার পূর্বকার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। মোতাবেক হবার ভাবার্থ এই যে, উভয়ের আমীন বলার সময় এক হওয়া কিংবা কবুল হওয়া অথবা নিষ্ঠা সহকারে হওয়ার ব্যাপারে সমতা হওয়া। আবু মুসা মরফুভাবে বলেন, ইমাম যখন অলায যল্লীন বলবে তখন তুমি আমীন বল। ফলে আল্লাহ তোমার দোআ কবুল করবেন (মুসলিম)। হযরত আয়েশার বর্ণনায় আছে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ইহুদীরা তোমাদের উপরে এতবেশী হিংসা কোন ব্যাপারে করে না যতটা তোমাদের সালাম ও আমীন বলার ব্যাপারে করে (ইবনে মাজা)। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আমীন বলা যাকে খারাপ লাগে তার মধ্যে ইহুদী ভাব আছে। আয়েশার অন্য বর্ণনায় আছে, একবার রসুলুল্লার সামনে ইহুদীদের কথা উঠলো। তখন তিনি বললেন, তারা (ইহুদীরা) আমাদের উপর অত হিংসা করে না যতটা করে জুমআর ব্যাপারে। আল্লাহ আমাদের বলেন যে, এ ব্যাপারে তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। আর কেবলার ব্যাপারে তারা আমাদের উপরে খুব জ্বলে। আল্লাহ আমাকে বলেন, তারা (কা'বাকে) কেবলারূপে পায়নি। আর ইমামের পেছনে আমীন বলার ব্যাপারেও তাদের খুব জ্বাল হয় (মোসনাদে আহমাদ)।

ইবনে কাসীর বলেন, "ইমাম যদি চিল্লে আমীন বলতে ভুলে যায় তাহলে মোক্তাদীরা একবার চিল্লে আমীন বলবে। আর ইমাম যদি চিল্লে আমীন বলে তাহলে মোক্তাদীরা চিল্লে বলবে না। এটা হল ইমাম আবু হানীফার মত। ইমাম আহমাদের মতে মোক্তাদীরাও চিল্লে বলবে। তৃতীয় মত এই যে, মসজিদ যদি ছোট হয় তাহলে মোক্তাদী যেন চিল্লে না বলে যাতে তারা ইমামের পড়া শোনে। মসজিদ যদি বড় হয় তাহলে চিল্লে বলবে যাতে মসজিদের চারদিকে আমীনের আওয়ায পৌছে যায়।" এই কারণ বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। বরং চিল্লে ও নীরবে দুভাবেই আমীন বলার প্রমাণ আছে। চিল্লে ঐ সময় বলা উচিত যখন বেদআতের কারণে কোন সুন্নত মরে যাচ্ছে তখন তাকে জ্যান্ত করার প্রয়োজন। আর চিল্লে বলার ফলে যদি লড়াই ঝাগড়া দেখা দেয় তাহলে নীরবে বলাই সময়ের তাগিদ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আল্লা-হো আ'লাম। ফুযেহুল কোরআনে আছে, এই সুরাটি আল্লাহ তাআলা বান্দার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, যাতে তারা ঐভাবে বলে।

http://islaminonesite.wordpress.com

সূররাতুন না-স

এই সূরাতে ৬টি আয়াত আছে। (১) ইবনে আব্বাস বলেন, ইহা মক্কী এবং ইবনে যোবায়ব বলেন, মাদানী। হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম বাদায়েউল ফাওয়া-য়েদে বিশ পৃষ্ঠা ধরে সূরা নাস ও ফালাকের অভিনব ফায়দার কথা লিখেছেন। যার বিবরণ এখানে দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ ওর সম্পর্কটা পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের সাথে জড়িত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ إِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۥ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

বাংলা উচ্চারণ ঃ–১। কুল আউযু বিরব্বিন না-স। ২। মালিকিন না-স ৩। এলাহিন না-স। ৪। মিন শাররিল অস্ওয়া-সিল খাননা-স। ৫। আল্লাযী ইয়ো অস্‌বিসো ফী সুদূরিন না-স। ৬। মিনাল জিন্নাতি অন্না-স।

তরজমা

১। (হে মোহাম্মদ (সঃ)!) তুমি বল, আমি মানুষের রব্বের (প্রতিপালকের)। ২। মানুষের মালিকের। ৩। মানুষের উপাস্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ৪। সেই লুক্কায়িত কুমন্ত্রণা দানকারীর দুষ্কৃতি থেকে। ৫। যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দান করে। ৬। জিন ও ইনসানের মধ্য হতে।

তফসীর

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহের কাছে পানাহ চাওয়ার জন্য এই সূরা নাস ও ফালাকের সমতুল্য আর কোন দোআ নেই। ইবনে কাসীর বলেন যে, রবুবিয়্যাত (প্রতিপালন), মালিকিয়্যাত (স্বত্ববান হওয়া) ও এলাহিয়াত (এবাদতের যোগ্য হওয়া) এই তিনটি আল্লাহ তাআলার গুণ। তিনি প্রত্যেক জিনিষের প্রতিপালক, স্বত্বাধিকারী ও এবাদতের যোগ্য এবং সমস্ত বস্তু তাঁর সৃষ্টবস্তু, মালিকানাধীন ও গোলাম। এই জন্য আশ্রয় প্রার্থীকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, সে ঐব্যক্তির নিকট পানাহ চাক যিনি

(১) সংযোজন ঃ–এই সূরাতে ১টি রুকু ৬টি আয়াত, ২০টি শব্দ এবং ৮০টি হরফ আছে (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)।

ঐসব গুণে গুণান্বিত। আর এই পানাহ খান্নাস অসওয়া-সের দুষ্কৃতি হতে অর্থাৎ শয়তান হতে যাকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ–তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, যার সাথে তার একজন "কারীন" (সঙ্গী) নিযুক্ত করা হয়নি। সাহাবীরা বললেন ঃ–হে আল্লার রসুল। আপনিও কি তাই। তিনি বললেন, হাঁ, আমিও তাই। তবে আল্লাহ আমার উপর মদদ করেছেন। তাই সে আমার বশীভূত হয়ে গেছে। সে আমাকে ভাল ছাড়া কোন মন্দ কাজের হুকুম দেয়না। হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম (সঃ) এ'তেকাফের অবস্থায় হযরত সাফিয়্যার (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। দুজন আনসারী তাঁকে সাফিয়্যার সাথে কথা বলতে দেখে তাড়াতাড়ি চলতে থাকে। তিনি (সঃ) বললেন, দাঁড়াও, ইনি হোয়াইয়ের কন্যা সাফিয়্যা (আমার স্ত্রী)। তারা বললো, সুবহা-নাল্লাহ! হে আল্লার রসুল! (অর্থাৎ আপনার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ হতে পারে কি ?) তিনি বললেন ঃ– إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

অর্থাৎ রক্ত চলাচলের মত শয়তান আদম সন্তানের শিরা উপশিরায় চলাচল করে। তাই আমার আশঙ্কা হল যে, হয়ত তোমাদের মনে অন্য কোন ধারণা আসতে পারে (বোখারী মুসলিম)। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে মরফুভাবে বর্ণিত যে, শয়তান আদমসন্তানের অন্তরে তার শুঁড়টি রেখে দেয়। যদি সে আল্লার যেক্‌র করে তাহলে সেটা সরে যায়। আর যদি সে আল্লাহকে ভুলে যায় তাহলে শয়তান তার দিলটাকে "লোকমাহ" বানিয়ে নেয়। এটাই অস্ওয়া-স-খান্নাস (আবু ইয়ালা)। আবু তামীমাহ (রাঃ) বলেন যে, আমি একদিন রসুলুল্লার গাধার পেছনে আরোহী ছিলাম। হঠাৎ গাধাটি ঠোকর খেল। আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। তিনি বললেন, تَعِسَ الشَّيْطَانُ "তায়িসাশ্ শায়ত্বান" (শয়তান ধ্বংস হোক) বলনা। কারণ যখন তুমি এরূপ বলবে তখন সে তোমাকে মন্দ ভাববে এবং বলবে যে, আমি আমার শক্তি দিয়ে তাকে আছাড় মেরেছি। আর যখন তুমি বিসমিল্লাহ বলবে তখন সে ছোট হোয়ে মাছির মত হয়ে যাবে (মোসনাদে আহমদ)। এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন দিল যখন আল্লাহকে ইয়াদ করে তখন শয়তান সিটকে যায় এবং হেরে যায়। আর যখন কেউ আল্লাহকে স্মরণ করেনা তখন সে বড় হয় এবং জিতে যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যে কেউ যখন মসজিদে থাকে তখন শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলবার চেষ্টা করে যেমন করে মানুষ তার পোষা জানোয়ারকে আস্তে আস্তে টিপতে থাকে। অতঃপর জানোয়ারটি যখন চুপ করে থাকে তখন সে হয় তাকে বশ করে ফেলে, কিংবা তার মুখে লাগাম লাগিয়ে দেয়। আবু হোরায়রা বলেন ঃ–তোমরা এ অবস্থায় দেখে থাকবে যে, যে বশীভূত হয় সে গাফেল হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে না, আর যাকে লাগাম দেওয়া হয় সে মুখ খুলে থাকে এবং সেও খোদার যিক্‌র করে না (মোসনাদে আহমদ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) "অসওয়াস-খান্নাসের" অর্থে বলেছেন যে, শয়তান আদম সন্তানের দিলে বসে আছে। অতঃপর যখন সে ভুল করে ও অসাবধান হয় তখন শয়তান "অসওয়াসা" বা কুমন্ত্রনা দেয়। এবং যখন সে আল্লাহর যেক্‌র করে তখন শয়তান সরে যায়। বিখ্যাত তফসীরকার মোজাহেদ ও কাতাদাহও একথা বলেন। মো'তামারের পিতা সোলায়মান বলেন ঃ–আমি শুনেছি যে, শয়তান কিংবা অসওয়া-স আদম সন্তানের হৃদয়ে দুঃখ ও আনন্দের সময় একটা পর্দা লাগিয়ে দেয়। যখন সে আল্লাহর যেক্‌র করে তখন শয়তান পালিয়ে যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অসওয়া-সের অর্থ হল শয়তান। সে হুকুম করে। যখনই তার কথা মানা হয় তখনই সে ঢুকে পড়ে। এই কুমন্ত্রনাদানকারী কখনো মানুষ হয় এবং কখনো জিনও হয়। যেমন আল্লাহতাআলা বলেন ঃ– وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا (একাযালেকা জাআলনা লেকুল্লে নাবিয়্যিন আদুওআন্ শাইয়া-তীনাল ইনসে অল জিন্নে ইউহী বা'যহুম এলা বা'যিন যুখ্‌রোফাল কাওলে গুরুরা) আর এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও ইনসানের মধ্য হতে শয়তান দুশমন তৈরী করে দিয়েছি যারা একে অপরকে ধোকা দেওয়ার মনোরম কথা শেখায় (সূরা আনআম ১১৩ আয়াত)।

হযরত আবু যর বলেন ঃ–আমি একদিন রসুলুল্লাহর কাছে গেলাম। তিনি মসজিদে ছিলেন। আমি এসে বসে গেলাম। তিনি বললেন, হে আবু যর! তুমি কি নামায পড়ে নিয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তবে ওঠ এবং নামায পড়ে নাও। সুতরাং আমি উঠে নামায পড়লাম। তারপর বসে গেলাম। এবার তিনি (সঃ) বললেন ঃ– تعوذ من شر شياطين الانس والجن. (তাআওআয্ মিন শাররি শায়া-তীনিল ইন্‌সি অলজিন্নি)–অর্থাৎ মানুষ ও জিন শয়তানের দুষ্কৃতি থেকে তুমি পানাহ চাও। আমি বললাম, মানুষ শয়তান হয় নাকি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, হে আল্লার রসুল! নামাযের হাল কি? তিনি বললেন ঃ– خير موضوع من شاء اقل او اكثر- (খায়রুন মাওযুউন মান শা-আকাল্লা অমান শা-আ আকসারা)–অর্থাৎ এটা একটি উত্তম কাজ, যার মন চায় কম করুক এবং যার মন চায় বেশী করুক। আমি বললাম রোযার কি অবস্থা? তিনি বললেন ঃ–فرض مجزى وعند الله مزيد (ফারযুন মুজ্‌যিউন অইনদাল্লা-হি মাযীদুন)–অর্থাৎ এটা একটি ফরয কাজ যা যথেষ্ট এবং আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বেশী। আমি বললাম, সদকার শান কি? তিনি বললেন ঃ– اضعاف مضاعفة (আয্ আ-ফুম মুযা-আফাহ)–অর্থাৎ একগুণের বদলে বহুগুণ পাওয়ার জিনিষ। আমি বললাম, কোন্ সদকা সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ– جهد من مقل او سر الى فقير (জুহদুম মিম মুকিল্লিন আও সিররুন ইলা ফাকীরিন)–অর্থাৎ অভাব থাকা সত্ত্বেও যা দেওয়া যায়

কিংবা লুকিয়ে কোন ফকীরকে যা দেওয়া হয়। আমি বললাম, হে আল্লার রসুল! কোন্ নবী সর্বপ্রথম ছিলেন? তিনি বললেন ঃ হযরত আদম আলায়হেস সালাম। আমি বললাম, তিনি কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ তিনি মোকাল্লাম (কথোপকথনকারী) নবী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন। আমি বললাম, রসুল কতজন? তিনি বললেন ঃ তিনশো আরো কিছু বেশী দশ কিংবা পনের। আমি বললাম, আপনার উপর যা নাযেল হয়েছে তার মধ্যে অতি উত্তম কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আ-য়াতুল কুরসী–আল্লা-হো লা-ইলা-হা ইল্লা হুআল হাইয়ুল কাইয়ুম (মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ী)। আবু হাতেমও এই হাদীসটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে অন্য সনদ ও অন্য শব্দ দ্বারা এই রেওয়াতটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আসে এবং বলে ঃ–হে আল্লার রসুল! আমি নিজের মনে এমন এমন কথা বলি যে, সে কথাগুলো প্রকাশ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়া আমার কাছে অনেক ভাল মনে হয়। তখন হযরত (সঃ) বললেন ঃ–আল্লাহো আকবার আল্লাহো আকবার আলহামদো লিল্লা-হিল্ লাযী রাদ্দা কায়দাহূ এলাল অসওসাহ অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তার (শয়তানের চক্রান্তকে অসওসায় বা কুমন্ত্রনায় পাল্টে দিয়েছেন (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

ফতহুল বায়ানের খোলা বায়ান এই যে, রব্বের অর্থ হল মুরব্বি এবং সবরকম পরিস্থিতির সংশোধনকারী। আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব। এখানে মানুষের মান ও মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কেবল "মানবের রব্ব" বলা হয়েছে। কিংবা এখানে যে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে তা কেবল সেই দুষ্কৃতি থেকে যা মানুষের অন্তরসমূহের মধ্যে সৃষ্ট হয়। "মালিকিন না-সে" এই বর্ণনা আছে যে, আল্লার মালিকানা বা বাদশাহী ঐরূপ বাদশাহী নয় যে, যার অধীনে কেবল চাকর-বাকর আছে। বরং তাঁর প্রতাপশালী সালতানাত ও পূর্ণাঙ্গ মালিকানা সব জিনিষেরই উপরে আছে। "এলাহিন নাসে" দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর রবুবিয়্যাত (প্রতিপালন) গুণের সাথে মা'বুদিয়্যাত (এবাদতের যোগ্য হওয়া) ও উলুহিয়াত (আল্লাহ হওয়া) গুণটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা কোন জিনিষকে সৃষ্টিকরা ও ধ্বংস করার ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা দানের জন্য অপরিহার্য। রব্ব কখনো মালিক হয় আবার কখনো নয়। যেমন রববুদদা-র (ঘরের মালিক) ও রববুল মাতাঅ্ (মালপত্রের মালিক)। এরূপ আল্লাহ বলেন ঃ– اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (এত্তাখাযু আহ্‌বা-রাহুম অরুহবা-নাহুম আরবা-বাম মিন দুনিল্লা-হি (তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে) এই জন্য রব্বের পর "মালিকের" উল্লেখ করা হয়েছে। কখনো কোন মালিক এলাহ (পূজার যোগ্য) হয়

http://islaminonesite.wordpress.com

আবার কখনো নয়। এইজন্য মালিকের পর "এলাহিন্ না-সও" বলা হয়েছে।

সূরাটি প্রথমে রব্ব দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এই রব্ব তাঁরই নাম যিনি মানুষকে শিশু বেলা থেকে যৌবন পর্যন্ত এবং বুদ্ধি ও জ্ঞান পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করেন। যাতে মানুষ প্রমাণাদি দ্বারা এটা বুঝতে পারে যে, আমি এক রব্ব-মালিকের বান্দাহ ও গোলাম। সুতরাং যখন সে একথা জানতে পারবে যে, আমার উপর তাঁর এবাদত ফরয এবং আমি তাঁরই সৃষ্ট গোলাম আর তিনি এলাহ ও মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) তখন মালিকের পর এলাহিন না-স উল্লেখের রহস্যটা তার সামনে ফুটে উঠবে। "নাস" শব্দটি বারবার আনার মূলে মানুষের অধিক মর্য্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। কিংবা প্রথম না-স দ্বারা শৈশব কাল, দ্বিতীয় না-স দ্বারা যৌবনকাল, তৃতীয় না-স দ্বারা বৃদ্ধকাল, চতুর্থ না-স দ্বারা সালেহীন বা সৎলোক এবং পঞ্চম না-স দ্বারা ফসাদীলোক বা অরাজকতা সৃষ্টিকারী লোক সমূহকে বোঝান হয়েছে। তবে এটা কিন্তু কোন তফসীরের কথা নয়, বরং এটা আল্লামা নাসাফীর সূক্ষ্মতত্ত্বের কথা।

"অসওয়া-স" এর অর্থ হল অসঅসাহ ও কুমন্ত্রনা দানকারী। অসঅসাহ মনের কথাকে বলে। কেউ কেউ বলে অসওয়া-স হল শয়তানের ছেলের নাম। "খাননা-স" এর অর্থ হল "কাসীরুত তা আখ্খোর" বা অধিক পশ্চাদগামী। বেশীর ভাগ লুকিয়ে থাকে বলে খান্নাসের নাম খান্নাস হয়েছে। তার অসঅসাহ এই যে, সে লুকিয়ে লুকিয়ে চুপ করে মানুষকে তার অনুগত হবার জন্য ফুসলাতে থাকে। পরিশেষে তার কথাগুলো মানুষের মনে গেঁথে যায়। এই শয়তান দুরকমের হয়। এক জিন-শয়তান, যারা অন্তরে অসঅসাহ দেয় এবং দ্বিতীয় শয়তান মানুষ-শয়তান, যারা মানুষের সামনে নিজেকে হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী বলে প্রকাশ করে। শয়তানের অসঅসায় মানুষের অন্তরে যে ভাব সৃষ্টি হয় ঐরূপ এদের কথায় সেই ভাব পয়দা হয়। কিংবা এর অর্থ এই যে, শয়তান জিন ও মানুষের দ্বারা মানুষের অন্তরসমূহে অসঅসাহ দেয়। কেউ কেউ বলেন "না-স" শব্দের মধ্যে জিন ও ইনসান উভয়েই শামিল। কারণ, একদা জিনের কয়েক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর কাছে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা ? তারা বলে : "না-সুম মিনাল জিন্নে" অর্থাৎ আমরা জিন্নদের লোক। আল্লাহ তাদের নাম "রিজাল" বলেছেন : كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ- (কা-না রিজা-লুম মিনাল ইন্‌সি ইয়ায়ুযুনা বেরিজালিম মেনাল জিন্নি)–অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কতিপয় লোক জিন্নদের কিছু লোকের শরণ চাইতো। উত্তম কথা এই যে, পানাহ চাওয়ার অর্থ হল "অসওয়া-সের" (কুমন্ত্রণাদানকারীর) দুষ্কৃতি এবং মানুষের কুকীর্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা। জিন-শয়তান অন্তরসমূহে অসঅসাহ দেয় এবং মানুষ-শয়তান প্রকাশ্যে আসে। কেউ কেউ বলেছেন যে, শয়তান যেরূপ মানুষের দিলে অসঅসাহ দেয় সেইরূপ সে জিনের অন্তরেও কুমন্ত্রণা দেয়। "মেনাল জিন্নাতে অন্না-স" এর মধ্যে "সাকালায়ন" বা জিন

ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দুজন থেকে আল্লাহর পানাহ চাইবে তার থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

কোরআন খতমের পর কর্ত্তব্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি একদা রসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোন্ আমল আল্লার নিকট বেশী প্রিয় ? তিনি (সঃ) বলেন : "আলহাল্লু মোরতাহেল"। জিজ্ঞাসা করা হল তা কি জিনিষ ? তিনি বললেন : الَّذِىْ يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِ الْقُرْاٰنِ اِلٰى اٰخِرِهٖ كُلَّمَا حَلَّ اِرْتَحَلَ- (আল্লযী ইয়াযরেবু মিন আউঅলিল কোরআ-নি ইলা-আ-খিরিহী কুল্লামা হাল্লারতাহালা)–অর্থাৎ সেই ব্যক্তি 'হাল্ল ও মোরতাহেল' যে কোরআনে হাকীমকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে এবং শেষ করবার সাথে সাথেই আবার গোড়া থেকে শুরু করে (তিরমিযী শরীফ)। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যখনই কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত শেষ হবে তখনই আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে এই নিয়্যাতে যে, আবার দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, এভাবে অসংখ্য বার শেষ করে পুনরায় শুরু করে পড়তে থাকবে। কখনই আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত ত্যাগ করবেনা। এর মধ্যে দেখে পড়নেওলা ও মুখস্থ পড়নেওলা উভয়ই শামিল। এরূপ করার কারণ এই যে, আল্লাহর কেতাব পাঠ করার চেয়ে আর কোন ভাল আমল নেই।

এর মধ্যে মহানবীর উপর দরুদ পাঠের কথারও উল্লেখ এসেছে। কোরআন মাজীদের ফযীলত অগণন। আলেমরা এই ফযীলত সম্পর্কে বহু গ্রন্থ লিখেছেন। তাছাড়া স্বয়ং কোরআন ও হাদীস তো সুরা ও আয়াতের ফযীলতে ভরপুর। এ সম্পর্কে "ফাসলুল খেতা-ব ফী ফাযলিল কেতা-ব" একটি উত্তম বর্ণনা সম্বলিত ও যথেষ্ট সদুপদেশ দানকারী গ্রন্থ।

সংযোজন

সুরা না-স হল কোরআনের শেষ সুরা। এই সুরা এবং সুরা ফালাককে একত্রে মিলিয়ে "মোআওবেযাতায়ন" বা আশ্রয় চাওয়ার দুটি সুরা বলা হয়। এই সুরা দুটি দ্বারা কোরআন খতম কেন করা হল ? এর রহস্য সম্পর্কে ভারত গৌরব আল্লামা শাহ আঃ আযীয দেহলভী বলেন : যখন কোন সম্পদ পরিপূর্ণ হোয়ে যায় এবং তা পূর্ণাঙ্গতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তার পেছনে দুশমনের হিংসা এবং প্রতারকের ধোকা ছাড়া আর কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকেনা। এমতাবস্থায় ঐ হিংসা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা। সেইজন্য আল্লার শরণ প্রার্থনার সর্বোত্তম দোআ স্বরূপ মোআওবেযাতায়ন দ্বারা কোরআন খতম করা

পাতা ছেঁড়া বা মোড়ানো যাবেনা
http://islaminonesite.wordpress.com

হয়েছে। এই সুরাতে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য আল্লার তিনটি বিশেষ গুণবাচক নামের উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল (১) রব্ব–প্রতিপালক (২) মালিক–বাদশাহ (৩) এলা-হ্–উপাস্য। এর রহস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মানুষের মনে শয়তান তিনটি উপায়ে প্রবেশ করে (১) যৌনকামনা (২) ক্রোধের উম্মাদনা এবং (৩) বাতিল ধ্যানধারণা, যাকে কুপ্রবৃত্তিও বলা হয়। সুতরাং রব্ব নামটি যৌনকামনার অনিষ্ট দূর করার জন্য এবং মালিক নামটি ক্রোধের আগুন দূর করার জন্য আর এলা-হ্ নামটি প্রবৃত্তির কুকীর্তি থেকে বাঁচার জন্য। তাই যেন বলা হচ্ছে যে, শয়তান যদি তোমাকে যৌন কামনার দ্বারা কুমন্ত্রণা দেয় তাহলে আল্লার বাদশাহী প্রতিপত্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তির প্রতি লক্ষ্য কর আর প্রবৃত্তির দ্বারা যদি সে জ্বালাতন করে তাহলে উপাস্যের মহান মর্যাদার দিকে ধ্যান কর (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৯৮ পৃষ্ঠা)।

এই সুরা এবং সুরা ফালাকের মধ্যে কিছু সুক্ষ্ম তত্ত্বও আছে। তা হল এই যে, এর আগের সুরা সুরায়ে ফালাকে একটি মাত্র গুণসম্পন্ন স্বত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা হল রব্বুল ফালাক্ব। আর যাদের বিরুদ্ধে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে তারা হল তিনজন ঃ–(১) গাসেক (২) নাফফাসাতে (৩) হা-সেদ। পক্ষান্তরে এই সুরা না-সে যাঁর আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে তাঁর তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ–(১) রব্ব (২) মালিক (৩) এলা-হ এবং যার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইতে বলা হয়েছে তা একটি মাত্র বিপদ অর্থাৎ অসঅসাহ বা কুমন্ত্রণা। দুটি জায়গায় দুরকম হুকুম দেওয়ার উদ্দেশ্য হল এই যে, সুরা ফালাকে দেহের নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে এবং সুরা নাসে ধর্মের ও ঈমানের নিরাপত্তার জন্য পানাহ চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রহস্য এই যে, ধর্মের ক্ষতি সামান্য হলেও তা পার্থিব প্রচুর ক্ষতির চেয়ে অধিক মারাত্মক (তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)।

কোন কোন্ সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলেন, কোরআনের শুরু বিসমিল্লার "বে" বর্ণ দিয়ে এবং শেষ অননা-সের "সীন" অক্ষর দিয়ে। দুটি একত্রিত করলে বাস্ শব্দ তৈরী হয়। কোন ব্যাপারে আমরা যেমন বলি, বাস্, বাস্ আর নয়। তেমনি কোরআন দুজগতে বাস্ অর্থাৎ যথেষ্ট। এই রহস্যটি ইরানের কবি সানায়ী নিম্নের কবিতায় কি সুন্দর গেঁথেছেন ঃ–

اوّل وآخر قرآن زچه باآمد وسین
یعنی اندرره دین رهبر تو قرآن بس

(তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৪০৪ পৃষ্ঠা, ও রূহুল মাআনী, আমপারা, ২৮৭ পৃষ্ঠা)।

–ঃ সংযোজন শেষ ঃ– এস, এ বারী

সূরা ফালাকের গুরুত্ব

সুরা ফালাকে পাঁচটি আয়াত আছে। বিখ্যাত মোফাসসেরে কোরআন হাসান, একরেমা, আতা, জাবের, কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস প্রমুখের মতে এই সুরা মক্কায় নাযেল হয়েছে। ইবনে মসউদ (রাযিঃ) সুরা না-স ও সুরা ফালাককে কোরআন মজীদ থেকে মুছে ফেলতেন এবং বলতেন যে যা কোরআন নয় তাকে কোরআনের সাথে মেশায়ো না। এই দুটি সুরা কোরআন নয়। রসুলুল্লাহ (সঃ) এ দুটি দ্বারা কেবল আশ্রয়-প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। তাই ইবনে মসউদ এই সুরা দুটোকে নামাযে পড়তেন না। ইমাম বাযযার বলেন, এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে কেউই ইবনে মসউদকে সমর্থন করেননি। তাছাড়া রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে এই সুরা দুটি নামাযে পড়ার প্রমাণ ভালভাবে পাওয়া যায়। সেজন্য কোরআনে এদেরকে লেখা হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, ইবনে মসউদের এই ধারণা সাহাবীদের সর্বসম্মত রায়ের বিরোধী। ইবনে কোতায়বাও ইবনে মসউদের মত অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইবনুল আমবারী তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। কেউ বলেন, ইবনে মসউদের এই অস্বীকার ভুলবশতঃ ছিল। যেমন তিনি সুরা ফা-তেহাকেও কোরআন থেকে ছেঁটে দিয়েছিলেন।

সূরা না-স ও সূরা ফালাক অবতীর্ণের কারণ

যায়দ ইবনে আরকাম বলেন, এক ইহুদী হযরতকে যাদু করেছিল। ফলে তিনি (সঃ) অসুখে পড়েন। অতঃপর জিবরায়ীল (আঃ) সুরা না-স ও সুরা ফালাক নিয়ে হাযির হন এবং বলেন, একজন ইহুদী পুরুষ আপনার উপরে যাদু করেছে। ঐ যাদু অমুক কুঁয়াতে করা আছে। একথা শুনে রসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলীকে পাঠালেন। তিনি তা বার কোরে আনলেন। তিনি বললেন, এটাকে খোল। প্রত্যেক গিরাটি এক একটি আয়াত পড়ার সাথে খুলে যায়। ফলে হযরত (সঃ) উঠে দাঁড়ান। তিনি যেন বাঁধা ছিলেন মুক্তি পেলেন (আবদোবনো হোমায়েদ)। ইবনে মারদাঅয়হে আরো বিস্তারিত বর্ণনায় বলেন, হযরতের ঐ যাদু অবস্থা ৪০ দিন ছিল, কিংবা ৬ মাস অথবা ১ বছর। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, শেষ মতটি নির্ভরযোগ্য। ইমাম রাগেব বলেন, হযরতের নবী হবার ব্যাপারে যাদু কোন ক্রিয়া করতে পারেনি, বরং এটা তাঁর দেহের উপরে ক্রিয়াশীল হয়েছিল মানুষ হবার কারণে। যেমন মানুষ হবার কারণে তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন, পেশাব-পায়খানা করতেন, রাগান্বিত হতেন, অসুখে পড়তেন। তাই এই প্রভাব এজন্য বিস্তার করে যে, তিনি মানুষ ছিলেন ; নবী হবার কারণে নয়। এই যাদুর প্রভাব তখনই মারাত্মক প্রমাণিত হোত যখন তা কোন নবুঅতী কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতো। যেমন ওহোদের ময়দানে হুযুর (সঃ) এর দাঁত ভেঙে যাওয়া তাঁর নবুঅতীর ব্যাপারে কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ,

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেফাযতে রাখবার ওয়াদা করেছেন এই বলে :- وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে মানুষের তরফ থেকে হেফাযতে রাখবেন । (সুরা মায়েদাহ ৬৭ আয়াত) । অনুরূপভাবে কোন কোন জায়গায় মুসলমানদের উপরে মোশরেকদের প্রাধান্য লাভ করা কোরআনের এই আয়াত. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর বিরোধী নয় । কাযী বলেন, এর দ্বারা কাফেরদের একথা সত্য প্রমাণিত হয় না যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) মাসহুর অর্থাৎ যাদুর দ্বারা বিকৃত মস্তিষ্ক ছিলেন । আহলে সুন্নতের মতে জাদু সত্য, তবে কথায় ও কাজে তার প্রকৃতি আলাদা হয় । জাদুর দ্বারা কষ্ট ও অসুখ এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে প্রভাব পড়তে পারে । এসব কথাগুলো তফসীর জুমালের টিকায় আছে ।

সূরা না-স ও ফালাকের ফযীলত

সূরা না-স ও ফালাকের ফযীলতে বহু সহীহ হাদীস এসেছে । হযরত (সঃ) ঐ সূরাগুলোকে ফরয নামাযে পড়েছেন । ওকবা বিন আমের বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযেল হয়েছে যা ইতিপূর্বে আমি দেখিনি । তা হল কুল আউযো বেরব্বিন না-স এবং কুল আউযো বেরব্বিল ফালাক (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি) । আবু সায়ীদ খুদরী বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, মহানবী (সঃ) চোখের রোগে যার দ্বারা খোদার পানাহ চাইতেন সেগুলো "মোআওবেযাতায়ন" (সুরা নাস ও ফালাক) নাযেল হওয়ার পর ত্যাগ করেন । ইবনে মসউদ (রাযিঃ) মোআওবেযাতায়ন ছাড়া অন্য তাবীজকে অপছন্দ করতেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম) । উম্মে সালমা মারফুভাবে বলেন, এই সুরা দুটি আল্লার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় (ইবনে মারদাওয়াহে) । হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : হযরত (সঃ) যখন অসুখে পড়তেন তখন এই সূরা দুটিকে পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন । যখন তিনি খুব বেশী বেমারে পড়তেন তখন আমি ওগুলো পড়ে হযরতের হাত দিয়ে মাসাহ করতাম যাতে বরকত হয় (মোঅত্তা ইমাম মালেক) । এর আসল বোখারী ও মুসলিমে আছে ।

ইবনে কাসীর বলেন, এই সুরা দুটি মদীনায় নাযেল হয়েছে । যেরর ইবনে হোবায়শ একদা উবাই ইবনে কা'বকে সুরা না-স ও ফালাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন, আপনার ভাই ইবনে মসউদ এই দুটি সুরাকে কোরআন থেকে মুছে দিতেন ? জওয়াবে তিনি বলেন, আমি হযরতকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বলেন, তুমি ওগুলো পড় । সুতরাং আমি তাইই বলছি যা হযরত (সঃ) বলেছিলেন (আহমদ ও বোখারী) ।

অনেক কারী ও ফকীহদের নিকট একথা প্রসিদ্ধ যে, ইবনে মসউদ (রাযিঃ) সূরা না-স ও সূরা ফালাককে কোরআনের ভেতরে লিখতেন না । এর কারণ মনে হয়

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি হযরত (সঃ) থেকে সূরা দুটি শোনেননি । কিংবা তাঁর মতে এ দুটি মোতাওয়াতের বা অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত নয় । তারপর তিনি সেই সমস্ত সাহাবীদের উক্তির দিকে রুজু করেন যাঁরা ঐ দুটোকে কোরআনে লিখেছিলেন এবং পৃথিবীর দিকে দিকে পাঠিয়েছিলেন । অলিল্লাহিল হাম্‌দ অলমিন্নাহ । ওকবা বিন আমেরের হাদীসে নামাযে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর মোআওবেযাতায়ন পড়া এবং শোবার সময়, শুয়ে ওঠার সময় ও প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ঐ দুটোকে পড়ার হুকুম দেওয়ার কথা মোসনাদে আহমাদ ও সুনানের কয়েকটি হাদীসে এসেছে । হযরত ঐ সূরা দুটোকে ফজরের নামাযে পড়েছেন । রসুলুল্লাহ (সঃ) ওকবাকে বলেছিলেন : আমি তোমাকে এমন তিনটি সূরা শিখিয়ে দেবনা কি যে, যার মত সূরা তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও কোরআনেও নাযেল হয়নি ? সেগুলো হল : কুলহু অল্লা-হো আহাদ এবং মোআওবেযাতায়ন । তিনি (সঃ) জাবেরকে বলেছিলেন : اِقْرَاْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا (এক্‌রা বিহিমা অলান তাক্‌রাআ বিমিস্‌লিহিমা) তুমি এই সূরা দুটোকে পড় এবং কখনই তুমি এই দুটোর মত আর অন্য কোন সূরা পড়তে পাবেনা (নাসায়ী) । হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসসমূহে জিন্ন ও ইনসানের চোখের রোগে মোআওবেযাতায়ন দ্বারা খোদার পানাহ চাওয়ার কথা এবং হাতে ফুঁক দিয়ে শরীরে হাত বুলানোর কথা সুনানের (তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসায়ী প্রভৃতির) বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে ।

সূরাতুল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَ
مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

১। কুল আউযু বিরবিল ফালাক । ২। মিন শাররি মা-খালাক । ৩। অমিন শাররি গা-সিক্বিন এযা-অকাব । ৪। অমিন শাররিন নাফ্ফা-সা-তি ফিল ওকাদ । ৫। অমিন শাররি হা-সিদিন এযা-হাসাদ ।

তরজমা

১। (হে মোহাম্মদ (সঃ) !) তুমি বল–আমি ভোরের প্রতিপালকের আশ্রয় চাছি ।

২। সেই সমস্ত জিনিষের অনিষ্ট থেকে যা তিনি পয়দা করেছেন। ৩। এবং অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা (বিশ্বচরাচরকে) ঢেকে নেয়। ৪। আর গিরাসমূহে ফুঁক দানকারিনীদের দুষ্কৃতি থেকে। ৫। এবং হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে যখন সে হিংসা করতে থাকে।

তফসীর

জাবের, ইবনে আব্বাস, মোজাহেদ, সায়ীদ বিন জুবাইর, আবদুল্লা বিন মোহাম্মদ বিন আকীল, হাসান, কাতাদাহ, কুরযী, ইবনে যায়দ ও যায়দ বিন আসলাম প্রমুখ বলেন যে ফালাকের অর্থ ভোর বা সকাল। কুরতবী, ও ইবনে জরীর বলেন, এটা হল فَالِقُ الْإِصْبَاحِ আয়াতের মত। ইবনে আব্বাস বলেন—ফালাকের অর্থ খালক বা সৃষ্টি। যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ তাঁর নবীকে হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি যেন সমগ্র সৃষ্টিজগত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কা'ব আহবার বলেন—ফালাক জাহান্নামের একটি জঙ্গল, যখন তা খোলা হয় তখন সমস্ত জাহান্নামীরা গরমের চোটে চেল্লাতে থাকে। আববানা বলেন, আলেমরা বলেছেন, ফালাক হল জাহান্নামের তলায় একটি কুঁয়া, যার উপরে একটি পর্দা পড়ে আছে। যখন তা তুলে দেওয়া হয় তখন তাথেকে এমন এক আগুন বের হয় যার কারণে স্বয়ং জাহান্নামও চিৎকার করতে থাকে। এটা প্রচণ্ড গরমের কারণে হয়। এই উক্তি ইবনে আব্বাস, সুদ্দী ও আমরেবনে আমবাসার। এ ব্যাপারে একটি মরফু হাদীসও এসেছে। কিন্তু তা অস্বীকৃত। আবু আবদুর রহমান হাবলী বলেন—ফালাক জাহান্নামের নাম। ইবনে জারীর বলেন—প্রথম উক্তিটি ঠিক যে, ফালাকের অর্থ সকাল। ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারী শরীফে তা-ই লিখেছেন। শাররে মা-খালাক এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টি জগতের দুষ্কৃতি। সাবেত বুনানী ও হাসান বাসরী বলেন—ওর অর্থ জাহান্নাম এবং ইবলিস ও ইবলিসের সাঙ্গ-পাঙ্গদের অপকীর্ত্তি। অকাবের অর্থ সূর্যাস্ত। এটা বোখারী বর্ণনা করেছেন। মোজাহেদ, ইবনে আব্বাস, যাহহাক, যুহরী, হাসান ও কাতাদাহ প্রমুখগণ তা-ই বলেন। আতিয়্যা বলেন ঃ অকাবের অর্থ রাতের চলে যাওয়া। কেউ বলেন—রাতের অন্ধকারের আসা। আবু হোরায়রা বলেন—তারকা। ইবনে যায়দ বলেন—আরবরা সুরাইইয়া তারকা পড়াকে গা-সেক বলে। কেউ বলেন—গাসেকের অর্থ চাঁদ। আয়েশার হাদীসে এসেছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে বলেন ঃ— تعوذي من شر هذا الغاسق۔ (তোআওওযী মিন শাররে হা-যাল গা-সেক) এই গাসেকের অপকার থেকে তুমি পানাহ চাও। অতঃপর তিনি আমাকে চাঁদের উদয় দেখালেন (আহমাদ, নাসায়ী। তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি উত্তম ও সহীহ। মোজাহেদ, একরেমা, হাসান, কাতাদাহ ও যাহহাক বলেন—নাফ্ফা-সাত এর অর্থ যাদুকর স্ত্রীলোক। মোজাহেদ বলেন—যখন তারা মন্ত্র পড়ে এবং গিরাসমূহে ফুঁক দেয়। তাউস বলেন—সাপ ও পাগলের মন্ত্রের

চেয়ে শেরকের নিকটবর্তী আর কোন মন্ত্র নেই।

হাদীসে এসেছে যে, একদা জিব্রীল (আঃ) হযরতের নিকট এসে বললেন—হে মোহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন জিব্রীল বললেন— بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك۔ (বিসমিল্লাহে আরকীকা মিন কুল্লি দায়িন ইউযীকা অমিন শাররি কুল্লে হা-সিদিন অআয়নিন আল্লা-হু ইয়াশফীকা)—অর্থাৎ আল্লার নামে আপনাকে ঝাড় ফুঁক করছি সেই সমস্ত অসুখের অপকার থেকে যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং প্রত্যেক হিংসুকের ও প্রত্যেক চোখের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আপনাকে শাফাআত দেবেন। মনে হয় হযরতের এই অসুখ যাদুর কারণে ছিল। তারপর আল্লাহ তাঁকে রোগমুক্ত করেন। হযরত যায়দ বিন আরকাম বলেন—এক ইহুদী হযরতের উপর যাদু করে। ফলে কয়েকদিন তিনি (সঃ) অসুখ ছিলেন। জিব্রীল (আঃ) এসে বললেন, এক ইহুদী আপনার উপর যাদু করেছে এবং কয়েকটি গিরা অমুক তমুক কুঁয়াতে আপনার জন্য লাগিয়েছে। হযরত (সঃ) কাউকে পাঠালেন যে, সে যেন ঐ যাদুটি বের করে আনে। সুতরাং সে নিয়ে এল এবং খুলে ফেললো। হযরত উঠে দাঁড়ালেন। যেন বাঁধন থেকে ছাড় পেলেন। কিন্তু তিনি ইহুদীকে কিছু জানালেন না এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সামনে কোন অসৎ ব্যবহারও দেখালেন না (নাসায়ী)।

আয়েশার শব্দ এই যে, হযরতের (সঃ) উপর যাদু করা হয়। ফলে তিনি মনে করতেন যে, আমি বিবিদের কাছে এসেছি, অথচ তিনি আসতেননা। সুফয়্যান বলেন, এরূপ যাদু খুবই মারাত্মক হয়। নবী (সঃ) বলেন, হে আয়েশা! তুমি কি জান? আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার ফতওয়া দিয়ে দিয়েছেন। দুজন লোক আমার কাছে আসে। একজন মাথার কাছে বসে এবং অন্যজন পায়ের কাছে। একজন বলল, এই লোকটির কি হয়েছে? অন্যজন বলল, ইনি যাদুগ্রস্থ। সে শুধাল, একে যাদু কে করল? অন্যজন বলল, লাবীদ ইবনে আ'সম। যিনি ইহুদীদের মিত্রগোষ্ঠী যোরায়ক বংশের একজন লোক এবং তিনি মোনাফেকও ছিলেন। ১ম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কোন্ জিনিষে সে যাদু করেছে। ২য় ব্যক্তি বলল, মাথার চুল ও চিরুনীতে। ১ম জন আবার শুধাল, তা কোথায় আছে? ২য় জন বলল, যরওয়াঁ কুঁয়ার ভেতরে একটি পাথরের নীচে এক কৌটার ভেতরে ছালের মধ্যে আছে। তারপর হযরত (সঃ) ঐ কুঁয়ার কাছে গেলেন এবং যাদুটি বার করলেন, অতঃপর বললেন, এটা ঐ কুঁয়া যা আমাকে দেখানো হয়েছিল। ওর পানি ঐরূপ ছিল যেমন মেহেদী পেষা পানি হয়। আর ঐ জায়গার খেজুর গাছগুলো ঐরূপ ছিল যেমন শয়তানের মাথা হয়। যখন তা বার করা হল তখন আমি বললাম, আপনি এটা প্রকাশ করছেন না কেন? তিনি (সঃ) বললেন, শোন, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি এটা পছন্দ করিনা যে, কারো বিরুদ্ধে ঝামেলা সৃষ্টি হোক (বোখারী)। অন্য বর্ণনায় আছে,

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরতের মনে হোত যে, আমি কোন কাজ করেছি, কিন্তু তিনি সে কাজ করেননি। তারপর ঐ কূপটি ভরাট কোরে দেওয়া হয়। ইবনে আব্বাস ও আয়েশা বলেন, একটি ইহুদী ছেলে হযরতের খেদমত করতো। তার দ্বারা ঐ ইহুদী রসুলুল্লার চিরুনী এবং ঘাড়ের কয়েকটি চুল সংগ্রহ কোরে যাদু করেন। যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সম ছিল। হযরত আলী, আম্মার ইবনে ইয়াসের এবং যোবায়র ঐ কূপের কাছে যান এবং কূপ থেকে পানি বার করেন। পানির রংটি মেহেদীর মত রং ছিল। তারপর তাঁরা পাথরটি তুললেন এবং কৌটাটি খুললেন। তার মধ্যে একটি চিরুনী এবং হযরতের মাথার কয়েকটি চুল ছিল। আর একটি সুতো ছিল যার মধ্যে পাক দেওয়া ১২টি গিরা (১) ছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা এই সূরা দুটি নাযেল করেন। যার প্রত্যেক আয়াতে একটি কোরে গাঁট খুলে যায় এবং হযরতও নিজের শরীর ঝরঝরে পান। শেষ গাঁটটি যখন খুলে যায় তখন মনে হয় তিনি যেন বাঁধন থেকে ছাড়া পেলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে ফুঁক দেন। এই দোআ পড়ে :- بسم الله ارقيك من كل شئ يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك - সাহাবীরা বললেন, আমরা ঐ খবীসকে গ্রেফতার করব না কি এবং মেরে ফেলব না কি ? তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। অতএব এখন লোকেদের উত্তেজিত করা আমার পছন্দ নয়।

তফসীর ফতহুল বায়ানের বায়ান এই যে, ফালাকের অর্থ সকাল। প্রবাদে বলে- হুওয়া আব্‌য়ানো মিন ফালকিস-সুবহে। কেউ বলেন, জাহান্নামের একটি গাছ। কিংবা জাহান্নামের নাম। অথবা জাহান্নামের জেলখানা কিংবা পাহাড় ও পাথর যা ফেটে গিয়ে পানি বের হয়। নাহ্‌হাস বলেন-ফালাক সমতল ভূমিকে বলে। কিংবা সেই জিনিষকে বলে যা ফেটে বের হয়। যেমন প্রাণী, উদ্ভিদ ও পাথর প্রভৃতি। অর্থাৎ ফালাকের অর্থ ফেটে যাওয়া। আল্লাহ বলেন :- فالق الحب والنوى কিন্তু প্রথম উক্তিটাই অধিক ঠিক। ফালাকের মধ্যে একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি এইসব অন্ধকারের উপর শক্তিশালী তিনি সবরকম ভয় ও ত্রাস হতে আশ্রয় দানকারী। কিংবা উষার উদয় একটি দৃষ্টান্ত হল আনন্দ আসার। মানুষ যেমন রাতে সকাল হবার অপেক্ষা করে তেমনি আশ্রয় প্রার্থনাকারী ও ভীতব্যক্তি সাফল্য ও মুক্তির উদয়ের জন্য অপেক্ষা করে। শাররে মা খালাক এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টি জগত। এর মধ্যে অপকার এসে গেছে। এই অপকারটা সাধারণ, এবং এর পরে যে তিনটি

(১) ইবনে কাসীরের মিসরী সংস্করণে ১২-টি গিরা লেখা আছে। কিন্তু অন্যান্য তফসীরে ১১-টি গিরা আছে। এটাই ঠিক মনে হয়। কারণ পরের বর্ণনায় আছে যে, প্রত্যেক আয়াতে একটি কোরে গিরা খুলে যায়। এই সূরাতে আয়াত সংখ্যা হল এগার ; বার নয়। (সিদ্দীক হাসান)

"শারর" বা অপকারের কথা সূরাটিতে উল্লিখিত হয়েছে তা বিশেষ অপকার। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কোন বিশেষ কারণ নেই। আবু হানীফার কেরাআতে "শাররিন" তানভীনসহ আছে। কিন্তু ওতে অত্যন্ত জটিলতা ও দুর্বলতা আছে। অর্থাৎ সেইসব অপকার হতে যা এখনো সৃষ্টিই হয়নি। গাসেক রাত এবং গাসাক রাতের অন্ধকার। যাজ্জাজ বলেন-রাতকে গাসেক এইজন্য বলে যে, দিনের তুলনায় রাত একটু ঠাণ্ডা হয় এবং ঠাণ্ডাকে গাসেক বলে। কিন্তু এই উক্তিটি ঠাণ্ডা। কেউ বলেন, গা-সেক হল সুরাইইয়া তারকা, কিংবা অস্তমিত সূর্য অথবা অস্তমিত চাঁদ, নতুবা সাপ যখন তা কামড়ায় অথবা অকস্মাৎ আগত যা ক্ষতি করে কিংবা ভিক চায়নেওলা যখন সে ভিক চেয়ে ব্যতিব্যস্ত করে। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিক সঙ্গত। "নাফ্ ফা-সা-ত" এর অর্থ সেইসব স্ত্রীলোক যারা যাদু করে থাকে। নাফাস বলে ফুঁক দেওয়াকে। যেরূপ মন্ত্রপাঠকারীরা ফুঁক দেয় চায় তা থুথুসহ হোক কিংবা না হোক। এই আয়াতটি মোতাযেলার (মুসলমানদের একটি ফের্কার নাম) উক্তি ঠিক নয়ের প্রমাণ। কারণ তারা যাদু বিশ্বাস করেনা। উকাদ হল উকদাতুন এর বহুবচন যার অর্থ গিরাসমূহ। ইবনে আব্বাস বলেন-নাফাফা-সাত এর অর্থ সা-হেরা-ত বা যাদুকরণীবৃন্দ। তারা সূতাতে গাঁট দিত জাদু করবার সময়। এরা হল লাবীদ ইবনে আ'সম ইহুদীর মেয়েগণ। "নাফস" এর আর একটি অর্থ হল সেই মন্ত্র যা যাদু সম্বলিত হয়।

আবু হোরায়রার হাদীসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি কোন গাঁট দেয় তারপর তাতে ফুঁক দেয় সে যাদু করে। আর সে. যাদু করে যে মোশরেক হয় এবং যে যার সংস্পর্শে আসে তাকে তার কাছে সঁপে দেওয়া হয় (নাসায়ী)। তাঁর অন্য শব্দ এই- হযরত (সঃ) আমার অসুখ দেখতে এসে বললেন, আমি তোমার উপর সেই মন্ত্র পড়ব নাকি যা আমার উপর উপর জিব্রীল (আঃ) পড়েছিল ? আমি বললাম, হাঁ, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হোক। তখন তিনি বললেন-বিসমিল্লাহে আরকীকা আল্লা-হো ইয়াশফীকা মিন কুল্লে দা-য়িন ফীকা অমিন শাররিন নাফ্ফাসাতে ফিল ওকাদ অমিন শাররে হাসিদিন এযা হাসাদ। তিনি এই দোআটি তিনবার পড়লেন (ইবনে মাজাহ, হাকেম ও ইবনে সাআদ)।

ফুঁক দেওয়া এবং মন্ত্রপড়া ও তাবীয দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাঁদের পরবর্তীগণ জায়েয বলেছেন। যখন তা শরীআত মোতাবেক হবে। কারণ আয়েশার হাদীসে রয়েছে, যখন হযরতের বাড়ীর কেউ অসুখ পড়তো তখন তিনি মোআওয়েযাত (সূরা না-স, ফালাক ইত্যাদি) পড়ে তার উপর ফুঁক দিতেন। অন্যদল এগুলোকে নাজায়েয বলে। তবে বিনা থুথুতে ফুঁক দেওয়াকে তারা জায়েয বলেছেন। একরেমা বলেন, মন্ত্র পাঠকারীর জন্য ফুঁক দেওয়া, মাসাহ করা ও গিরা দেওয়া জায়েয নয়। আল্লামা নাসাফী বলেন-কোরআনের আয়াত ও হাদীস

http://islaminonesite.wordpress.com

দিয়ে ঝাড় ফুঁক জায়েয। সুরয়্যানী, আরবী ও হিন্দীতে জায়েয নয়। কারণ, ওতে বিশ্বাস বৈধ নয় এবং ওতে আস্থা রাখাও সিদ্ধ নয়। এছাড়া অন্য কিছু দিয়েও চলবেনা।

যার প্রতি হিংসা করা হয় তার ধনসম্পদ ধ্বংসের আকাঙ্খাকে হাসাদ বা হিংসা বলে। এযা-হাসাদ এর অর্থ যখন সে হিংসা প্রকাশ করে এবং হিংসানুযায়ী কাজ করে। ঐ হিংসা হিংসুকের হিংসার-পাত্রের ক্ষতির জন্য তার প্রবৃত্তি মোতাবেক হয়। ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ- لَمْ أَرَ ظَالِمًا أَشْبَهَ بِالْمَظْلُومِ مِنْ حَاسِدٍ -

অর্থাৎ হিংসার আগুনে উৎপীড়িত-হিংসুকের চেয়ে আর কোন অত্যাচারীকে আমি দেখিনি। এই সূরাতে আল্লাহতাআলা মহানবী (সঃ) কে সমস্ত সৃষ্টি জগতের দুষ্কৃতি থেকে পানাহ চাইতে আদেশ দিয়েছেন সাধারণভাবে। তারপর কতিপয় অপকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যদিও ঐগুলো প্রথমোক্ত সাধারণ অপকারের মধ্যে গণ্য ছিল। এর মধ্যে রহস্য হল এই যে, ঐগুলোর মধ্যে অধিক অপকার এবং বেশী ক্ষতি আছে। তাহল (১) গা-সেক (২) নাফ্ফা-সা-ত (৩) হা-সেদ। এই তিনটি বিষয় অধিক ক্ষতিকারক বলে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরাটিকে "হাসাদ" দিয়ে শেষ করা হয়েছে যদ্বারা এটা বোঝা যায় যে, হাসাদ বা হিংসা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক ও তীব্রজনক। এটাই সেই প্রথম গোনাহ যদ্বারা ইবলীস আসমানে এবং কাবীল যমীনে আল্লাহপাকের নাফরমানী করেছিল।

অনুবাদকের সংযোজন

সূরা ফালাকে ৫ টি আয়াত, ২৩ টি শব্দ ও ৭৩ টি হরফ আছে (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৯৪ পৃষ্ঠা)। সূরা না-স ও ফালাক একসাথে নাযেল হয় এবং এদের দ্বারা আল্লার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয় বলে এদেরকে একত্রে "মোআওবেযাতায়ন" বা প্রার্থনার দুটি সূরা বলা হয় (বায়হাকীর দালা-য়েলুন নুবুওঅত)। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, একদা নামায পড়া অবস্থায় নবী (সঃ) কে একটি বিছা দংশন করে। অতঃপর তিনি নামায শেষ কোরে বলেন, খোদার অভিসম্পাত হোক বিছাটির উপর। সে নামাযী এবং অন্য কাউকেও ছাড়েনা। তারপর তিনি পানি ও নুন আনিয়ে দংশিত জায়গায় হাত বুলাতে থাকেন এবং সূরা কুল ইয়া আইয়োহাল কা-ফেরুন, কুল হুআল্লা-হো আহাদ, কুল আউযো বেরব্বিল ফালাক ও কুল আউযো বেরব্বিন না-স পড়তে থাকেন (তাবারানী সাগীর, কতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা, বায়হাকীর শোআবুল ঈমান, মেশকাত, ৩৯০ পৃষ্ঠা)।

অধিকাংশ মোফাসসেরীনের মতে "ফালাকের" অর্থ উষার আলো। পৃথিবীর কিছু জংলী ও মুর্খ জাতি উষার-আলোকে পুজো করতো। তাই কোরআনে ঐদিকে ইঙ্গিত কোরে বলা হয়েছে যে, উষার জ্যোতিও অন্যান্য সৃষ্টির মত একটি সৃষ্টি। যার স্রষ্টা

ও মালিক তিনি, যিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা (তফসীরে মাজেদী, ১২১৪ পৃষ্ঠা)। কোন মনীষী বলেন, ইউসুফ (আঃ)-কে যখন কূঁয়ায় ফেলে দেওয়া হয় তখন তাঁর হাঁটুতে চোট লেগে খুব ব্যথা হওয়ায় তিনি সারা রাত জেগে কাটান। অতঃপর উষার উদয়কালে আল্লার হুকুমে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য জিব্রীল (আঃ) অবতীর্ণ হন এবং তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের নিকট দোআ করতে হুকুম দেন। তখন তিনি বলেন, ওহে জিব্রীল! আপনি দোআ করুন এবং আমি আমীন বলি। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) দোআ করেন এবং ইউসুফ (আঃ) আমীন বলতে থাকেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর কষ্ট দূর কোরে দেন। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) যখন সুস্থ হোয়ে ওঠেন তখন তিনি জিব্রীলকে বলেন, এবার আমি দোআ করি আর আপনি আমীন বলুন। তারপর তিনি তাঁর প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন সমস্ত রোগগ্রস্থকে এই ভোরবেলায় রোগমুক্ত করেন। ফলে এমন কোন রোগী নেই যে রাতের শেষভাগে সে একটু হাল্কা বোধ না করে (তফসীর কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৫৪১ পৃষ্ঠা)।

গা-সেক বা অন্ধকারের অপকার বলতে দুরকম অন্ধকার বোঝায় ঃ-(১) বাহ্যিক-যা চোখে দেখা যায় এবং (২) অদৃশ্য-যা চোখে দেখা যায়না, বরং অনুভূতিযোগ্য। রাতের অন্ধকারে বহু অপকার দেখা দেয়। যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ-সূর্য ডোবার পরপরই শয়তান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ঐ সময় তোমরা তোমাদের ছেলেপুলেদের রুকে রাখ (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, ৩৭২ পৃষ্ঠা)। রাতের অন্ধকারে চোর, ডাকাত ও ঘাতকরা বের হয়। বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এবং সাপ-বিছা প্রভৃতি বিষধর পোকামাকড় রাতেই বের হয়। ডাক্তারী গবেষণায় জানা যায় যে, বিভিন্ন অসুখের বীজাণু রাতে প্রতিপালিত হয় এবং সূর্যের কিরণে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। যন্ত্রণাদায়ক পোকামাকড় যেমন মশা, ছারপোকা প্রভৃতি রাতে বের হবার অভিজ্ঞতা সবারই আছে। যাদুকরদের যাদু রাতেই বেশী কার্যকর হয়। কারণ দিনে সূর্যের কিরণের তাপে তাদের যাদুর প্রভাব অনেকটা নিস্তেজ হয়। ব্যভিচার ও দুরাচার প্রভৃতি অমানবিক কাজগুলোও রাতেই বেশী হয়। যারা ভূত ও প্রেতে বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস মতে রাতেই ঐসবের উপদ্রব দেখা দেয়। এসব দ্বারা বোঝা যায় যে, রাতের অপকার থেকে রাতকে দূর কোরে উষার আলো আনয়নকারী প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অদৃশ্য অন্ধকারও কয়েক প্রকার হয়। ওর মধ্যে সর্বাধিক হল কুধারণার অন্ধকার যা বুদ্ধি ও বিবেকের জ্যোতির-উপর প্রভাবিত হয় এবং প্রকৃত বিষয়ের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন কোরে দেয়। এরই কতিপয় শাখা হল কুফরী ও খোদাদ্রোহিতার অন্ধকার, পাপের অন্ধকার, দুশ্চরিত্রের অন্ধকার ও অসৎসঙ্গের আঁধার। তাই গাসেক বা রাতের উল্লিখিত অপকারসমূহ থেকে আল্লার আশ্রয় কামনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (তফসীরে আযীযী ও মা-জেদী)।

http://islaminonesite.wordpress.com

রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু সত্য না মিথ্যা

নাফফা-সা-তে ফিল ওকাদ বা গিরাসমূহে ফুঁক দান কারীনীর ভাবার্থে প্রায় সমস্ত তফসীরকারগণ বলেন, ওরা হল রসুলুল্লার উপরে যাদুকারী লাবীদ ও তার কন্যারা। ইমাম বোখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আহমাদ ইবনে হাম্বাল, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে আবী শায়বা, হাকেম, আবদুর রাযযাক, হোমায়দী, আদোবনো হোমায়দ ইবনে মারদোওয়াহে ও ইবনে সা'দ প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রের মহারথীগণ বিশুদ্ধ সনদে হাদীস পেশ করেছেন যে, রসুলুল্লার উপর সত্যসত্যই যাদু হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের চির দুশমন একদল ইহুদী, খৃষ্টান ও নাস্তিকগণ বলেন, হযরত মোহাম্মদ নবী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন যাদুগ্রস্থ ও মায়াবিষ্ট এবং তাঁর সমগ্র নবুঅতী কাজটা ছিল ঐ যাদুরই তন্ত্রমন্ত্র। মুসলমানদের মধ্যে একটি দল যারা শরীআতী কোন বিষয় বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত বিষয়টি যদি তাদের বাহ্যজ্ঞানে ও যুক্তিতে না কুলোয় তাহলে যুক্তির ঘোড়া দৌড়কারী সেই মোতাযেলী পার্টি ও তাদের অনুসারী কিছু যুক্তিবাদী ব্যক্তি ঐ বিষয়টি অস্বীকার কোরে বসেন। তাই তারা নবীজির (সঃ) উপর যাদুর ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন এবং ঐ সংক্রান্ত সহীহ ও বিশুদ্ধ সমস্ত হাদীসগুলো জাল বলে অভিহিত করেছেন। তারা এও বলেন, ঐ হাদীসগুলো নাকি কোরআন বিরোধী। কারণ কোরআনে আছে :- وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا অর্থাৎ খোদাদ্রোহী-অত্যাচারীরা বলে, তোমরা তো কেবলমাত্র একজন যাদুগ্রস্থ লোকেরই অনুসরণ করছ (সূরা ফোরকা-ন, ৮ আয়াত)। অতএব কাফেররা এই আয়াতে যে যাদুর কথা বলছে তা ঐ যাদুই, যে যাদু তাঁকে লাবীদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা করেছিল। অথচ আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযেল কোরে উক্ত যাদু মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন। সুতরাং নাফফা সা-তে ফিল ওকাদ এর অর্থ উক্ত যাদুকরনী নয়, বরং ওর অর্থ হল কুমন্ত্রণার ফুঁক দ্বারা কারো ধর্মবিশ্বাসে ফাটল সৃষ্টিকারী, কিংবা কোন দৃঢ়সংকল্পকারীর সংকল্পে সন্দেহ সৃষ্টিকারী।

উক্ত যুক্তিবাদীদের জবাবে বলা হয় যে, নবীদের ওপরেও যাদু সাময়িকভাবে কাজ করতে পারে তার প্রমাণ কোরআনেও আছে। যেমন মূসা (আঃ) এর উপর ফেরআওনের যাদুকরদের প্রভাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :- فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۝

অর্থাৎ ফেরআওনের যাদুকররা যখন দড়ি ও ছড়িগুলো ফেললো তখন তা তাদের যাদুর কারণে সাপের মত দৌড়ে আসছে বলে তাঁর (মূসার) মনে হল। ফলে তিনি মনে মনে ভয় পেলেন (সূরায়ে তা-হা, ৬৬-৬৭ আয়াত)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মূসা (আঃ) এর ওপরও ক্ষনিকের জন্য যাদুর প্রভাব পড়েছিল। এইজন্য ফেরআওন মূসা (আঃ) কে বলেছিল :- اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا অর্থাৎ আমি মনে

করি হে মূসা। তুমি যাদুগ্রস্থ (সূরা বানী ইসরাঈল ১০১ আয়াত)। তাহলে মূসা (আঃ) এর শত্রুরাও বলতে পারে যে, তাঁর নবুওঅতও ছিল কিছুটা মায়াবিষ্ট (নাউযো বিল্লা-হ)। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার উল্টো। রসুলুল্লার বিখ্যাত জীবনীকার ইবনে সা'দ তদীয় তাবাকা-তে ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরতের (সঃ) উপরে ইহুদীদের যাদুর ঘটনাটি ৭ম হিজরীর মোহাররম মাসে ঘটেছিল। ইসলামের শত্রু কতিপয় অমুসলিম এবং যুক্তির ধ্বজাধারী কিছু মুসলমান বলে যে, ঐ ঘটনাটি ঘটার পর থেকে নাকি কাফেররা হযরতকে যাদুগ্রস্থ বলতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা-তো নয়। বরং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ ঘটনা ঘটার বহু আগে থেকেই কাফেররা তাঁকে পাগল ও বিকারগ্রস্থ বলতো। যার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন :- مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ - তুমি তোমার প্রভুর (নবীত্ব প্রাপ্তি) সম্পদের কারণে মোটেই পাগল নও (সূরা কালাম, ২ আয়াত)। শুধু নবী (সঃ) একা নন, বরং পৃথিবীতে যখনই কোন রসুল এসেছেন তখনই তাঁর বিরোধীরা তাঁকে যাদুকর কিংবা পাগল বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :- كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ -

অর্থাৎ ওদের আগে যখনই কোন রসুল এসেছেন তখনই অনেকে বলেছে, উনি যাদুকর কিংবা পাগল (সূরা যা-রিয়া-ত, ৫২ আয়াত)। সুতরাং সূরা ফোরকানের ৮ নং আয়াত এবং সূরা বানী ইসরাঈলের ৪৭ নং আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর কোন বিরোধ নেই। বিরোধ আছে কেবলমাত্র ইসলাম-শত্রুদের মনে এবং যুক্তির ধ্বজাধারী কতিপয় মুসলমানের প্রকৃত-বিষয়টি বুঝতে অপারগ-বিবেকে। তাছাড়া রসুলুল্লাহ (সঃ) মানুষ হবার কারণে যেমন তায়েফে রক্তরঞ্জিত হন, ওহোদের যুদ্ধে দাঁত হারান, কোন যুদ্ধে পরাজিত হন, মাঝে মাঝে অসুস্থ হন, খায়বারে এক ইহুদী মেয়েরা চক্রান্তে বকরীর গোশ্‌তের সাথে বিষ খেয়ে ফেলে প্রতি বছর গ্রীষ্মের শুরুর দিকে কষ্ট অনুভব করতেন, তেমনি কোন কুচক্রীর যাদুগ্রস্থ হোয়েও অসুস্থ হতে পারেন। এতে আশ্চর্য হবার ও তা অস্বীকার করার কি আছে ? কারণ, হুযুরের কোন ঘোর শত্রুও একথার প্রমাণ দিতে পারেনি যে, তিনি যাদুগ্রস্থ অবস্থায় বিকার মস্তিষ্ক হোয়ে কখনো এক ওক্ত নামায ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা কোরআনের কোন আয়াত ভুলে গেছেন, অথবা নামাযে কেরাআত ভুল পড়েছেন, কিংবা অহী আকারে তিনি যা পাননি তা অহীরূপে প্রকাশ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। খোদার পানাহ যদি ঐ যাদুগ্রস্থ অবস্থায় তাঁর নবুঅতীর কোন কাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিত তাহলে তাঁর শত্রুরা সারা দুনয়্যা তোলপাড় কোরে ফেলতো। যাদুর প্রভাব তাঁর নবুঅতীর কোন কাজে পড়েনি বলে তাঁর প্রাণশত্রুরাও ঐ ব্যাপারে একেবারে বোবা। অতএব মানুষ হবার কারণে তাঁর পূর্ববর্তী নবী হযরত মূসা (আঃ) এর মত তাঁর উপরেও

http://islaminonesite.wordpress.com

সাময়িকের জন্য যাদুর কিছু প্রভাব সত্য এবং ঐ সংক্রান্ত সব হাদীসগুলোও অভ্রান্ত ; একটিও নয় প্রক্ষিপ্ত । তদুপরি তাঁর (সঃ) উপরে যাদু সংক্রান্ত হাদীসগুলো এত অধিক সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রায় "মোতাওয়াতের" এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে । হাদীসের নীতিশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী কোন মুসলমান মোতাওয়া-তের হাদীসের বক্তব্য তার বিবেক-বিরোধী হবার কারণে অস্বীকার করতে পারেনা । বরং সে তার বিবেকের মাথায় ঝাঁটা মেরে ঐ হাদীস মানতে বাধ্য । অন্যথায় তার ঈমানে নড়বড়ে ভাব আসতে পারে । খোদা আমাদের বিশুদ্ধ হাদীস মানার সুমতি দিন—আমিন ।

আল্লাহ তাআলা হিংসুকের অপকার না বলে হিংসুক যখন হিংসা করে তখনকার অপকার থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বললেন কেন ? তার রহস্য এই যে, হিংসুক ব্যক্তি তার হিংসাকে যতক্ষণ প্রকাশ না করে ততক্ষণ ওর ক্ষতি হিংসুকের কাছে পৌঁছায় না । এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হিংসা হল সবরকম অন্যায়ের মূল এবং জঘন্যতম অপরাধ । এইজন্য বলা হয় যে, আল্লার সামনে আসমানে সর্বপ্রথম যে পাপ অনুষ্ঠিত হয় তা হল হযরত আদম (আঃ) এর প্রতি অভিশপ্ত ইবলীসের হিংসা এবং যমীনে সর্বপ্রথম যে পাপ হয় তাও ঐ হিংসা । অর্থাৎ হাবীলের প্রতি কাবীলের হিংসা । হিংসুক নিজেও তার হিংসার আগুনে জ্বলে এবং অপরকেও ঐ আগুনে জ্বালাবার চেষ্টা করে । কিন্তু অন্য অপরাধীরা পরকে জ্বালালেও নিজেরা জ্বলেনা ।

মোআওবিযাতায়ন কোরআন কি না

ইমাম আহমাদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী, বাযযার, আবু ইয়ালা, আবু নোআইম, হোমায়দী, ইবনে মারদোওয়াহে ও আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বাল প্রমুখ মোহাদ্দেসীনে কেরাম বিভিন্ন সনদ দ্বারা রসুলুল্লার বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে মসউদের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মতে সূরা নাস ও ফালাক আল্লার তরফ থেকে নাযেল হলেও কোরআনের অঙ্গ নয়, বরং ঐ দুটি আল্লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দোআ । তাই তিনি এই দুটোকে নামাযে পড়তেন না ।

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ইসলামের দুশমনরা বলে যে, বর্তমান কোরআন বিকৃত । কারণ ইবনে মসউদের বর্ণনানুযায়ী উক্ত সূরা দুটি কোরআনে সংযোজিত । এছাড়া আরো কোন গোলমালও কোরআনে থাকতে পারে । এর উত্তরে বলা হয় যে, মোসনাদে ও সুনান গ্রন্থাবলীতে কয়েকটি হাদীস দ্বারা সহী সনদে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযে রসুলুল্লাহ (সঃ) উক্ত সূরা দুটি পড়েছেন এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পর, শোবার সময় ও ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি এই সূরাগুলো পড়ার হুকুম দিয়েছেন । সুতরাং সূরা দুটি নিঃসন্দেহে কোরআনের অঙ্গ । হাফেয বাযযারের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, রসুলুল্লার সোয়া লাখ সাহাবী কেউই ইবনে মসউদের ঐ মতকে সমর্থন করেননি । অতএব লক্ষাধিক সাহাবীর মতের বিরুদ্ধে ইবনে মসউদের

মতের কোন গুরুত্বই নেই । সেইজন্য কোন কোন বিদ্বান বলেন, ইবনে মসউদ সূরা ফাতেহাকে যেমন ভুল কোরে কোরআন থেকে ছেঁটে দিয়েছিলেন তেমনি সূরা না-স ও ফালাককেও কোরআন বহির্ভূত বলা তাঁর ভুলে যাওয়ার কারণে ছিল । হযরত উসমানের যুগে যখন হাযার হাযার সাহাবীর সামনে কোরআনের কপি কোরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতেও উক্ত সূরা দুটি সন্নিবিষ্ট ছিল । পৃথিবীর কোন মানুষই সব বিষয়ে সবজান্তা হয়না এবং হওয়া সম্ভবও নয় । তাই মানুষ হবার কারণে ইবনে মসউদ যদি নবী (সঃ) থেকে উক্ত সূরা দুটি কোরআনের অঙ্গ হিসেবে না শুনে থাকেন তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? নবীজির বহু সাহাবী তো বহু বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন না তাহলে কোন সাহাবীর কোন আয়াত কিংবা হাদীস না জানার কারণে তা কোরআন অথবা হাদীস বহির্ভূত হবে কি ? কোন পাগলেও একথা বিশ্বাস করতে পারে কি ? না মোটেই না ।

সূরা না-স ও ফালাকের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বের অতুলনীয় মনীষী ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, অপকার দুরকম । এক, সেই অপকার যা মানুষের মনের ভেতর থেকে নয় বরং বাইরের জিনিষ দ্বারা সৃষ্টি হয় (যেমন নযর লাগা, গাল দেওয়া, মারধোর করা প্রভৃতির অপকার) এসব থেকে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম সূরা ফালাকে বর্ণিত হয়েছে । দুই, সেই অপকার বা মানুষের মনের ভেতর থেকে উত্থিত হয় (যেমন কুমন্ত্রনাদাতা খাননা-সের অপকার) । এইরূপ অপকার থেকে বাঁচার জন্য সূরা না-সে হুকুম দেওয়া হয়েছে । কারণ, খাননাসের অস্ত্রসাহ হল কুফরী, ফাসেকী ও না-ফরমানীমূলক কাজেরই উৎস । মানুষকে অসঅসাহ দান করে তিনটি জিনিষ :—(১) তার মন (২) জিন শয়তান (৩) মানুষ শয়তান । এই তিনটির মধ্যে অধিক মারাত্মক হল মানুষ শয়তান । এইজন্য প্রবাদে বলা হয় : শায়া-তীনুল ইনসে আশাদ্দো আলান না-সে মিন শায়া-তীনিল জিন্নে অর্থাৎ মানুষ শয়তান মানুষের জন্য জিন শয়তানের চেয়েও বেশী প্রভাবশালী । কারণ, জিন শয়তান অদৃশ্য থেকে কুমন্ত্রণা দেয় যাকে কেউ দেখতে পায় না । কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে চোখের সামনে থাকে (এবং কুকাজ করতে বাধ্য করে) । এইজন্য আল্লার রসুল হযরত আবু যর (রাযিঃ) কে বলেন :— تعوذ بالله من شياطين الانس قلت او للانسان شياطين قال نعم شر من شياطين الجن ।

(তোআও অয্ বিল্লা-হি মিন শায়া-তীনিল ইনসি * কুলতু আওয়া লিল ইন্‌সে শায়া-তীনুন * কা-লা নাআম * শাররুন মিন শায়াতীনিল জিন্নি) অর্থাৎ হে আবু যর ! তুমি মানুষ শয়তানদের থেকে আল্লার আশ্রয় চাও । তখন আমি বললাম, মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে নাকি । তিনি বললেন, হাঁ, এবং তারা জিন-শয়তানের চেয়েও

http://islaminonesite.wordpress.com

মারাত্মক।

মনের কুমন্ত্রনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ অর্থাৎ আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি (সুরা কা-ফ, ১৬ আয়াত)। মনের কুমন্ত্রণা হল মনের ভেতরে মনের কথা বলা। যাকে বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে ঃ- নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ঐসব বিষয় ক্ষমা করে দেন যা তার মন তাকে বলে যতক্ষণ না সে তা কথায় প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে। উপরোক্ত তিনরকম কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার সবচেয়ে উত্তম উপায় হল সুরা নাস ও ফালাক দ্বারা আল্লার কাছে আশ্রয় চাওয়া। এই জন্য নবী (সঃ) বলেন ঃ-লাম ইয়াস্তায়েযিল মুস্তায়ীযুনা বেমেসলেহেমা অর্থাৎ আশ্রয় প্রার্থনাকারীগণ এই দুটো সুরার মত আর কোন জিনিষ দিয়ে আল্লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেনি (তফসীর সুরায়ে ফালাক ও না-সের উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১৪, ২০, ২৬ ও ৩৬)।

একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ-আমার মনে কখনো হাল্কা মত পর্দা এসে যায়। তখন আমি প্রতিদিন সত্তর বার আল্লার কাছে তওবা করি (ঐ, ৪৬ পৃষ্ঠা)। তাহলে পাঠক ভায়েরা চিন্তা করুন যে, আমাদের মনে অসৎসাহ এলে কতবার পানাহ চাইতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবরকম অসৎসাহ ও অপকার থেকে বাঁচান- আমিন।

-ঃ সংযোজন শেষ ঃ- এস, এ, বারী

সূরায়ে এখলাস

এই সুরার অনেকগুলো নাম আছে। খাতীব বাগদাদী বলেন-অধিক নাম নামধারীর মর্যাদার দলীল। এই সুরাতে তওহীদের বর্ণনা, প্রতিমা পূজকদের প্রতিবাদ এবং দুই ও তিন খোদায় বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রভৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে। এই সুরায় ৪-টি কিংবা ৫-টি আয়াত আছে, যা ইবনে মসউদ, হাসান, আতা, একরেমা, জাবের প্রমুখ মোফাসসেরীনের মতে মক্কায় নাযেল হয়েছে। আর ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যাহ্হাক ও সুদ্দী প্রমুখ তফসীরকারদের মতে সুরাটি মদীনায় নাযেল হয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণের কারণ

উবাই বিন কা'ব বলেন- মোশরেকরা হযরত (সঃ)-কে বলেছিল, হে মোহাম্মাদ! তুমি আমাদেরকে তোমার রব্বের বংশনামা শোনাও। তখন আল্লাহ এই সুরাটি নাযেল করেন। যে জিনিষ পয়দা হয় তা একদিন না একদিন মরে যায়। আর যে মরে যায় তার সম্পত্তির মালিক অন্য কেউ হয়। কিন্তু আল্লাহ মরেন না। তাই তাঁর

উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। আল্লাহর সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউ নেই। لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ (লাইসা কামিসলিহী শাইয়ুন) তাঁর সাদৃশ্যের মতও কোন জিনিষ নেই (আহমাদ, তারীখে বোখারী, ইবনে খোযায়মা ও হা-কেম। হাকেম এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। তিরমিযীও আবুল আ-লিয়াহ থেকে মুরসালভাবে এই রেওয়াতটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "উবাই" রাবীর কথা উল্লেখ করেননি। তিনি এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধতম বলেছেন। হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন যে, এক বেদুইন আরব এসে হযরতকে (সঃ) বললেন ঃ- انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ (এনসিব লানা রাব্বাকা)- তোমার রব্বের বংশনামা আমাদেরকে শোনাও। তখন এই সুরাটি নাযেল হয় (তাবারানী, বায়হাকী, আবু নোআয়িম প্রভৃতি)। আল্লামা সুয়ুতী এই হাদীসটির সনদগুলোকে উত্তম বলেছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাযিঃ)-এর শব্দ এই যে, কোরায়েশরা এসে হযরতকে (সঃ) বললেন, এনসেব লানা রাব্বাকা ফলে সুরাটি নাযেল হয় (আবুশশায়খ ও তাবারানী)। ইবনে আব্বাসের অন্য শব্দ এই যে, ইহুদীরা হযরতের (সঃ) কাছে আসে। তখন তাদের মধ্যে কা'ব বিন আশরাফ ও হুইয়াই বিন আখতাবও ছিলেন। তারা বলেন, হে মোহাম্মাদ! صِفْ لَنَا رَبَّكَ الَّذِيْ بَعَثَكَ (সিফ্লানা রাব্বাকাল্লাযী বা'আসাকা) আপনি আমাদের নিকট আপনার সেই পরওয়ারদেগারের গুণ বর্ণনা করুন যিনি আপনাকে নবী কোরে পাঠিয়েছেন। তখন এই সুরাটি নাযেল হয় (বায়হাকী)।

সূরাটির ফযীলত ও মাহাত্ম্য

উবাই বিন কা'ব মরফুভাবে বর্ণনা করেছেন, যিনি এই সুরাটি পড়েন তিনি যেন কোরআনের তিনভাগের একভাগ পড়েন (আহমাদ ও নাসায়ী)। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি হযরতের (সঃ) কাছে এল এবং বলল, ইন্নী উহেব্বা হা-যিহীস সূরাহ-আমি এই সুরাটিকে ভালবাসি তখন তিনি (সঃ) বললেন, হুব্বোকা ইয়্যা-হা আদখালা-কাল জান্নাহ-তোমার এই সুরাটাকে ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে (আহমাদ, তিরমিযী, বায়হাকী)। এই সুরাটী পড়লে এরূপ-ঐরূপ গোনাহ মাফ হবে সম্পর্কে সুনান ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ঐ সমস্ত হাদীসগুলো যয়ীফ (দুর্বল), গরীব (অভিনব) এবং কিছু মওযু বা জাল। তবে হাঁ "সুলুসে কোরআন" বা কোরআনের তিনভাগের একভাগ হওয়া হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু সহীহ এবং কিছু হাসান বা উত্তম। আবু সায়ীদ খুদরীর হাদীসে আছে, হযরত বলেছেন, তাঁর কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! এই সুরাটি কোরআনের তিনভাগের একভাগের সমান (আহমাদ ও বোখারী)। এই সুরাটি ছোট্ট হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ সংক্রান্ত সবরকম তথ্য সম্বলিত এবং নাস্তিকদের প্রতিবাদে সমৃদ্ধ। হাদীসে একে কোরআনের তিনভাগের একভাগ

http://islaminonesite.wordpress.com

বলা হয়েছে। কারণ, কোরআনের উদ্দেশ্যাবলী তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা হল (১) আকায়েদ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত, (২) আহকাম বা বিধি নিষেধ সংক্রান্ত, (৩) কাসাস বা বাস্তব দৃষ্টান্ত সংক্রান্ত। তফসীর কাশশাফে একথা বলা হয়েছে–এই সূরা গোটা কোরআনের সমান–সে সম্পর্কে আল্লামা দাক্কানী বলেছেন যে, আমি এই রেওয়ায়তটি তফসীর ও হাদীসের কোন গ্রন্থেই দেখিনি। এই সূরাটীর ফযীলত সম্পর্কে যদি আর কোন কিছুই না থাকতো তথাপি বোখারী-মুসলিমে বর্ণিত হযরত আয়েশার এই হাদীসটি যথেষ্ট হোত যে, হযরত (সঃ) একদা একজন লোককে এক সৈন্য বাহিনীর সাথে পাঠান। লোকটি সৈন্যদের ইমামতী করতো এবং প্রত্যেক কেরাতের পর সূরা এখলাস পড়তো। সৈন্যরা ফিরে এসে নবী (সঃ)-কে ঐ ইমামের কথা শোনালো। ফলে তিনি (সঃ) ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, যে, সে এই কাজটা কেন করতো ? তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বললো যে, এই সূরাটা খোদার গুণ। তাই আমি এটাকে পড়া পছন্দ করি। নবী (সঃ) বললেন, তাকে বলে দাও যে, খোদাও তাকে ভালবাসেন (বোখারী, কেতা-বুত তাওহীদ)। বোখারীর অন্য শব্দ হযরত আনাস থেকে বর্ণিত কেতাবুস সলা-তে এইরূপ আছে–একজন আনসারী কোবার মসজিদে নামাযের ইমামতী করতেন। যখন তিনি নামাযে কোন সূরা পড়তেন তখন প্রথমে কুল হুআল্লাহো সূরা পড়তেন, তারপর অন্য সূরা পড়তেন। প্রত্যেক রাকআতে তিনি এইরূপ করতেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, তুমি এই সূরা দ্বারা নামায শুরু কর কেন ? তুমি কি অন্য সূরা পড়াকে যথেষ্ট মনে করনা ? হয় তুমি শুধু এই সূরাটা পড়, কিংবা এই সূরাটা বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়। তিনি বললেন, আমি এই সূরাটা পড়া কখনই ছাড়বনা। চায় তোমরা আমাকে ইমামতী করতে দাও, কিংবা না-দাও। লোকেরা তাকে ভাল মনে করতো এবং অন্যের ইমামতী পছন্দ করত না। তাই যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐদিকে গেলেন তখন তারা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (সঃ) তখন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তোমাদের সঙ্গীদের কথা শুনতে কোন্ জিনিষ বারন করছে ? এবং তুমি প্রত্যেক নামাযে এই সূরাটাকে পড়া অপরিহার্য কেন মনে করছ ? তিনি বললেন, ইন্নী উহেববোহা–আমি এটাকে ভালবাসি। হযরত (সঃ) বললেন ঃ–হুববোকা ইয়্যা-হা আদখালাকাল জান্নাহ অর্থাৎ এই সূরাটাকে তোমার মহব্বত করা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। এই হাদীসটিকে বোখারী ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য ইমামরাও এই শব্দ দ্বারা কয়েকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই সূরাটি কেবলমাত্র তওহীদ ও একত্ববাদ এবং আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত। এর মধ্যে তওহীদের উপরে এলমের মর্য্যাদার প্রমাণ আছে। এলমের মর্য্যাদা কয়েকটি কারণে হয়। ঐ এলমের মূল হল আল্লাহতাআলা এবং তাঁর গুণাবলী। সুতরাং এই সূরার মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য কত তা বলা যায়না। তওহীদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বহু

স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন দীনে খা-লেস, তাকবিয়াতুল ঈমান, দেআইয়াতুল ঈমান, দুররে নাযীদ, তাতহীরুল এ'তেকা-দ, তাজরীদুত্ তাওহীদিল মুফীদ প্রভৃতি। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাররানী ও হাফেয ইবনুল কাইয়েমের রচনাবলী এ ব্যাপারে "মেহরাবের খতীব" বা মক্কের বক্তার মত। এটা সেই বিদ্যা যার দাবীদার অনেক, কিন্তু কতিপয় ওলামা ও বিদ্যার কিছু মহারথী ছাড়া আর কেউ এর তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি। পক্ষান্তরে শেরকের সত্তরটা দরজা আছে এবং বেদআতের বাহাত্তরটা। "শেরকে জলী" বা প্রকাশ্য শেরক থেকে তো অনেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু "শেরকে খফী" বা অপ্রকাশ্য শেরক থেকে সেই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ তওফীক দেন। আল্লা হুম্মাহ দেনাস সেরা-তাল মোস্তাকীম ০ সেরা-তাল লাযীনা আনআমতা আলায়হিম ০ গায়রিল মাগ্যুবে আলায়হিম অলায্ খা-ল্লীন–আমীন।

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন–হযরত আবু সায়ীদ হতে বর্ণিত, একদা একজন লোক অন্য একজনকে রাতে বারবার কুল হুআল্লা-হো আহাদ পড়তে শোনে। সকালে তিনি রসূল (সঃ)-কে ঐকথা শোনালেন। তিনি যেন ঐ কাজটিকে খুবই সামান্য ও তুচ্ছ মনে করেন। তখন হুযুর (সঃ) বললেন ঃ والذى نفسى بيده انها لتعدل ثلث القرآن (অল্লাযী নাফ্সী বিইয়াদিহী ইন্নাহা লাতা'দিলু সুলুসাল কুরআন)–যার হাতে আমার প্রাণ আছে তার কসম। নিশ্চয় ঐ সূরাটা কোরআনের তিন ভাগের একভাগের সমান (বোখারী ও নাসায়ী)। আবু সায়ীদের অন্য শব্দ এই ঃ–হযরত (সঃ) একদা তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ এক রাতে তিনভাগের একভাগ কোরআন পড়তে অক্ষম কি ? কথাটি তাদেরকে খুব ভারী মনে হল। তাই তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এত শক্তি কার আছে ? নবীজী বললেন ঃ–আল্লাহুল অ-হেদুস সামাদ কোরআনের তিনভাগের একভাগ (বোখারী)। আবু সায়ীদের তৃতীয় শব্দ এই ঃ–একদা রাতে কাতাদাহ বিন নোমান এই সূরাটাকে পড়তে থাকে। এই কথা হযরতকে শোনান হল। তিনি (সঃ) বললেন, খোদার কসম ! এই সূরাটি কোরআনের অর্ধেক কিংবা তিনভাগের একভাগ (মোসনাদে আহমাদ)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি সূরা বারংবার কিংবা একটি আয়াত রাতভোর পড়া চলে। ইবনে ওমার বলেন, আবু আইউব আনসারী একটি মজলিসে একথা বলছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন একজন প্রত্যেক রাতে তিনভাগের একভাগ কোরআন পড়তে পারে কি ? লোকেরা বললো, কার এত শক্তি আছে ? তিনি (রাযিঃ) বললেন ঃ কুল হুআল্লা-হো আহাদ কোরআনের তিনভাগের একভাগ। এমতাবস্থায় নবী (সঃ) এসে পড়েন এবং আবু আইউবের কথা শোনেন। তখন তিনি (সঃ) বলেন ঃ সাদাকা আবু আইউব–আবু আইউব সত্য কথা বলেছে (আহমাদ)। আবু হোরায়রার শব্দ এই যে, হযরত (সঃ) একদা বলেন, তোমরা এক জায়গায় জড় হও। আমি তোমাদের নিকট তিনভাগের একভাগ কোরআন পড়বো। লোকেরা জড় হল। হযরত বাইরে এসে

http://islaminonesite.wordpress.com

"কুল হুআল্লা-হো" পড়লেন। তারপর চলে গেলেন। কিছু লোক কিছু লোককে বললো, হযরত তো একথা বলেছিলেন যে, আমি তিনভাগের একভাগ কোরআন পড়বো ? আমরা ভেবেছিলাম যে, আসমান থেকে কোন খবর হয়ত এসেছে। হযরত বের হোয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে যা বলেছিলাম তা ঠিকই। আলা অইন্নাহা তা'দেলো সুলুসাল কোরআন–জেনে নাও যে, ইহা কোরআনের তিনভাগের একভাগ (মুসলিম ও তিরমিযী)।

ইবনে কাসীর সুরা এখলাসের "সুলুসে কোরআন" হওয়া সম্পর্কে বহু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। আবুদ্‌দারদা বলেন, একদা হযরত বললেন ঃ তোমাদের কেউ প্রত্যেক দিন কোরআনের তিনভাগের একভাগ পড়তে অক্ষম কি ? তাঁরা বললেন, হাঁ, হে আল্লার রসুল। আমরা একাজ করতে খুবই অক্ষম। হুযুর বললেন, আল্লাহতাআলা কোরআনের তিনটি টুকরো করেছেন। কুল হু অল্লাহো কোরআনের তিনভাগের একভাগ (আহমাদ, মুসলিম ও নাসায়ী)। এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে এই সুরাটিকে যেন নিশ্চয় পড়ে নেয়। উকবা বিন আবী মুয়ীতের হাদীসেও একে "সুলুসে কোরআন" বলা হয়েছে (আহমাদ ও নাসায়ী)। হোমায়েদ বিন আবদুর রহমান বলেন, কয়েকজন সাহাবী হযরত (সঃ) থেকে এই হাদীসটি রেওয়ায়াত করছিলেন, তিনি বলেন ঃ– قل هو الله احد ثلث القرآن لمن صلى بها (কুল হু অল্লাহু আহাদ সুলুসুল কুরআন লিমান সাল্লা বিহা)–অর্থাৎ এই সুরাটাকে নামাযে পড়া তিনভাগের একভাগ কোরআন পড়ার সমান (নাসায়ী)। হযরত আবু হোরায়রা বলেন, একদিন আমি হযরতের সাথে এলাম। তিনি (সঃ) একজন লোককে "কুল হু অল্লাহো আহাদ" পড়তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, অজাবাত অর্থাৎ অবধারিত হয়ে গেছে। আমি বললাম, কি জিনিষ ? তিনি বললেন জান্নাত (মোআত্তা ইমাম মালেক, তিরমিযী, নাসায়ী)। তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান সাহীহ গরীব (উত্তম, সঠিক, বিরল) বলেছেন। আবদুল্লা বিন হাবীব এর শব্দ এই যে, একদা আমাদেরকে খুব পিপাসা লাগে এবং রাত এসে পড়ে। আমরা নবীজীর অপেক্ষায় ছিলাম যে, তিনি এসে আমাদের নামায পড়িয়ে দেন। তিনি এলেন এবং আমার হাতটা ধরে বললেন, পড়, আমি চুপ থাকলাম। আবার তিনি বললেন, বল। আমি বললাম কি বলব ? তিনি বললেন ঃ "কুল হু অল্লাহো আহাদ" এবং মোআওবেযাতায়ন (সুরা নাস ও সুরা ফালাক)। প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এটা ৩ বার কোরে পড়া তোমার জন্য যথেষ্ট (আবদুল্লা বিন আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)। তামীমদারীর হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ১১ বার বলবে লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হো অআহাদান আহাদান সামাদান লাম ইয়াত্তাখেয্ সা-হেবাতান অলা-অলাদান অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ–আল্লাহ তার জন্য চল্লিশ লাখ নেকী লিখে দেন (মোসনাদে আহমাদ)। এই হাদীসটির সনদে খলীল বিন মুর্রাহ নামে

একজন রাবী আছেন। ইমাম বোখারী প্রমুখগণ একে যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ। মোয়ায বিন আনাস জোহানী বলেন, হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি "কুল হু অল্লাহো আহাদ" ১০ বার পুরো পড়ে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি বাড়ী বানায়। হযরত ওমর বলেন, এখন তাহলে আমরা এটাকে বেশী করে পড়ব হে আল্লার রসুল ! তিনি বললেন (সঃ) আকসের অআত্‌য়েব অর্থাৎ বেশী করে পড় এবং ভাল করে পড় (মোসনাদে আহমাদ)। মোসনাদে দা-রেমীতে এই শব্দগুলো বেশী আছে, যে কেউ ২০ বার পড়বে তার জন্য ২-টি বাড়ী এবং যে ৩০ বার পড়বে তার জন্য ৩-টি বাড়ী তৈরী হবে। ওমর বিন খাত্তাব বলেন ঃ এখন থেকে আমাদের বাড়ী অনেক হয়ে যাবে। রসুল (সঃ) বললেন, আল্লা-হো আওসায়ো মিন যা-লেকা অর্থাৎ আল্লাহ এর চেয়ে বহু বেশী দেনেওয়ালা। তবে এই হাদীসটী মুরসাল (যার সনদের মধ্যে কোন রাবী বাদ গেছে। সুতরাং রেওয়ায়াতটী তত জোরদার নয়)। আনাস বিন মালেক থেকে মরফুভাবে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কুল হুআল্লাহো আহাদকে ৫০ বার পড়ে আল্লাহ তার ৫০ বৎসরের গোনাহ মাফ করে দেন (আবু ইয়ালা)। এই হাদীসটির সনদও যয়ীফ। ইবনে কাসীরও সুরা এখলাসের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাতে ২০০ বার পড়ার সওয়াবের কথা এসেছে। কিন্তু ওর অধিকাংশ রেওয়ায়াতগুলো যয়ীফ। বোরায়দাহ বলেন, একদা আমি হযরতের সাথে মসজিদে এলাম। একজন লোক নামাযে এই দোআ করছিল ঃ– اللهم انى اسئلك بأنى اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.

(আল্লা-হুম্মা আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুল লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ)। তখন হযরত বললেন, যাঁর হাতে আমার জান আছে তাঁর কসম। এই লোকটি আল্লার সেই "এসমে আযম" দ্বারা সওয়াল করেছে যার দ্বারা সওয়াল করা হলে আল্লাহ তাকে দান করেন এবং ওর দ্বারা দোয়া করা হলে তিনি তা কবুল করেন (সুনান গ্রন্থাবলী)। জাবেরের হাদীসে মগরেব বাদ ১০ বার এই সুরা পড়বার কথা এসেছে। হযরত (সঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চায় প্রবেশ করুক এবং যে "হুরে-য়ীন্‌কে" (সুলোচনা স্বর্গীয় নারীকে) সে চায় বিয়ে করুক (আবু ইয়ালা)। এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে ইবনে কাসীর কোন কথা বলেন নি। জারীর বিন আবদুল্লার হাদীসে এসেছে, যে-কেউ বাড়ীতে ঢোকার সময় এই সুরাটিকে পড়বে সেই বাড়ীওয়ালা এবং তার পড়শীদের গরীবী দূর হয়ে যাবে (তাবারানী)। কিন্তু এই হাদীসটির সনদ যয়ীফ।

আনাস বিন মালেকের হাদীসে এসেছে যে, আমরা একবার হযরতের সাথে তবুকে

http://islaminonesite.wordpress.com

ছিলাম। সেই দিনের মত আলো, চমক ও কিরণ আমরা কখনো দেখিনি। জিব্রাইল (আঃ) হযরতের কাছে এলেন। হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজকে এত আলো ও চমক কেন, যা এর আগে আমরা কখনো দেখিনি ? জিব্রীল বললেন ঃ মদিনায় মোআবিয়াহ বিন মোআবিয়াহ লায়সীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তাই তার জানাযার নামায পড়বার জন্য আল্লাহ ৭০ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। নবী বললেন ঃ এর কারণ কি ? জিব্রীল বললেন ঃ উনি দিনরাত চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে "কুল হুআল্লা-হো" পড়তেন (আবু ইয়ালা)। এই হাদীসটির সনদে ইয়াযীদ বিন হারূন নামে একজন লোক আছেন যিনি হাদীস জাল করতেন। এই হাদীসটি আরো কয়েকটি সনদে এসেছে, কিন্তু সমস্ত সনদগুলোই যয়ীফ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন হযরত যখন শোবার জন্য বিছানায় যেতেন তখন সুরা নাস ও ফালাকের সাথে এই সুরাটিকেও পড়ে হাতে ফুঁক দিতেন। তারপর যতদূর সম্ভব হাত দুটোকে সমস্ত শরীরে বুলাতেন, মাথা এবং সামনের দিক থেকে শুরু করতেন। তিনি ৩ বার এইরূপ করতেন (সুনান গ্রন্থবলী)।

*

সূরাতুল এখ্‌লাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

১। কুল হুআল্লা-হু আহাদ ২। আল্লা-হুস সামাদ। ৩। লাম ইয়ালিদ। অলাম ইউলাদ। ৪। অলাম ইয়াকুল্‌লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

তরজমা

১। (হে মোহাম্মাদ !) তুমি বলে দাও –সেই আল্লাহ একক। ২। যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন কিন্তু সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। ৩। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো দ্বারা জন্মলাভ করেননি। ৪। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

সূরাটির সারাংশ

হযরত একরেমা বলেন ঃ যখন ইহুদীরা বলে যে, আমরা আল্লার ছেলে

ওযায়েরের পূজারী এবং খ্রীষ্টানরা বলে যে, আমরা আল্লার ছেলে ঈসা মসীহের পূজারী আর অগ্নিপূজকরা বলে যে, আমরা চাঁদ ও সূর্য্যের পূজারী এবং মোশরেকরা বলে যে, আমরা বুতের পূজারী তখন আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরের উপর এই সূরাটি নাযেল করেন এবং বলেন ঃ তুমি বল যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন উযীর-নাযীর ও সমকক্ষ নেই। এই কথাটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ব্যাপারে বলা যায়না। কারণ তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্মে ও গুণাবলীতে পূর্ণাঙ্গ।

সামাদ শব্দের ভাবার্থ

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ সামাদ সেই যার কাছে সমস্ত সৃষ্টিজগত তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে যেতে বাধ্য। অন্য শব্দ এই যে, সামাদ তাকে বলে যিনি নেতৃত্ব, ভদ্রতা, মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পূর্ণাঙ্গ হন। এমন ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ পাকই আছেন। এইসব গুণাবলীর যোগ্য কেবল তিনিই। সুতরাং তাঁর কোন জুড়ি নেই এবং কেউই তাঁর সমতুল্যও নয়। আবু অয়েল বলেন ঃ তিনি সাইয়েদ বা নেতা যিনি সরদারীর চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন। ইবনে মাসউদও তাই বলেন। যায়দ বিন আসলাম বলেন ঃ সামাদের অর্থ সাইয়েদ বা সর্দার। একরেমা বলেন ঃ সামাদ সেই যার থেকে কোন জিনিষ বাইরে বের হয়না এবং তিনি খাবারও খান না। রবীঅ্ ইবনে আনাস বলেন ঃ সামাদ তিনি যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো দ্বারা তিনি জন্মও নেননি। উবাই বিন কা'বও একথা বলেন। ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস, সায়ীদ ইবনুল মোসাইয়েব মোজাহেদ, ইবনে বোরায়দাহ একরেমা, সায়ীদ বিন জোবায়ের, আতা, আতিয়্যাহ, যাহ্হাক, সুদ্দী প্রমুখদের উক্তি এই যে, সামাদ সেই যার পেট নেই। অর্থাৎ নিরেট ও ফাঁপা নয়। শাবী বলেন ঃ সামাদ তিনি যিনি খান না এবং পান করেন না। ইবনে বোরায়দাহ বলেন, সামাদ একটি দীপ্তিময় জ্যোতি। বোরায়দাহ বলেন ঃ সামাদ সেই যার পেট নেই। আবুল কাসেম তাবারানী কিতাবুস সুন্নাতে এইসব উক্তিগুলো উল্লেখ করার পর বলেন যে, এই সমস্ত অর্থগুলো সহীহ বা সঠিক। এগুলো আমাদের আল্লাহর গুণাবলী। সবাই তাঁর মোহতাজ। তিনি তাঁর সরদারীর চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন।

কুফুউন শব্দের ব্যাখ্যা

মোজাহেদ বলেন ঃ কুফু-র অর্থ সঙ্গিনী। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ (বাদীউ সসামা-ওয়া-তি অল আরযে আন্না-ইয়াকূনু লাহূ অলাদুন অলান তাকুন লাহূ সা-হিবাহ) অর্থাৎ তিনি আসমান সমূহ ও যমীনের অভিনব সৃষ্টিকর্তা। কি করে তার ছেলেপুলে হতে পারে ?

http://islaminonesite.wordpress.com

কারণ তাঁর তো সঙ্গিনীই নেই এবং তিনিই তো সমস্ত জিনিষকে সৃষ্টি করেছেন (সূরা আনআ-ম, ১০১ আয়াত)। অর্থাৎ তিনি যখন সব জিনিষ পয়দা করেছেন তখন তাঁর পয়দা করা জিনিষ তাঁর সমতুল্য কেমন করে হতে পারে ? আল্লাহ এর চেয়ে বহু উর্দ্ধে। তিনি পুত ও পবিত্র। এই প্রসঙ্গে সূরা মারয়ামের ৮৮ নং আয়াত থেকে ৯৫ নং আয়াত এবং সূরা আম্বিয়ার ২৬-২৭ আয়াত ও সূরা সা-দের ১৫৮-১৫৯ আয়াতও দেখুন।

বোখারী শরীফে এসেছে যে, দুঃখ কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে আল্লার চেয়ে বেশী সবরকারী আর কেউ নেই। কারণ, মানুষ বলে যে, আল্লার ছেলেপুলে আছে। অথচ তিনি ঐসব মানুষদেরকে রুযী দেন এবং নিরাপদে রাখেন। আবু হোরায়রার হাদীসে আল্লাহো আয্যা অজাল্লা বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। কিন্তু এটা তার উচিত নয়। সে আমাকে গাল দেয়। এটাও তার উচিত নয়। আমাকে তার মিথ্যুক বলার অর্থ এই যে, সে বলে, আমাকে আল্লাহ আর দ্বিতীয়বার পয়দা করবেন না, যেমন তিনি আমাকে একবার পয়দা করেছেন। পক্ষান্তরে প্রথমবার পয়দা করাটা দ্বিতীয়বারের চেয়ে আমার পক্ষে সহজতর নয়। আর তার গাল দেওয়ার অর্থ এই যে, সে বলে, আল্লাহর ছেলেপুলে আছে। পক্ষান্তরে আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দিইনি এবং কারো দ্বারা আমি পয়দাও হইনি। আর আমার জুড়িও কেউ নেই (বোখারী)।

ফতহুল বায়ানের বায়ান এই যে, "আল্লাহ" শব্দটি সমস্ত পূর্ণাঙ্গ ইতিবাচক গুণাবলীর প্রমাণ যথা—এলম (জ্ঞান), কুদরত (শক্তি), এরাদাহ (সংকল্প)। এবং "আহাদ" শব্দটি সমস্ত জালালী বা গাম্ভীর্য প্রকাশক গুণাবলীর প্রমাণ। এই গুণগুলো নেতিবাচক যা অনাদি ও চিরন্তন। সামাদ সেই, প্রয়োজনে যার কাছে যাওয়া যায়। কারণ, তিনি মানুষের অভাব পুরণের ক্ষমতা রাখেন। যাজ্জাজ বলেন, সামাদ সেই সর্দার যার উপরে আর কেউ সরদার নেই। কিংবা সামাদের অর্থ চিরস্থায়ী, অনাদি অনন্ত। অথবা যিনি কারো মোহতাজ নন, কিন্তু সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। অথবা যিনি প্রয়োজনে লক্ষ্যস্থল এবং আপদে-বিপদে মদদগার। কিংবা সেই ব্যক্তি যিনি যা চান তা-ই করেন এবং নিজের মর্জি মাফিক হুকুম চালান। ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস বলেন, সামাদ সেই যার "আহশা" (পেটের মধ্যকার জিনিষগুলো) নেই। লাম ইয়ালিদ এর অর্থ এই যে, তাঁর কোন পুত্র নেই। যেমন মারইয়াম (আঃ) এর পুত্র ছিল। লাম ইউলাদ এর অর্থ এই যে, তিনি কারো পুত্র নন। যেমন ঈসা ও ওযায়র (আঃ) কারো দ্বারা পয়দা হয়েছেন। এটা এই কারণে যে, কেউই তাঁর সমজাতীয় নেই। কাতাদাহ বলেন, আরবের মোশরেকরা বলতো যে, ফেরেস্তারা আল্লার মেয়ে। ইহুদীরা বলতো যে, ওযায়র আল্লার ছেলে এবং খ্রীষ্টানরা বলতো যে, ঈসা খোদার বেটা। তাই আল্লাহতাআলা "লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ" বলে ওদেরকে মিথ্যুক

সাব্যস্ত করেছেন। তারপর বলেন যে, আল্লার জুড়ি কেউই নেই—লাইসা কামিসলিহী শাইয়ুন অর্থাৎ তাঁর সাদৃশ্যের মতও কোন জিনিষই নেই (সূরা শূরা ১১ আয়াত)। কুফুউন আরবী ভাষায় নযীর বা সমতুল্যকে বলে। ইবনে আব্বাস বলেন, তাঁর কোন উদাহরণ নেই। মোটি কথা বক্তব্যের সার হল তিনটি বিষয় (১) এশরাক বা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা (২) তাশবীহ বা খোদার সমতুল্য কাউকে মনে করা (৩) তা'তীল বা খোদাকে বেকার ও অকর্মন্য মনে করা। এই সূরাটিতে ঐ সমস্ত দোষগুলো খণ্ডন করা হয়েছে—ফলিল্লা-হিল হাম্‌দ।

সংযোজন

সূরা এখলাসে ৪ টি আয়াত ১৫ টি শব্দ ও ৪৭ টি বর্ণ আছে (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৯০ পৃষ্ঠা)। এই সূরার ২০টি নাম পাওয়া যায়। তা হল এই ঃ—(১) সূরাতুত্ তাফরীদ (২) তাজরীদ (৩) তওহীদ (৪) এখলা-স (৫) নাজা-ত (৬) অলা-য়াহ (৭) নিসবাহ (৮) মা'রিফাহ (৯) জামা-ল (১০) মোকাশ্‌কেশাহ (১১) মোআওবেযাহ (১২) সামাদ (১৩) আসা-স (১৪) মা-নেআ'হ (১৫) মাহ্‌যার (১৬) মোনাফ্‌ফেরাহ (১৭) বারা-আহ (১৮) মোযাককেরাহ (১৯) নূর (২০) আমা-ন। এই সমস্ত নামগুলোর মধ্যে এখলা-স নামটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। কোরআনের যত সূরা আছে তার নামকরণ ঐসব সূরারই কোন একটি শব্দ দ্বারা ওর নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই সূরা এখলা-স তার ব্যতিক্রম। কারণ, এখলাস শব্দটি সূরা কুল হু আল্লা হো আহাদের মধ্যে নেই। এর এই নামটি সূরাটির ভাবার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেওয়া হয়েছে। আরবী "খালাস" শব্দের শাব্দিক অর্থ খালাস ও মুক্তি পাওয়া, বিশুদ্ধ করা প্রভৃতি। সুতরাং যে ব্যক্তি সূরাটির ভাবার্থানুযায়ী কাজ কোরে মরে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যায় (তফসীরে কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা)। এবং সে তার আকীদাকে বাতিল আকীদা থেকে বিশুদ্ধ কোরে নেয়।

নাযেলের কারণ ঃ—এই সূরাটি অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন যাহহাক বলেন ঃ—একদা মক্কার মোশরেকরা আমের ইবনে তোফায়লকে নবী (সঃ) এর কাছে পাঠায় এই বলে যে, আপনি আমাদের দল ভেঙেছেন, আমাদের ঠাকুরকে গালি দিয়েছেন এবং আমাদের বাপদাদার ধর্মের বিরোধিতা করছেন। তাই বলছি, আপনি যদি ফকীর হন তাহলে আমরা আপনাকে ধনী কোরে দেব। আপনি যদি পাগল হন তাহলে আমরা আপনাকে আশ্রয় দেব। আপনি যদি কোন নারী চান তাহলে আমরা তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেব। অতঃপর তিনি (সঃ) বললেন, আমি ফকীরও নই এবং পাগলও নই। আর কোন নারীরও ইচ্ছা আমার নেই। আমি হলাম আল্লার দূত। তাই আপনাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে আল্লাহ-পূজার দাওত দিচ্ছি। এরপর তারা ওকে আবার পাঠাল এবং বলল,

http://islaminonesite.wordpress.com

তাঁকে বল :–আপনার উপাস্যের প্রকৃতি বর্ণনা করুন। তিনি কি সোনার, না চাঁদির ? ফলে আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযেল করেন (কাবীর, পৃষ্ঠা–ঐ)। হযরত আনাস বলেন, একদা খায়বারের কিছু ইহুদী নবী (সঃ) এর কাছে এসে বললো, হে আবুল কাসেম ! আল্লাহ তাআলা স্বীয় পর্দার জ্যোতি দ্বারা ফেরেশ্‌ তাদের পয়দা করেছেন এবং আদমকে দুর্গন্ধময় পচা কাদা দিয়ে, ইবলীসকে অগ্নিশিখা দিয়ে, আসমানকে ধোঁয়া দ্বারা আর যমীনকে পানির ফেনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আপনি আপনার প্রভু সম্পর্কে সংবাদ দিন। এর উত্তরে তিনি (সঃ) কোন জওয়াব দিলেন না। অতঃপর জিবরাঈল এই সূরাটি নিয়ে এলেন (আবুশ শায়খের আযমাহ, তফসীরে মাযহারী ১০ম খণ্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)। যাহহাক, কাতাদাহ ও মোকাতেল বলেন, একদা ইহুদীদের কতিপয় পাদ্রী নবী (সঃ) এর কাছে এসে বলল, হে মোহাম্মাদ ! আপনি আপনার প্রভুর গুণাগুণ আমাদের সামনে বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আপনার উপরে বিশ্বাস করি। কারণ, আল্লাহ তাআলা তওরাতেও নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন। অতএব আপনি সংবাদ দিন যে, তিনি কোন্ জিনিষ থেকে তৈরী এবং কোন্ ধাতু–সোনা, তামা, পিতল, লোহা না রূপো থেকে সৃষ্টি ? তিনি কি খাওয়া দাওয়া করেন ? কার উত্তরাধিকারী তিনি এবং তাঁরও উত্তরাধিকারী কে ? তখন আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযেল করেন। ইবনে আব্বাস থেকে যাহহাক অন্য বর্ণনায় বলেন, নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি সাতজন পাদ্রীসহ নবী (সঃ) এর কাছে এসে বলে, আমাদেরকে আপনি আপনার প্রভুর গুণ বর্ণনা করুন। তিনি কোন্ বস্তু থেকে তৈরী ? তিনি (সঃ) বললেন, আমার প্রভু কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরী হননি। তিনি পদার্থ থেকে আলাদা। তখন এই সূরাটি নাযেল হয় (ইবনে তাইমিয়াহ রচিত সূরা এখলাসের তফসীর, উর্দু অনুবাদ, ২৪৮, ২৪৯ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার নাযেল সংক্রান্ত উক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লার প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লার রসুলকে মক্কার মোশরেক, এবং মদীনার ইহুদী ও খৃষ্টান তিনটি জাতিই প্রশ্ন করেছিল। প্রত্যেকের জওয়াবে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ সূরাটি বোধ হয় তিনবার নাযেল হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং তফসীরে কাবীরে বর্ণিত প্রথম বর্ণনাটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৩৬০ দেবতার পূজারী মক্কার মোশরেকরা যখন রসুলুল্লার মুখ থেকে এক আল্লার পূজা করার দাওত পায় তখন ঐ একত্ববাদের ডাক তাদের বহুত্ববাদী-কল্পনায় না কুলানোয় তারা মোহাম্মাদের (সঃ) আল্লাহ সম্পর্কে কিছু জানতে বাধ্য হয়। ফলে তারা প্রশ্ন করে। যার জওয়াবে সূরাটি নাযেল হয়। অতঃপর নবী যখন মদীনায় হিজরত কোরে তিন খোদায় বিশ্বাসী খৃষ্টান এবং হযরত ওযায়র (আঃ) কে আল্লার পুত্র জ্ঞানকারী বহুত্ববাদী ইহুদীদেরকে তওহীদের দাওত দেন তখন তারাও মক্কার মোশরেকদের মত হতভম্ব হোয়ে ঐ একই প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়। ফলে নবী (সঃ) এদেরকেও ঐ জওয়াব শুনিয়ে

দেন যা মক্কার মোশরেকদের শুনিয়েছিলেন। এখন উক্ত তিনটি প্রশ্নোত্তরের সময় যেসব সাহাবী নবীজির সামনে ছিলেন তাঁরা তাঁদের সামনে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর অনুযায়ী সূরাটি নাযেলের কারণ বর্ণনা করেছেন। ফলে নাযেলের ঘটনাটা বাহ্যতঃ তিনটি হলেও মূলতঃ তা এক। কখনো কখনো মোফাসসেরীনে কেরাম কোন প্রশ্নের জওয়াবে একটি আয়াত বা সূরা পাঠকেও অবতীর্ণের কারণ বলে অভিহিত কোরে থাকেন।

অগ্নিপূজকদের ধারণা যে, জগতের স্রষ্টা দুজন। একজন মঙ্গলের স্রষ্টা যার নাম ইয়াযদান এবং অন্যজন অমঙ্গলের, যার নাম আহরেমান। খৃষ্টানরা বলে আল্লাহ তিনজন এবং বহুত্ববাদীরা বাস্তবে প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ বহুজন। এইসব একাধিক খোদাবিশ্বাসীদের অলীক ও মনগড়া ধারণার প্রতিবাদ কোরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ দুই-তিন বা বহু নয়, বরং তিনি আহাদ বা এক–অদ্বিতীয়। সূরাটির অবতীর্ণের কারণে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ খায়দায় কিনা এবং তিনি কোন পদার্থ থেকে তৈরী কিনা। অর্থাৎ তিনি কোন জিনিষের মুখাপেক্ষী কিনা। তারই প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, তিনি সামাদ। অর্থাৎ সবরকম অভাবশূন্য এবং সমগ্র সৃষ্টিজীব তাঁর মুখাপেক্ষী। ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলতো : نحن ابناء الله অর্থাৎ আমরা আল্লার পুত্র (সূরায়ে মায়েদাহ, ১৮ আয়াত)। এবং ওযায়র ও ঈসা মসীহ্ আল্লার পুত্র (সূরা তওবা, ৩০ আয়াত)। আর মোশরেকরা বলতো :– وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا অর্থাৎ আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের কন্যা বানিয়েছেন (সূরা বানী ইসরায়ীল, ৪০ আয়াত)। এই মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদে বলা হয়েছে–লাম ইয়ালিদ অর্থাৎ তিনি কাউকে জন্ম দেননি। সুতরাং ইহুদী ও খৃষ্টান এবং হযরত ওযায়র ও ঈসা আলায়হেমাস সালাম এবং ফেরেশ্‌তা কেউই আল্লার ছেলে মেয়ে নয়। ইমাম শওকানী বলেন, কোন ব্যক্তিই একথা দাবী করেনি যে, আল্লার বাপ আছে (ফতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু যারা একথা বলে যে, আল্লার ছেলেমেয়ে আছে তাদের ঐ ধারণার ভাব একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহও নিশ্চয় কারো ছেলে। যেমন ইহুদী পাদ্রীরা নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর অ-রেস বা উত্তরাধিকারী কার ? ঐ ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত কোরে বলা হয়েছে–অলাম ইউলাদ। অর্থাৎ তিনি কারো পুত্র এবং সম্পত্তির ভাগীদার ও অরেস নন। কালবী বলেন, যিনদীকরা বলে, আল্লাহ এবং ইবলীস একে অপরের শরীক। আল্লাহ তাআলা মানুষ, প্রাণী, গৃহপালিত জন্তু এবং আলোর স্রষ্টা। আর ইবলীস হিংস্রপশু, সাপ-বিছা ও অন্ধকারের স্রষ্টা। খৃষ্টানদের ইয়াকুবী দল বলে :– إن الله هو المسيح بن مريم অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহই মারয়্যামের পুত্র ঈসা মসীহ (সূরা মায়েদাহ ১৬ আয়াত)। এবং ওদের নাসতুরী দলটি বলে :– إن الله ثالث ثلثة অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনজনের একজন (সূরা মায়েদাহ ৭৩ আয়াত)। সুতরাং যিনদীকদের ইবলীসের মত ইয়াকুবী ও

http://islaminonesite.wordpress.com

নাসতুরী খৃষ্টানদের ঈসাও আল্লার শরীক। আরবের মোশরেকরা জিন্নদেরকে আল্লার শরীক মনে করে। যেমন কোরআনে আছে ঃ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ - অর্থাৎ তারা জিন্নদেরকে আল্লার শরীক বানিয়েছে (সূরা আনআম ১০০ আয়াত)। যারা আল্লার ছেলেমেয়ে আছে মনে করে তাদের জ্ঞানে ঐ ছেলেমেয়ের মায়েরা আল্লার স্ত্রী। যারা তাঁর সঙ্গিনী এবং শরীক। এইসব মোশরেকদের প্রতিবাদে বলা হয়েছে–অলাম ইয়াকুল লাহূ কুফুআন আহাদ। অর্থাৎ তাঁর শরীক ও জুড়ী এবং সমকক্ষ কেউ নেই। এই সূরাটি আল্লার নিরংকুশ ক্ষমতা ও খাঁটি একত্ববাদের শিক্ষা পেশ করে।

আল্লার ব্যাপারে এই সূরাটি ঐরূপ, রসুলুল্লার শানে সূরা কাওসার যেরূপ। কারণ মোশরেকরা রসুলুল্লাহকে এই বলে খোঁচা মারে যে, তাঁর পুত্র না থাকায় তিনি আবতার ও নিবংশ। এখানে তারা আল্লার প্রতি খোঁচা মারছে এই বলে যে, আল্লার ছেলেমেয়ে আছে। মানুষের ছেলেমেয়ে না থাকা যেমন একটা দোষ তেমনি আল্লাহ তাআলার ছেলেমেয়ে থাকাটাই দোষ। সূরা কাওসারে আল্লাহ নিজেই রসুলুল্লার দোষ খণ্ডন করেছেন। আর এখানে তিনি তাঁর নবীর দ্বারা নিজেই সাফাই পেশ করেছেন। তাই তিনি স্বীয় রসুলকে বলেছেন, কুল–অর্থাৎ তুমি বলে দাও যে, আল্লার পরিচিতি এইরূপ (তফসীর কাবীর ৮ম খণ্ড, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)।

–ঃ সংযোজন শেষ ঃ– এস, এ, বারী

সূরায়ে তাব্বাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○
فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○

বাংলা উচচারণ ঃ–১। তাব্বাত য়্যাদা-আবী লাহাবিঁও অতাব্ব। ২। মা-আগনা-আনহু মা-লুহু অমা-কাসাব। ৩। সায়্যাসলা-না-রান যা-তা লাহাব। ৪। অমরআতুহু হাম্মা-লাতাল হাতাব। ৫। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

তরজমা

১। ভেঙে যাক আবু লাহাবের দুই হাত এবং সেও নিপাত যাক। ২। তার

ধনসম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তার কোনই কাজে আসেনি। ৩। বেরং মরার সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই সে দাউ দাউ করা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। ৪। এবং তার স্ত্রীও কাঠ বওয়া অবস্থায় (জাহান্নামে ঢুকবে)। ৫। যার গলায় খেজুর ছালের পাকানো দড়িও থাকবে।

এই সূরার নাম সূরা লাহাবও। এতে পাঁচটি আয়াত আছে যা ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের ও আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহো আনহুমদের মতে মক্কার নাযেল হয়েছে। মক্কায় নাযেল হওয়া সম্পর্কে কারো মতভেদ নেই। (১)

সূরাটি নাযেলের কারণ

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ–একদা হযরত (সঃ) বোতহার দিকে বেরিয়ে পাহাড়ে চড়লেন এবং এই বলে চীৎকার করলেন ঃ–ইয়া সাবা-হা-হ্ ইয়া সাবা-হা-হ্ সাবধান। ফলে যে কোরায়েশরা জড় হল। তিনি বললেন ঃ–আমি যদি তোমাদের বলি যে, দুশমনরা সকালে কিংবা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর হামলা করবে তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি ? সবাই বললো, হাঁ। তখন তিনি (সঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে সামনের আযাব থেকে ভয় দেখাচ্ছি। এই কথা শুনে আবু লাহাব বললো, এই জন্য কি তুই আমাদেরকে জড় করেছিলি ? তোর হাত ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহ বলেন ঃ–তাব্বাত য়্যাদা-আবী লাহাবিঁও অ তাব্বা—মাসাদ–অর্থাৎ আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক–পুরা সূরাটি নাযেল হয় (বোখারী)। বোখারীর অন্য শব্দ এই ঃ–তখন আবু লাহাব নিজের হাত ঝাড়তে থাকে এবং বলে, তাব্বান লাকা সা-য়েরাল ইয়াওমে আলেহা-যা জামা'তানা–তোর সারাটা দিন বরবাদ হোক। এই জন্য কি তুই আমাদেরকে জড় করেছিলি ?

তফসীর

প্রথম তাব্বাত শব্দ বদদোআ এবং দ্বিতীয় তাব্বা শব্দ বিধেয় বা ঐ বদদোআর বাস্তব সংবাদ। এই আবু লাহাব হযরতের এক চাচা ছিলেন। এর নাম আবদুল ওয্যা বিন আব্দিল মোত্তালেব এবং উপনাম আবু ওত্বাহ। এর চেহারা খুব লাল টকটকে ফর্সা ছিল। সেজন্য একে আবু লাহাব বা লাল টকটকে আগুনওলা বলা হোত। ইনি হযরতকে খুব কষ্ট দিতেন এবং হযরতের সাথে খুবই দুশমনী করতেন। ইনি হযরতের নামে মিথ্যা বদনাম দিতেন, তাঁকে হেয় জ্ঞান করতেন এবং তাঁর ধর্মের দোষ বের করবার চেষ্টা করতেন। আর তার স্ত্রীও খুবই দুশমনী করতো

(১) সংযোজন ঃ–এই সূরাতে ২০ টি শব্দ এবং ৮১ টি হরফ আছে (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)।–এস. এ. বারী।

http://islaminonesite.wordpress.com

এবং রাগেতে জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ ও কাঁটা বয়ে আনতো। অতঃপর কাঁটাগুলো রসুলুল্লাহর চলার পথে বিছিয়ে দিত যাতে তিনি (সঃ) কষ্ট পান।

রাবীআহ বিন আব্বাদ বলেন, একদা আমি হযরতকে যিলমাজায বাজারে দেখলাম। তিনি বলছিলেন, হে লোকসকল! লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলো, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাঁর কাছে অনেক লোক জড় হয়েছিল এবং তাঁর পেছনে লম্বা লম্বা (বাবরী বা হিপ্পী) চুলওলা এক স্বাস্থ্যবান ফর্সা লোক বলছিল যে, এই ব্যক্তি সা-বী (বিধর্মী) মিথ্যা বলছে। তারপর যে দিকেই তিনি (সঃ) যাচ্ছেন লোকটিও তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে? লোকেরা বললো, এঁর (সঃ) চাচা (মোসনাদে আহমাদ)। আবুয্ যেনাদ রাবীআহকে জিজ্ঞেস করলো যে, তখন তো তুমি ছেলেমানুষ হবে? সে বললো আল্লাহ্‌র কসম! তখন আমার বুদ্ধি হয়েছে এবং আমি পানির মশক ভরতাম (আহমাদ)। অন্য শব্দ এই ঃ—রাবীআহ বলছেন, আমি যখন জোয়ান মর্দ ছিলাম তখন একদিন আমার বাপের সাথে হযরতকে দেখলাম যে, তিনি গোত্রসমূহের পেছনে যাচ্ছেন এবং তাঁর পেছনে একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ আছেন। যার চেহারা চমকাচ্ছিল এবং তিনি "জুম্মাহ" বা যুলফী চুলওলা ছিলেন। হযরত কোন গোত্রের কাছে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে অমুক বংশের লোকেরা! আমি আল্লার রসুল তোমাদের জন্য। তোমাদেরকে বলছি যে, আল্লাহ্‌র পূজা কর। কাউকে তার শরীক কোরনা। আমাকে সত্য বলে জানো এবং আমাকে বাধা দিওনা। কারণ, আল্লাহ যে জিনিষ দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা যেন আমি চালু করতে পারি। হযরত যখন এই কথাগুলো বলে চুপ হতেন তখন তাঁর পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলতো, হে অমুক খানদান! এই ব্যক্তি তোমাদের নিকট থেকে এই জিনিষ চায় যে, তোমরা লাত ও ওয্যাকে ছেড়ে দাও এবং তোমাদের চুক্তিবদ্ধ বন্ধু মালেক বিন আকয়াশ বংশের জিনদের সাথে চুক্তি ভেঙ্গে দাও। আর ইনি যে নতুন মতবাদ ও গোমরাহী এনেছে তা তোমরা কবুল করে নাও। অতএব তোমরা এর কথা শুনোনা এবং এর অনুসরণ করোনা। আমি আমার বাপকে শুধালাম, এই লোকটি কে? তিনি বললেন, ইনি হযরতের চাচা আবু লাহাব (আহমাদ ও তাবারানী)।

তাব্বাত এর অর্থ হল আবু লাহাব ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে এবং তার আমল নষ্ট হয়ে গেছে। আর তার এই ধ্বংস ও ক্ষতি প্রমাণিতও হয়েছে। তার মালধন ও তার কামাই করা সম্পদ তার কোনই কাজে আসেনি। ইবনে আব্বাস বলেন, কাসাব এর অর্থ হল সন্তান। হযরত আয়েশা, মোজাহেদ, আতা, হাসান, ইবনে সারীন প্রমুখগণও তা-ই বলেন। ইবনে মসউদ বলেন, যখন হযরত (সঃ) তাঁর কওমকে ঈমানের দাওত দিলেন তখন আবু লাহাব বলে যে, আমার ভাইপো যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি কেয়ামতের দিনে আমার ছেলেমেয়ে ও মালধনকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নেব। তখন এই আয়াত নাযেল হয়। না-রান যা-তা লাহাব

এর অর্থ হল শিখাসম্পন্ন লাল টকটকে জলন্ত আগুন, যা খুব দাউ দাউ করে, হলকা মারে এবং ফিনকি উড়ায়। তার স্ত্রী কোরায়েশ মহিলাদের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে একজন ছিলেন। তার নাম হল উম্মে জামীল কিংবা আরদা বিনতে হারব বিন উমাইয়া। ইনি অবু সুফইয়ানের বোন। ইনি কুফরী ও হঠধর্মী করার ব্যাপারে স্বীয় স্বামীর সাহায্যকারিণী ছিলেন। সেইজন্য কেয়ামতের দিনে জাহান্নমেরও তিনি তার স্বামীর আযাবে সাহায্যকারীণী হবেন। আল্লাহ বলেন, তার গলায় রশি আছে। সে জাহান্নামের ইন্ধন বয়ে এনে তার স্বামীর উপর ফেলবে যাতে কোরে যে আযাবে সে থাকবে তা যেন আরো বেশী হয়ে যায়। এই মেয়েটি যেন ঐ কাজের জন্য তৈরী হচ্ছে। এই জন্য খেজুর গাছের পাক দেওয়া দড়ি নিজের গলায় ফেলে ঘুরে বেড়ায়। মোজাহেদ ও ওরঅহ বলেন যে, ঐ দড়িটি আগুনের। মোজাহেদ, একরেমা, হাসান, কাতাদাহ, সওরী, সুদ্দী প্রমুখ বলেন, হাম্মা-লাতাল হাতাব এর অর্থ চোগলখোর বা যে এর কথা ওকে লাগিয়ে ঝগড়া বাধায়। এই মেয়েটি চোগলখুরী করতো। ইবনে জারীর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইবনে আববাস, আতিয়্যাহ, যাহ্‌হাক ও ইবনে যায়দ বলেন, সে হযরতের পথে কাঁটা বিছাতো। ইবনে জারীর বলেন, সে হযরতকে দরিদ্রতার লজ্জা দিত। অথচ সে নিজে কাঠ কুড়াতো। তাই তাকেই (কাঠ কুড়ানী মাগী বলে) লজ্জা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথম অর্থটাই সঠিক। তবে আল্লাহই বেশী জানেন কোন্‌টা বেশী ঠিক। সায়ীদ বিন মোসাইয়েব বলেন যে, মেয়েটির একটি সুন্দর হার ছিল। সে বলতো যে, আমি এটাকে মোহাম্মদের দুশমনীতে খরচ করব। আল্লাহ এর বদলে তার গলায় একটা আগুনের দড়ি দেবার ব্যবস্থা করেন।

শা'বী বলেন, মাসাদ এর অর্থ ছাল। ওরঅহ বিন যোবায়ের বলেন, মাসাদ ৭০ গজের একটি জিঞ্জির। সওরী বলেন, এটা আগুনের একটা হার যা লম্বায় ৭০ গজ হবে। জাওহারী বলেন মাসাদ ছালকে বলে কিংবা ছালের দড়িকে অথবা খেজুর পাতার রশিকে। আবার কখনো এই রশি উটের খাল দিয়েও তৈরী হয়, অথবা তার পশম দ্বারা। যখন পশমগুলোকে পাক দিয়ে রশি তৈরি করা হয় তখন তা মাসাদে পরিণত হয়। মোজাহেদ বলেন, মাসাদের অর্থ লোহার তওক বা গলাবন্ধ।

আসমা বিনতে আবী বাক্‌র বলেন, যখন এই সুরাটি নাযেল হয় তখন এক চোখ কানী উম্মে জামীল বিনতে হারব বড় বালতি নিয়ে এল এবং তার হাতে একটি দড়ি ছিল। সে বলতে লাগলো ঃ— مذمما ابينا + ودينه قلينا + و امره عصينا
মোযাম্মামান (১) আবায়না + অদীনাহু কালায়না + অআম্‌রাহু আসায়না (অর্থাৎ আমরা নিন্দিতকে অস্বীকার করেছি এবং তার ধর্মের প্রতি বিরূপ হয়েছি আর তার

(১) উম্মে জামীল হযরতকে মোহাম্মাদ (প্রশংসিত) না বলে মোযাম্মাম (নিন্দিত) বলত—অনুবাদক

http://islaminonesite.wordpress.com

নাফরমানী করেছি) তখন হযরত (সঃ) মসজিদে বসেছিলেন এবং তাঁর সাথে আবু বাক্‌র ছিলেন । আবু বাক্‌র তাকে দেখে বললেন, হে আল্লার রসুল ! এই মোরদারখোর আসছে এবং আমার ভয় হচ্ছে যে সে আপনাকে দেখে ফেলবে। হুযুর (সঃ) বললেন, সে আমাকে দেখা পাবেনা । তারপর তিনি কোরআন পড়ে আল্লাহকে ধরলেন । যেমন আল্লাহ বলেন, وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وَ بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا- যখন তুমি কোরআন পড়লে তখন আমি এবং যারা আখেরাতের উপর ঈমান আনেনা তাদের মাঝে একটা আড়াল দেওয়া পর্দা সৃষ্টি করে দিলাম (সুরা বানী ইসরাঈল ৪৫ আয়াত) । সে এসে আবু বাক্‌রের নিকটে দাঁড়াল । কিন্তু হযরতকে দেখতে পেল না । তাই সে আবু বাক্‌রকে বললো, তোমার বন্ধু আমার বদনাম করেছে । আবু বাক্‌র বললেন, না, এই ঘরের রব্বের কসম ! তিনি তোমার কোন কুৎসা রটাননি । তারপর সে এই কথা বলে চলে গেল যে, কোরায়েশরা জানে, আমি তাদের সরদারের মেয়ে । অলীদ বলে, উম্মে জামীল নিজের ওড়নী গায়ে কাবার তওয়াফ করছিল । হঠাৎ চাদর জড়িয়ে গিয়ে সে ঠোকর খায় তখন সে বলে ঃ-তায়েসা মোযাম্মামুন অর্থাৎ নিন্দিত ধ্বংস হোক । উম্মে হাকীম বিনতে আব্দিল মোত্তালেব বলে যে, আমি অবিবাহিতা নারী । সুতরাং আমি ওকথা বলবনা । কারণ আমি ঘর থেকে খুব একটা বের হইনি সেজন্য আমি কিছু জানিনি । আমরা সবাই এক চাচার সন্তান । অতএব ব্যাপারটা কোরায়েশরা বুঝে নিক ।

ইবনে আব্বাস বলেন, যখন তাব্বাত সুরা নাযেল হয় তখন আবু লাহাবের স্ত্রী আসে । হযরত (সঃ) এবং আবু বাক্‌র (রাঃ) বসেছিলেন । আবু বাক্‌র বললেন, হুযুর । আপনি সরে যান, যাতে । আপনাকে কষ্ট দিতে না পারে । তিনি (সঃ) বললেন, আমার এবং ওর মধ্যে একটা আড়াল সৃষ্টি হয়ে যাবে । সে এসে আবু বাক্‌রকে বললো, তোমার সাথী আমার কুৎসা গেয়েছে । তিনি (রাঃ) বললেন, এই ঘরের রব্বের কসম । তিনি কবিতা রচনা করেন না এবং আবৃত্তিও করেন না । সে বললো, তুমি কি সত্যি বলছো ? তারপর সে চলে গেলে আবু বাক্‌র হযরতকে বললেন ঃ সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি !' হুযুর বললেন, একজন ফেরেস্তা আমাকে আড়াল করে দেয় যতক্ষণ না সে চলে যায় (বাযযার) । ইমাম বাযযার বলেন, হযরত আবু বাক্‌র থেকে বর্ণিত এই সনদের চেয়ে আর কোন উত্তম সনদের কথা আমি জানিনা । কোন কোন বিদ্বান বলেন, দড়ি বলতে জাহান্নামের দড়ি যা তার গলায় থাকবে । ঐ রশিতে বেঁধে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে । অতঃপর ঐ রশি চিরকাল তার গলায় থাকবে । আবু হানীফা দীনাওরী বলেন, ঐ দড়ি বালতির দড়ি ।

আলেমরা বলেন ঃ- এই সুরাতে হযরতের নবুওঅতের একটি প্রকাশ্য মো'জেযা ও জলন্ত সাক্ষ্য রয়েছে । কারণ, যখন এই সূরা নাযেল হয় এবং হযরত (সঃ) আবু

লাহাব ও তার বিবি সম্পর্কে এই খবর দেন যে, তারা শাকী বা দুর্ভাগ্যবান, তারা কেউ ঈমান আনবেনা তখন তিনি তাদের ঈমান আনাবার জন্য কাউকে নিযুক্ত করেননি, না প্রকাশ্যে, না অদৃশ্যে, না কারো সামনে না গোপনে । এটাই একটি প্রবল শক্তিশালী দলীল হযরতের নবুওঅতের । অলিল্লা-হিল হামদ অল মিন্নাহ ।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, তাববাত এর অর্থ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, ব্যর্থ হওয়া ও গোমরাহ হওয়া । হাতের কথা এইজন্য বলা হয়েছে যে, বেশীরভাগ কাজই হাতের দ্বারা হয় । কিংবা দুই হাতের ভাবার্থ হল স্বয়ং তার সত্ত্বা । আল্লাহ আবদুল ওয্‌যার কথা উপনাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন । কারণ, তিনি তার উপনামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন । ওয্‌যা একটি বুতের নাম । তার উপনাম এ কথার দলীল যে, তিনি জলন্ত আগুনে থাকবেন । কারণ "লাহাব" আগুনের শিখাকে বলে । যদিও তাকে তার সুন্দর চেহারার জন্য আবু লাহাব বলা হোত । তার চেহারা সৌন্দর্য্যের কারণে চমকাতো, যেমন আগুন চমকায় (কুরতুবী) । কেউ কেউ বলেন যে, তার নামই তার উপনাম ছিল । অতঃপর আল্লাহ বলেন যে, তার মাল ধন ও তার উপার্জিত সম্পদ যথা ব্যবসায়ের উন্নতি, মান-প্রতিপত্তি ও সন্তান-সন্ততি তার কোনই কাজে আসেনি । বরং সে এখন দাউ দাউ করা জলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে । এটা জাহান্নামের আগুন । আর তার বিবি যে কাঠ কুড়াতো সেও আগুনে ঢুকবে । সে এক চোখের কানী ছিল এবং কাঁটাওলা গাছ বয়ে আনতো ও সেগুলোকে হযরতের পথে বিছিয়ে দিত । সাঈদ বিন জোবায়র বলেন ঃ-"হামল" এর অর্থ গোনাহ ও পাপ বহন করা কিংবা লোকের কথা বওয়া (চুগলী খাওয়া) । জীদ এর অর্থ গর্দান । মাসাদ ছালকে বলে যার দ্বারা রশি তৈরী হয় । হাসান বলেন, ইয়ামনে একটি গাছ জন্মায় যার ছাল থেকে রশি তৈরী হয় তাকে মাসাদ বলে । ইবনে আববাস বলেন, এই রশি মক্কায় হয় ।

অনুবাদকের সংযোজন

রসুলুল্লাহ (সঃ) এর এক সৎ-চাচার নাম ছিল আবদুল ওয যা । মোকাতেল বলেন, লোকটি খুবই ফর্সা ছিল বলে তার উপনাম আবু লাহাব বা অগ্নিশিখার পিতা হোয়ে যায় (তফসীরে বাগাভী ৯ম খণ্ড ৩৩৪ পৃষ্ঠা) । হযরত আলির কয়েকটি উপনামের একটি নাম ছিল আবু তোরাব বা মাটির বাপ । আরবে এরূপ উপনাম রাখার প্রচলন ছিল । নবী হবার আগে রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দুই কন্যা হযরত রোকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমকে আবু লাহাবের দুই ছেলে ওত্‌বা এবং ওতায়বার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন । ফলে আবু লাহাব নবী (সঃ) এর চাচা এবং বৈবাহিক দুইই ছিলেন । কথায় বলে গৃহশত্রু বিভীষণ । ঠিক এইরূপ আবু লাহাবও ছিল রসুলুল্লাহ (সঃ) এর জন্য বিভীষণ স্বরূপ । কারণ ইবনে আববাস বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) নবী হবার পর তিন বছর

http://islaminonesite.wordpress.com

মক্কার পাহাড়ী ঘাটিতে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তে থাকেন। অতঃপর যখন ১৯ পারা সূরা শোআরার ২১৪ নংআয়াত ঃ وانذر عشيرتك الاقربين- (তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক কোরে দাও) নাযেল হয় তখন তিনি সাফা পাহাড় চড়ে তাঁর বংশের ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের উক্ত ঐশী বক্তব্য শুনিয়ে দেন। যার বিশদ বিবরণ এই বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। সাফা পর্বতের পাদদেশে নবীজির ঐ সতর্কবানী শোনার পর তাঁর গৃহশত্রু আবু লাহাবের গা জ্বলে। ফলে সে রাগেতে বলে, আজকে তোমার সারাটা দিন বরবাদ হোক। অতঃপর সে পাথর তুলে হযরতকে মারতেও উদ্যত হয়। নরাধম আবু লাহাবের এই দুর্ব্যবহারে স্বয়ং আল্লাহ রুষ্ট হন এবং এই সূরাটি নাযেল করেন (তফসীরে কাবীর ৮ম খণ্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা)। এই সূরাটিতে তিনটি ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে ঃ-(১) আবু লাহাব ধ্বংস হবে (২) তার ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি কোন কাজে আসবেনা এবং (৩) তার স্ত্রীও গলায় ফাঁস লেগে মরবে এবং জাহান্নামেও তার সঙ্গিনী হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আবু লাহাবের জীবদ্দশায় দুটি ভবিষ্যদ্বানী সত্য প্রমাণিত হয় এবং তিন নম্বরটি তার স্ত্রীর সামনে বাস্তবায়িত হয়। যার বিশদ বর্ণনা এই ঃ-

সূরা লাহাব যখন নাযেল হয় তখন আবু লাহাব তার দুই ছেলেকে বলে, তোমরা দুজন যদি মোহাম্মাদের (সঃ) দুই মেয়েকে তালাক না দাও তাহলে আমার মাথা খাবে। ফলে তারা দুজন তালাক দেয় এবং ছোট ছেলে ওতায়বাহ তার পিতার সাথে সিরিয়া যাবার কালে হযরতের কাছে আসে এবং কিছু কাফেরী কথা বলে। অতঃপর হযরতের মুখের উপর থুথুও ফেলে। কিন্তু হযরতের গায়ে তা লাগেনি। হুযুরের মেয়েকে তালাক দেবার পরও তার ঐ দুর্ব্যবহার এবং কটুকথা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত লাগায় নবী (সঃ) এর রাগ হয়। ফলে তিনি তার জন্য বদদোআ করেন এই বলে ঃ- اللهم سلط عليه كلبا من الكلاب অর্থাৎ খোদা গো! ওর উপরে একটা কুকুর লেলিয়ে দিও। এরপর তারা সিরিয়া সফরে বেরিয়ে পথে এক স্থানে অবস্থান করে। সেখানকার এক গির্জার সন্ন্যাসী বলেন, এই জায়গাটি হিংস্রজন্তুর আড্ডা। তখন আবু লাহাব কাফেলার লোকেদের বলে, আজকে রাতে তোমরা আমাকে সাহায্য কর। কারণ, আমি আমার পুত্রের ব্যাপারে মোহাম্মাদের (সঃ) বদদোআর ভয় খাচ্ছি। ফলে তারা ছেলেটির চার দিকে আসবাবপত্র রেখে দেয় এবং উটগুলো চারদিকে বেঁধে দেয়। যাতে বাঘ না আসতে পারে। এত করা সত্ত্বেও রাতে একটি বাঘ এল এবং ওদের ঘুমন্ত অবস্থায় সবার মুখ শুঁকতে শুঁকতে ওতায়বার কাছে পৌছল এবং তাকে ফেড়ে ফেলল (রুহুল মাআনী, আমপারা, ২৬২ পৃষ্ঠা, তফসীরে কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৫২, ৫ পৃষ্ঠা)। এই ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতা আবু লাহাবের সামনেই প্রতিপন্ন হয়।

এই সূরা অবতীর্ণের ৯/১০ বৎসর পর ২ হিজরীতে বদরের যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধের ৭

দিন পর আবু লাহাবের গায় কুষ্ঠ রোগ দেখা দেয়। ফলে সে মারা যায়। এভাবে তার লাশ তিনদিন পচতে থাকে। কারণ প্লেগের মত ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে কেউ তাকে ছুঁতে চায়নি। অতঃপর লাশটি পচে যখন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে তখন তার পরিবারের লোকেরা সুদানী কুলীদের মজুরী দিয়ে লাশটিকে পুঁতে দেয় কিংবা কোন গর্ত খুঁড়ে লাঠির খোঁচা মেরে লাশটি তাতে ফেলে পাথর চাপা দেয় (রুহুল মাআনী, পৃষ্ঠা ঐ, কাবীর, পৃষ্ঠা ৫২৭)। এটা হল ২য় ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতা প্রতিপাদন।

মুররাতুল হামদানী বলেন, উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটার বোঝা বয়ে এনে মুসলমানদের পথে বিছিয়ে দিত। এভাবে এক রাতে সে বোঝাটি বইতে বইতে ক্লান্ত হোয়ে পড়তঃ একটা পাথরের ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। অতঃপর এক ফেরেস্তা এসে তার পেছন থেকে গলার দড়িটা টান মারে। ফলে দড়িটা তার গলায় ফাঁস লেগে তাকে শেষ করে দেয় (তফসীরে কাবীর, ৮ম খণ্ডের পার্শ্বে মুদ্রিত তফসীরে আবু সসউদ, ৫৪০ পৃষ্ঠা ও তফসীরে ইবনে কাসীর ৯ম খণ্ডের হাশিয়ায় মুদ্রিত তফসীরে বাগাভী, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)। এটা হল ৩য় ভবিষ্যদ্বানীর বাস্তব প্রমাণ।

আবু লাহাবের তিন পুত্র ও এক মেয়ে ছিল। তার এক ছেলে ওতায়বাহ তার চোখের সামনে বাঘে খেয়ে মরে এবং বাকি দুই ছিল ওত্‌বাহ ও মোআত্তাব তার মৃত্যুর ৬ বৎসর পর মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম কবুল করে এবং তার মেয়ে দুররাহ দুই ভায়েরও আগে মক্কা থেকে হিজরত কোরে মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে তার ছেলে মেয়ে পিতার মোশরেকী ধর্ম ত্যাগ কোরে আবু লাহাবের দুশমনে পরিণত হয়। ফলে আল্লার ঘোষণা-তার ধনসম্পত্তি এবং সন্তানসন্ততি কোনই কাজে আসবেনা-অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হোয়ে ইসলাম দুশমনদের চোখ খুলে দেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক কোরে দেয়।

তাব্বাত ও তাব্বা শব্দের অনুবাদ-রহস্য

আরবী ভাষায় যখন কাউকে দোআ কিংবা বদদোআ দেওয়া হয় তখন অতীত ক্রিয়া (Past Tense) ব্যবহার করা হয়। যেমন-"জাযা-কাল্লা-হ"-আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন এবং "তায়েসা আবদুদ দীনা-র"-টাকাপয়সার গোলাম ধ্বংস হোক। তেমনি ভবিষ্যতে যে ঘটনা নিশ্চিতভাবে ঘটবে তার ভবিষ্যদ্বানীও অতীত ক্রিয়া দ্বারা করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ- اقتربت الساعة وانشق القمر অর্থাৎ কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ ফেটে (দুটুকরো হোয়ে) গেছে-সূরা কামার ১ম আয়াত। অনুরূপভাবে সূরা লাহাবের ১ম শব্দ তাব্বাত এবং তারপরের শব্দ তাব্বা দুটিই অতীত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। সেজন্য কিছু মোফাসসের বলেন, উক্ত দুটিই শব্দ বদদোআ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে ঐ দুই শব্দের অর্থ হবে-ভেঙে যাক এবং নিপাত যাক। আর কিছু তফসীরকারের মতে উক্ত শব্দ দুটি ভবিষ্যদ্বানী বলে

http://islaminonesite.wordpress.com

ওদের অর্থ হবে–ভেঙে গেছে এবং নিপাত হয়েছে। আমার জ্ঞানে ১ম তর্জমাটা আরবীর সঙ্গে ছন্দ মিল থাকায় এবং শ্রুতিমধুর মনে হওয়ায় আমি তাই করেছি।

সূরা লাহাবের নীতিশিক্ষা

এই সূরাতে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতঃ একথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষ হোক বা নারী, আপন হোক বা পর, বড় হোক বা ছোট, যে কেউ সত্যের বিরুদ্ধে লড়বে সে পরিণামে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হবেই। কোন নবীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও তাকে বাঁচাতে পারবেনা (তফসীরে উসমানী, ৭৯০ পৃষ্ঠা)। অতএব সত্যের শত্রুগণ কর্তৃক উপস্থাপিত যে কোন বাধা বিঘ্ন দর্শনে বিচলিত হওয়া কোন সাধকের পক্ষেই উচিত নয় (মওলানা মোহাম্মাদ আকরম খান অনূদিত আমপারা, ২০ পৃষ্ঠা)। আবু লাহাব ও তার স্ত্রীকে ধ্বংস কোরে আল্লাহ তাআলা কাউকে পরওয়া না করার প্রভাব ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেন যে, ভাইপোকে কিভাবে কওসার ও প্রচুর কল্যাণ দান করা যায় এবং তার দুশমন চাচাকে কিভাবে আবতার ও নির্বংশে পরিণত করতে হয় (তফসীরে হাক্কানী, আমপারা, ২৬৬ পৃষ্ঠা)। অতএব কোন ব্যক্তি যেন বংশগৌরব এবং ধনসম্পত্তির গর্ব না করে। বরং সে যেন আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের নির্দেশমোতাবেক চলার চেষ্টা করে। এই জন্যই মনে হয় যখন এই সূরাটি নাযেল হয় তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ফুপী হযরত সাফিয়্যাহ এবং আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা রাযিআল্লাহো আনহুমাকে ডেকে বলেন ঃ–আমি আল্লার কাছে তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবনা। তবে হাঁ, আমার যত মাল আছে তাম্বেকে তোমরা যত চাও তত আমি দিতে তৈরী আছি। (মোসনাদে আহমাদ, মুসলিম, তফসীর ইবনে কাসীর)।

তবে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কোন দুশমনও যদি কখনো কোন ভাল কাজ করে তাহলে আল্লাহ চাইলে তাকে পরকালে কিছু প্রতিদান দিতেও পারেন। যেমন রসুলুল্লার ভায়রা-ছেলে হযরত ওরওহ বলেন ঃ–সোআয়বাহ নাম্নী এক নারী আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন ঐ মেয়েটি আবু লাহাবকে নবীজীর জন্মের সুসংবাদ দেন। ফলে খুশিতে আবু লাহাব ঐ দাসীকে মুক্ত কোরে দেন। অতঃপর মেয়েটি হযরতকে দুধ খাওয়ান। পরিশেষে আবু লাহাব যখন মারা যায় তার এক বছর পর তার ভাই তথা রসুলুল্লার প্রিয়তম চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ) স্বপ্নে খুব খারাপ অবস্থায় আবু লাহাবকে দেখেন। অতঃপর আবু লাহাব তাঁকে বলেন, তোমাদের পরে আমি কোন আরাম পাইনি। তবে প্রতি সোমবারে আমার আযাব কিছুটা কম কোরে দেওয়া হয়। হযরত আব্বাস বলেন, ওটা এই জন্য যে, সোমবারে নবী (সঃ) পয়দা হয়েছিলেন এবং তাঁর জন্মের খবর দাসী সোআয়বাহ আবু লাহাবকে দেওয়ায় সে তাকে মুক্ত কোরে দিয়েছিলো। এটা তার ঐ দাসমুক্তিরই

ফল (বোখারী শরীফ, ৭৬৪ পৃষ্ঠা এবং ফতহুল বারী ৯ম খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)।

–ঃ সংযোজন শেষ ঃ– এস, এ, বারী

তফসীর সূরায়ে নাস্‌র

সূরা নাস্‌রের অপর নাম সূরা তাওদী। এতে তিনটি আয়াত আছে এবং সমস্ত মোফাসসেরের মতে এই সূরাটি মদীনায় নাযেল হয়েছে। ইবনে আব্বাস তা-ই বলেন। ইবনে ওমার বলেন ঃ–আইয়্যাম তাশরীকের মাঝখানে বিদায় হজ্জের দিনে আরাফাতের ময়দানে এই সূরাটি নাযেল হয়। নবী (সঃ) বুঝতে পারেন যে, এটা তাঁর বিদায় সঙ্কেত (আলবায্‌যার, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী)। ইবনে আব্বাস বলেন, যখন এই সূরা নাযেল হয় তখন হযরত বলেন ঃ–নুয়েয়াত এলাইয়্যা নাফসী অর্থাৎ আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে (আহমাদ)। ইবনে মারদোওয়ায়হে আর একটু বাড়িয়ে বলেন ঃ–কারোবা এলাইয়্যা আজলী অর্থাৎ আমার মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর থেকে হযরত (সঃ) আখেরাতের কাজ বেশী করে করতে থাকেন। উম্মে হাবীবার হাদীসে আছে যে, আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মতের মধ্যে স্বীয় জীবনের অর্ধেককাল কাটাননি। ঈসা ইবনে মারয়্যাম বানী ইসরাইলের মধ্যে ৪০ বৎসর ছিলেন এবং আমি এখন ২৫ বছর কাটিয়েছি। এবারে আমি এই বছরেই মরব। এই কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) কাঁদতে থাকেন তখন নবী (সঃ) বলেন ঃ–আমার আহ্‌লে বায়তের (বংশধরদের) মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। ফলে তিনি খুশীতে হেসে ফেললেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদোওয়হে)। এই হাদীসটিকে ইবনে আব্বাসও রেওয়ায়াত করেছেন (বায়হাকী)। এই সূরাটি কোরআনের চারভাগের একভাগের সমান এবং একটি পুরো সূরা হিসেবে সবশেষে এই সূরাটি নাযেল হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

বাংলা উচ্চারণ ঃ– ১। ইযা জা-আ নাস্‌রুল্লা-হি অল্‌ফাত্‌হো। ২। অরাআইতান না-সা ইয়াদ্‌খুলুনা ফী দীনিল্লা-হি আফ্‌ওয়াজা। ৩। ফাসাব্‌বিহ্ বেহাম্‌দি রব্‌বিকা অস্‌তাগফিরহো ইন্নাহূ ০ কা-না তাউওয়া-বা।

http://islaminonesite.wordpress.com

তরজমা

১। যখন আল্লাহর (তরফ থেকে) সাহায্য ও জয় এসে যাবে। ২। এবং তুমি দেখে নেবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে ঢুকছে। ৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে এবং তাঁর কাছে পাপের ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। নিঃসন্দেহে তিনি তওবা কবুলকারী (অনুশোচনা গ্রহণকারী)।

তফসীর

কোরআনের প্রত্যেক জায়গায় খোদায়ী ফায়সালার ওয়াদা আছে। কাফেররা ঐ ফায়সালার ফল তাড়াতাড়ি কামনা করতো। হযরতের শেষ বয়সে যখন মক্কা বিজিত হয় তখন আরবের লোকেরা দলে দলে মুসলমান হতে থাকে। ফলে ঐ ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়। এই সূরাটি হযরতের শেষ বয়সে নাযেল হয়। তাই তিনি বুঝতে পারেন যে, আমার উপর দুনিয়াতে যে দায়িত্ব ছিল তা আমি পুরো করেছি, এখন পরকালের সফর করতে হবে। ইবনে আব্বাস বলেন যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) আমাকে বদরী সাহাবীদের সাথে শামিল করে পরামর্শ করতেন। আমার ঐ দলে থাকাটা হয়ত কাউকে খারাপ লাগে, তাই একজন বললেন ঃ–এ আমাদের সাথে কেন আসে ? এ তো আমাদের ছেলেদের সমান। হযরত ওমর বললেন, তোমরা জান কি এ কে ? তারপর তিনি একদিন তাদেরকে ডাকলেন এবং আমাকেও ডাকলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, নিশ্চয়ই তিনি কোন জিনিষ দেখবার জন্যে আমাকে ডেকেছেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ–এযা জা-আ নাস্রুল্লা-হে অলফাত্হো আয়াতটি সম্পর্কে তোমরা কি বল ? কেউ বললো, এতে আমাদের আল্লার হাম্দ ও তওবা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য ও জয় দান করেছেন। আর কেউ কেউ চুপ থাকলো, কিছুই বললো না। হযরত ওমর আমাকে বললেন ঃ–কি গো ব্যাপারটা কি তাই ? তুমিও কি তাই বলো ? আমি বললাম, না। তাহলে তুমি কি বলছো ? আমি বললাম, এটা রসুলুল্লাহ (সঃ) এর মৃত্যুর কথা। আল্লাহতাআলা হযরতকে জানিয়ে দেন যে, এটা তোমার মরণের আলামত। অতএব এখন তুমি আল্লার তারীফ কর এবং নিজের দোষ ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনা কর। ওমর বিন খাত্তাব বলেন, আমিও তা-ই জানি (বোখারী, ইবনে জরীর)। মোসনাদে আহমাদে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের শব্দ এই যে, যখন এই সূরা নাযেল হয় তখন হযরত বলেন, নোয়েয়াত এলাইয়্যা নাফ্সী ফাইন্নী মাক্বুযুন ফী তিল্কাস সানাহ অর্থাৎ আমাকে মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি এই বছরেই মারা যাব (আহমাদ)। আবুল আলিয়াহ, মোজাহেদ, যাহ্হাক ও অন্যান্য বহু তফসীরকার বলেন যে, এই সূরাতে তাঁর হযরতের অফাতের খবর দেওয়া হয়।

ইবনে আব্বাস বলেন, একদা হযরত (সঃ) মদীনায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ

বলে উঠেন, আল্লাহো আকবার আল্লা-হো আকবার জা-আ নাসরুল্লা-হে অলফাত্হো ০ জা-আ আহ্লুল ইয়ামন অর্থাৎ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান আল্লার মদদ ও বিজয় এসেছে এবং ইয়ামনবাসী এসেছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লার রসুল ! ইয়ামনবাসী কারা ? তিনি বললেন ঃ– قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الايمان يمان والفقة يمان والحكمة يمانية তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের দিল নরম ও স্বভাব কোমল। ইয়ামনের ঈমানই ঈমান, ইয়ামনের ফেকাই ফেকাহ ও ইয়ামনের হেকমতই হেকমত (তাবারানী)। ইবনে আব্বাস বলেন, যখন এই সূরা নাযেল হয় তখন থেকে হযরত (সঃ) আখেরাতের কাজ খুব বেশী কোরে করতে থাকেন।

হযরত ওমরের কোন কোন সাথী বলেন যে, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ যখন শহর ও কেল্লাগুলো আমাদের জয় করিয়ে দেবেন তখন আমরা আল্লার হাম্দ (প্রশংসা) এবং ইস্তেগফার (পাপের ক্ষমা প্রার্থনা) করব। ইবনে কাসীর বলেন, এই অর্থটাও ঠিক। যার প্রমাণ এই যে, হযরত (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন চাশ্তের (প্রথম প্রহরের) সময় ৮ রাকআত নামায পড়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ নামায বিজয়ের নয়, বরং চাশতের নামায, কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ নবী (সঃ) চাশতের নামায কোনদিন ৮ রাকআত পড়েননি। তাহলে ঐদিনে ৮ রাকআত কি করে পড়লেন ? তাছাড়া সেসময় তিনি মোসাফের ছিলেন এবং মক্কায় অবস্থানের নিয়্যাতও করেননি। রমযানের ১৯ দিন বাকি ছিল। তিনি অন্যান্য নামায "কসর" করেছিলেন এবং লস্করদের সাথে ইফতারও করেছিলেন। সৈন্য সংখ্যা প্রায় ১০ হাযার ছিল। অতএব এই নামায মক্কা বিজয়েরই নামায ছিল। এইজন্য বলা হয়েছে যে, যখন কোন সেনাপতি কোন দেশ জয় করবে তখন ঐ দেশে ঢুকে প্রথমেই ৮ রাকআত নামায পড়বে। সা'দ ইবনে আবী আক্কাস মাদায়েন বিজয়ের দিন এইরূপ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এই ৮ রাকআত এক সালামে পড়তে হবে। কিন্তু সহীহ হুকুম এই যে, প্রতি দু রাকআতে সালাম ফিরতে হবে। যেমন আবুদাউদে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত প্রতি দু রাকআতে সালাম ফিরেছিলেন।

ইবনে আব্বাস যে কথা বলেছেন যে, এই সূরাটা নবীজীর মৃত্যু সংবাদ তা-ও ঠিক। হযরত আয়েশা বলেন যে, হযরত রুকু ও সেজদাতে (সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা অবেহেম্দেকা) খুব বেশী কোরে পড়তেন এবং কোরআনের তা-বীল (ব্যাখ্যা) করতেন (আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)। তাঁর অন্য শব্দ এই যে, শেষ বয়সে নবী (সঃ) এই দোআ খুব বেশী কোরে পড়তেন–(সুবহা-নাল্লা-হ অবেহাম্দিহী আসতাগফেরুল্লাহ অ আতুবো এলায়হে) এবং বলতেন যে, আমার রব্ব আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আমি আমার উম্মতের মধ্যে একটি আলামত দেখবো। তিনি আমাকে এই হুকুমও দিয়েছেন যে, যখন আমি ঐ নিশানীটা দেখা পাব তখন আমি তাঁর

http://islaminonesite.wordpress.com

তসবীহ, হাম্‌দ ও ইসতেগফার করব। কারণ তিনি তওবা কবুলকারী। সুতরাং আমি ঐ আলামত দেখে নিয়েছি। আল্লার মদদ ও বিজয় এসে গেছে, লোকেরা দলে দলে আল্লার দ্বীনে ঢুকতে লেগেছে (মুসলিম)। উম্মে সালমা বলেন যে, হযরত শেষ বয়সে উঠতে বসতে, আসতে যেতে "সুবহা-নাল্লাহ অবেহামদিহী" খুব বেশী কোরে বলতেন। আমি বললাম, হে আল্লার রসুল! আপনি এই কথাগুলো খুব বেশী বলছেন? তিনি বললেন, আমাকে এর হুকুম দেওয়া হয়েছে (ইবনে জারীর, তবে এই রেওয়ায়তটি গরীব বা বিরল-সুত্র)।

এখানে ফত্‌হ বা বিজয় অর্থে মক্কা বিজয়, এটা সবারই মত। আরবের গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলতো, যদি মোহাম্মাদ তাঁর জাতির উপর বিজয় লাভ করে তাহলে তিনি পয়গম্বর। যখন মক্কা বিজিত হয় তখন লোকেরা দলে দলে দ্বীনে ইসলামে ঢুকতে থাকে। মাত্র দুটি বছর অতিবাহিত হতে না হতেই সারা আরব ঈমান আনে এবং আরবের প্রত্যেক কবীলা (গোত্র) ইসলাম গ্রহণ করে। ফলিল্লাহিল হাম্‌দ অলমিন্নাহ। আম্‌রিবনে সাল্‌মাহ বলেন, যখন মক্কা বিজিত হয় তখন প্রত্যেক গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্য তাড়াতাড়ি করতে থাকে। কারণ, সমস্ত কবীলা একথা বলতো যে, মোহাম্মাদ ও তাঁর কওমকে তোমরা ছেড়ে দাও। যদি তিনি তাদের উপর বিজয় লাভ করেন তাহলে বুঝবে যে, তিনি সত্য নবী (বোখারী)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ একদা লোকেদের বিচ্ছিন্নতার দরুণ কেঁদে বললেন, আমি হযরতকে বলতে শুনেছি ঃ—ইন্নাল্লা-সা দাখালু ফী দীনিল্লা-হে আফওয়া-জান অসাইয়াখরুজুনা মিনহো আফওয়া-জান অর্থাৎ লোকেরা দলে দলে আল্লার দ্বীনে ঢুকেছে এবং অচিরে অনেকে তাথেকে দলে দলে বেরিয়ে যাবে (আহমাদ)। আমি বলি যে, এই হাদীসের সত্যতা এই যুগে খুব ভালভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। জাবেরের যুগে এই বিচ্ছিন্নতা ছিলনা, যা তার হাযার বছর পর বর্তমান জগতে দেখা যাচ্ছে। এই যুগে শত শত মুসলমান দ্বীন-ইসলাম ছেড়ে দিচ্ছে ইন্না-লিল্লাহ----।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, নাসর এর অর্থ সাহায্য। এই সাহায্য আল্লাহতাআলা হযরতকে কোরায়েশদের বিরুদ্ধে দান করেন, কিংবা তাঁর বিরোধী কাফেরদের বিরুদ্ধে। ফত্‌হ এর ভাবার্থ মক্কা বিজয়, কিংবা সমস্ত দেশ বিজয় অথবা সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিজয়। তবে প্রথম অর্থটি বেশী পরিষ্কার, দ্বিতীয় অর্থটি তুলনামূলকভাবে চলনসই এবং তৃতীয়টি কিছুটা মানানসই। দ্বীনুল্লাহ এর মানে ইসলাম। লোকেরা দলে দলে মুসলমান হতে থাকে। প্রথমে এক এক ও দুই দুই জন লোক ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর গোত্রের পর গোত্র দলে দলে আল্লার দ্বীনে ঢুকতে থাকে। একরেমা ও মোকাতেল বলেন যে, অরাআয়তান্না-সা'র মধ্যে "না-স" বা লোকেরা বলতে য়্যামানবাসী বোঝায়। কারণ, য়্যামনের ৭০০ লোক

একসাথে এসে ইসলাম কবুল করে। আবু হোরায়রার শব্দ এই যে, নবী (সঃ) এই আয়াত পড়ে বলেন ঃ লাইয়াখরুজুন্না মিনহো আফওয়াজান কামা দাখালু ফীহে আফওয়া-জান অর্থাৎ নিশ্চয় নিশ্চয় অনেক লোক দ্বীন থেকে দলে দলে বেরিয়ে যাবে যেমন তারা দলে দলে ঐ দ্বীনে ঢুকেছিল (হা-কেম)। এটা হযরতের মো'জেযা যে, তিনি যা বলেছিলেন এবং ইসলামের গরীবী সম্পর্কে যে খবর দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে।

তারপর আল্লাহ হযরতকে তসবীহ, হাম্‌দ ও এস্তেগফারের হুকুম দেন। হযরত আল্লার সমস্ত হকগুলো আদায় করতে নিজকে অপারগ মনে করায় তিনি খুব বেশী এস্তেগফার করতেন, যদিও তাঁর আগেপিছের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, এস্তেগফার সমস্ত নবীদের একটি এবাদত ছিল। এটা তারা গোনার কারণে নয়, বরং এই এস্তেগফার দ্বারাই তারা এবাদত করতেন। অথবা এস্তেগফার তাদের নিজের জন্য নয় বরং তাদের উম্মতের জন্য ছিল। তসবীহ এর ভাবার্থ নামায, কিন্তু উত্তম অর্থ হল খোদার পবিত্রতা বর্ণনা করা। সবশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ "তাওওয়া-ব" বা তওবা কবুলকারী। অর্থাৎ তাঁর উদারতার নিশান এই যে, যে কেউ তাঁর দিকে রুজু করে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তার উপর রহম করেন এবং তার তওবা কবুল করে নেন। এ কাজটা ঐকথার প্রমাণ যে, তিনি তওবাকারীর তওবা কবুল করার ব্যাপারে অতিশয় উদার।

ইবনে ওমার বলেন, এই সুরার পর "আল্‌ইয়াওমা আকমালতো লাকুম দীনাকুম" আয়াতটি নাযেল হয়। তারপর হযরত ৮০ দিন বেঁচে ছিলেন। এরপর "কালা-লাহ্‌" এর আয়াত নাযেল হয়। তারপর তিনি ৫০ দিন বেঁচে ছিলেন। ফের এই আয়াত নাযেল হয় ঃ অত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহে এলাল্লা-হে। এরপর তিনি ২১ দিন বা ৭ দিন বেঁচে ছিলেন। ৮ম হিজরীর রমযানে মক্কা বিজিত হয় এবং ১১ হিজরীর ১২ রবীউল আউঅলে হযরতের এন্তেকাল হয়।

সংযোজন

এই সূরাতে ৩ টি আয়াত, ১৯ টি শব্দ এবং ৭৯ টি বর্ণ আছে। এই সূরাতে একথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখনই কোন ব্যক্তি কোন কাজে সফল হবে তখন সে ঐ সাফল্যের খুশিতে যেন পার্থিব উৎসবে গা ভাসিয়ে না দেয়, মিছিল বার না করে, গানবাজনা না করে, আলোকসজ্জা কোরে অযথা পয়সা নষ্ট না করে, জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত না করে। বরং সে যেন আল্লার শুকরিয়া আদায় করে, তাঁরই গুণগান ও মহিমাকীর্তন করে। একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ— আমার উম্মতের বয়স ৬০ থেকে ৭০ এর ভেতরে হবে এবং খুব কমই লোক ঐ বয়স অতিক্রম করবে (তিরমিযী, মেশকাত, ৪৫০ পৃষ্ঠা)। রসুলুল্লাহ (সঃ) শেষ বয়সে সুবহা-

http://islaminonesite.wordpress.com

নাল্লা-হ অবেহামদিহী, আসতাগফেরুল্লাহ, অআতুবো এলায়হে, খুব বেশী কোরে পড়তেন। সুতরাং তাঁর উম্মতের মধ্যে যার বয়স ৬০ পার হবে সে যেন ঐ দোআগুলো খুব বেশী কোরে পড়ে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি দিন ও রাতে ৭০ বার আসতাগফেরুল্লাহ পড়ি। অন্য বর্ণনায় ৭০ বারেরও বেশী আছে এবং একটি বর্ণনায় ১০০ বার আছে (বোখারী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, তাবারানী)। রসূলুল্লাহ (সঃ) যদি দিনরাতে ১০০ বার তওবা করেন তাহলে আমাদের প্রতিদিনে কতবার তওবা করতে হবে সেটা চিন্তা করুন। খোদা আমাদেরকে তাঁর কাছে অধিক হারে তওবা করার তওফীক দিন—আমিন।

—ঃ সংযোজন শেষ ঃ— এস, এ, বারী

সূরায়ে কা-ফেরুনের ফযীলত

এই সূরায় ৬ টি আয়াত আছে। ইবনে মসউদ, হাসান ও একরেমার মতে এই আয়াতগুলো মক্কী এবং ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যাহ্হাক ও ইবনুয যোবায়েরের মতে মাদানী। জাবের বলেন যে, হযরত (সঃ) এই সূরাটিকে এবং কুল হুআল্লা-হো আহাদকে তওয়াফের দু রাকআত নামাযে পড়েছিলেন (মুসলিম)। হযরত আবু হোরায়রা বলেন, হযরত এই সূরা দুটোকে ফজরের দু রাকআত সুন্নতে পড়তেন (মুসলিম)। ইবনে ওমার বলেন, নবী (সঃ) ফজর ও মগরেবের সুন্নতে এই সূরা দুটোকে বিশ বারেরও বেশী পড়েছেন (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদোআয়হে)। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান বা উত্তম বলেছেন। হযরত উবাই বলেন যে, হযরত বেতেরের নামাযে সাব্বে হেস্মা রাব্বেকাল আ'লা ও এই সূরা এবং কুল হুআল্লা-হো আহাদ পড়তেন (হা-কেম, ইনি এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। ইবনে ওমারের অন্য রেওয়ায়াতে হযরত (সঃ) এই সূরাটিকে "রুব্‌য়ে কোরআন" বা কোরআনের ৪ ভাগের ১ ভাগ এবং সূরা ইখলাসকে "সুলুসে কোরআন" বা কোরআনের ৩ ভাগের ১ ভাগের সমান বলেছেন (তাবারানী ও মোহাম্মাদ বিন নাস্‌র)। নওফেল বিন মোআবিয়াহ আশজায়ী একদা হুযুর (সঃ)-কে বলেন ঃ—হে আল্লার রসুল! আমাকে শিখিয়ে দিন, আমি বিছানায় গিয়ে কি পড়ব? তিনি বললেন ঃ—কা-ফেরুন পড়ে শুয়ে পড়। কারণ, এটা হল শিরক থেকে মুক্তি (আহমাদ ও আহলে সুনান)। একদা হযরত (সঃ) ইবনে আব্বাসকে বলেন ঃ—আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দেবনা যা তোমাকে আল্লার শিরক থেকে বাঁচিয়ে রাখবে? শোবার সময় কা-ফেরুন সূরা পড়তে থেকো (আবু ইয়ালা ও তাবারানী)। যায়দ বিন আরকাম মরফুভাবে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লার দুটি সূরার সাথে সাক্ষাত করে তার ওপরে কোন হিসাব-নিকাশ নেই। সূরা দুটি হল কা-ফেরুন ও কুল হুআল্লা-হো আহাদ (ইবনে মারদোআয়হে)। খাব্বাব বলেন, হযরত আমাকে বলেছেন ঃ—যখন

তুমি বিছানায় যাবে তখন সূরা কা-ফেরুন পড়বে। তিনি (সঃ) নিজেও এইরূপ করতেন। অর্থাৎ শোবার সময় পুরো সূরাটি পড়তেন (বাযযার, তাবারানী ও ইবনে মারদোআয়হে)। এ সম্পর্কে বহু হাদীস আছে। কথিত আছে যে, ইবনে ওমার বলেছেন ঃ—আমি হযরতকে ২৪ কিংবা ২৫ বার ফজর ও মগরেবের সুন্নতে সূরা কা-ফেরুন ও কুল হুআল্লা-হো আহাদ পড়তে দেখেছি (আহমাদ)। রসূল (সঃ) যায়দ বিন হা-রেসাহকে বলেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন এই সূরা দুটোকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। কারণ, এরা শিরক থেকে মুক্তির উপাদান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

বাংলা উচ্চারণ ঃ— ১। কুল ইয়া-আইয়ুহাল্ কা-ফিরুন। ২। লা-আ'বুদু মা-তা'বুদুন। ৩। অলা-আন্‌তুম আ'বিদুনা মা-আ'বুদ। ৪। অলা-আনা আ-বিদুম্ মা-আ'বাদ্‌তুম। ৫। অলা-আন্‌তুম্ আ'বিদুনা মা-আ'বুদ। লাকুম্ দীনুকুম্ অলিয়া দীন।

তরজমা

১। (হে মোহাম্মাদ!) তুমি বলে দাও ঃ—ওহে সত্য প্রত্যাখানকারী কাফেরগণ! ২। আমি তার এবাদত করিনা তোমরা যার পূজা কর। ৩। আর তোমরাও তাঁর পূজারী নও আমি যাঁর এবাদত করি। ৪। এবং আমি তার এবাদতকারী হবনা তোমরা যার পূজা করে আসছো। ৫। আর তোমরাও তার পূজারী হবেনা আমি যাঁর এবাদত করছি। ৬। (অতএব) তোমাদের কাছে তোমাদের ধর্ম থাক এবং আমার কাছে আমার ধর্ম।

তফসীর

তোমরা যখন জেদ ধরেছ তখন তোমাদের বোঝানোর কোন ফায়দা নেই যতক্ষণ না আল্লাহ ফায়সালা করে দেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ এই সূরাটি মোশরেকদের আমলের প্রতি বিরূপভাব প্রকাশক। এতে "এখলাস" বা আল্লার খালেস এবাদতের

http://islaminonesite.wordpress.com

হুকুম দেওয়া হয়েছে । কাফেরূন শব্দের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কাফেরই শামিল । কিন্তু এখানে কোরায়েশ-কাফেরদের মুখোমুখি সম্বোধন করা হয়েছে । কথিত আছে যে, তারা তাদের মুর্খতার কারণে হযরত (সঃ) কে বলতো যে, একবছর আপনি যদি আমাদের ঠাকুরের পূজা করেন তাহলে আমরাও এক বছর আপনার মা'বুদের (আল্লার) এবাদত করব । তখন এই সূরাটি নাযেল হয় । আল্লাহ বলেন :–হে পয়গম্বর । তুমি তাদের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ বেযার হয়ে যাও এবং বলে দাও যে, তোমরা যাকে পূজা কর অর্থাৎ বুত ও খোদার শরীককে 'আমি কখনই তাদেরকে পূজতে পারি না । আর আমি যাঁর এবাদত করি অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ও শরীকহীন আল্লার' তোমরাও তার এবাদত করবেনা । তারপর পুনরায় বলা হচ্ছে যে, আমি এবাদতের ব্যাপারে তোমাদের পথে চলতে পারিনা এবং তোমাদের মোক্তাদী বা অনুসারী হতে পারিনা । আমি তো আল্লার মহব্বত ও খুশী মোতাবেক তাঁর এবাদত করি । আর তোমরা তো তাঁর এবাদত করনা এবং তাঁর শরীআতের হুকুম তামীল করনা । বরং তোমরা নিজের মন থেকে একটা মনগড়া নূতন জিনিষ তৈরী করে নিয়েছো । যেমন আল্লাহ বলেন :– ان يتّبعون الاالظن.......... الهدى· তারা ধারণার ও তাদের মন যা চায় তার পায়রবী করে । পক্ষান্তরে তাদের নিকট তাদের রব্বের তরফ থেকে হেদায়ত এসে গেছে–(সূরা নাজ্‌ম ২৩ আয়াত) অতঃপর হযরত (সঃ) তাদের সমস্ত কার্যাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন । কারণ আবেদের (উপাসনাকারীর) জন্য একজন মাবুদ বা উপাস্যের একান্ত প্রয়োজন, সে যাঁর এবাদত করবে এবং তাঁর পথে চলবে । তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আল্লার হুকুম মোতাবেক তাঁর এবাদত করেন । অতএব কলেমায়ে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-র প্রকৃত অর্থ এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং রসুলুল্লাহ (সঃ) যে পথের সন্ধান দিয়েছেন সে ছাড়া আর কোন পথও নেই । থাকলো মোশরেকগণ । তারা যেহেতু গায়রুল্লার পূজারী যার পূজার হুকুম আল্লাহ দেননি সেজন্য হযরত (সঃ) তাদেরকে বলে দেন যে, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম থাক এবং আমার জন্য আমার দ্বীন যথেষ্ট । যেমন আল্লাহ বলেন :–

وان كذبوك.................. وانا برى مما تعملون- (অর্থাৎ যদি তারা তোমাকে মিথ্যুক বলে তাহলে তুমি তাদেরকে বল যে, আমার কাজ আমি করি এবং তোমাদের কাজ তোমরা কর । আমার আমলের জন্য তোমরা দায়ী নও এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আমিও দায়ী নই–সূরা ইউনুস ৪১ আয়াত) আল্লাহ আরও বলেন :– لنا اعمالنا و لكم اعمالكم (তুমি বল----আমার কর্মফল আমার জন্য এবং তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য–সূরা শূরা ১৫ আয়াত) । ইমাম বোখারী বলেন যে, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম অর্থাৎ কুফর এবং আমার জন্য আমার ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম । কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতটির অর্থ এই–আমি

অতীতেও তার পূজা করতাম না তোমরা যার পূজা করছ এবং আমি ভবিষ্যতের বাকি জীবনেও তোমাদের কথা মানবনা । আর তোমরাও তার পূজা করবে না আমি যার পূজা করছি । এরা সেইসব লোক যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :– وليزيدن كثيرا........ كفرا (তোমাদের রব্বের তরফ থেকে তোমার নিকট যা নাযেল হয়েছে তা তাদের মধ্যেকার অধিকাংশ লোকের ঔদ্ধত্য ও কুফরীভাব বাড়িয়ে দেয়–সূরা মায়েদাহ, ৬৪ আয়াত) ।

ইবনে জরীর কোন এক আরবী ভাষাবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই বাক্যটি তা-কীদ বা বারবার উল্লিখিত জোরদার বাক্য । যেমন–ফাইন্না মাআল ওস্‌রে ইউসরান * ইন্না মাআল ওস্‌রে ইউস্‌রা ০ অথবা যেমন–লাতারাউন্নাল জাহীম ০ সুম্মা লাতারা উন্নাহা আয়নাল ইয়াকীন ০ এগুলো ইবনুল জাওযী ইবনে কোতায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন । এইসব মিলিয়ে মোট ৩টি উক্তি হয় :–(১) আমি যা উল্লেখ করেছি, (২) বোখারী ও অন্যান্য তফসীরকারগণ যা বর্ণনা করেছেন । অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে, (৩) তা-কীদ । এ ব্যাপারে একটি ৪র্থ উক্তিও আছে, তাহল সেই যার সমর্থন আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর কোন কোন কেতাবে করেছেন । তিনি বলেন যে, লা আবোদো মা তাবুদুন এর মধ্যে "নাফীয়ে ফেল" বা ক্রিয়া না করার কথা বলা হয়েছে । কারণ এটা জুমলাহ ফেলিয়্যাহ বা ক্রিয়াসূচক বাক্য । আর অলা আনা আ-বেদুম মা-আবাদতুম এর অর্থ "নাফীয়ে কুবল" বা মোটেই গ্রহণ না করা । কারণ জুমলাহ ইস্‌মিয়্যাহ বা বিশেষ্য সূচক বাক্যের সাথে নাফী বা না-করণের সংযোগ খুব বেশী জোরদার হয় । যেন ঐ বাক্য দুটিতে ক্রিয়া ও গ্রহণ উভয়ের নাফী বা না-করণ করা হয়েছে । যার অর্থ হল নাফীয়ে অকু বা বাস্তবে না হওয়া এবং নাফীয়ে এমকানে শারয়ী বা শরীআতগত ভাবেও সম্ভব না হওয়া । ইবনে কাসীর বলেন যে, এই উক্তিটিও উত্তম । তবে আল্লাহ বেশী জানেন কোন্‌টা উত্তম ।

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখগণ 'লাকুম দীনুকুম অলিয়া দীন' আয়াত থেকে দলীল পেশ করেছেন যে, "আল কুফ্‌রো মিল্লাতুন অ-হেদাহ" বা খোদাদ্রোহী সমস্ত কাফেররা এক জাতি । অতএব ইহুদীরা নাসারার এবং নাসারারা ইহুদীর উত্তরাধিকারী হবে । কারণ তাদের আপোষের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগ আছে, যা একেক অপরের ওয়ারেস করে থাকে । ইসলাম ছাড়া যত দ্বীন ও ধর্ম আছে সবই বাতেলের দিক দিয়ে এক । ইমাম আহমাদ ও তাঁর সম-মতাবলম্বীদের মতে খ্রীষ্টানরা ইহুদীর এবং ইহুদীরা খ্রীষ্টানের ওয়ারেস হবেনা । তাঁদের দলীল হল আম্র ইবনে শোয়ায়েব বর্ণিত এই হাদীসটি– لا يتوارث اهل ملتين شتى- (লা-ইয়াতাওয়া-রাসু আহ্‌লু মিল্লাতায়নি শাত্তা) অর্থাৎ দুই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী একে অপরের ওয়ারেস হবেনা । অল্লা-হো- আ'লাম ।

http://islaminonesite.wordpress.com

সূরাটি নাযেলের কারণ

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে–হে কাফেরগণ । আমি এখন সেই কাজ করবনা যা তোমরা চাচ্ছ--অর্থাৎ বুতপূজা এবং আমি ভবিষ্যতেও তা করবনা যা তোমরা আশা করছ–অর্থাৎ ঠাকুর পূজা । হাফেয ইবনুল কাইয়েম এই আয়াতের অধীনে "বাদায়েউল ফাওয়ায়েদে ১৫ টি মসআলা লিখেছেন । ইবনে আব্বাস বলেন ঃ–কোরায়েশরা হযরতকে (সঃ) বলেন, আমরা তোমাকে এত মাল দেবো যে, মক্কার কেউ তোমার সমান মালদার হবেনা এবং যে মেয়ের সাথে চাও তোমার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু আমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলনা এবং তাদের উল্লেখ খারাপ ভাষায় করনা । আর যদি তুমি এই প্রস্তাব মঞ্জুর না কর তাহলে আমরা আর একটি কথা বলছি যাতে তোমারই মঙ্গল আছে । তিনি বললেন, তা কি ? তারা বলল, তুমি এক বছর আমাদের বুত-খোদার পূজা কর এবং আমরা এক বছর তোমার আল্লার এবাদত করব । জওয়াবে হযরত (সঃ) বললেন যে, আমি একটু অপেক্ষা করে দেখি, এ ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার কি বলেন ? তারপর আল্লার তরফ থেকে অহীর আকারে এই সূরা নাযেল হয় এবং সেই সাথে এই আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়–

أفغير الله تأمرونى ...... وكن من الشاكرين ٥

অর্থাৎ হে জাহেলগণ । তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করার হুকুম দিচ্ছ ? পক্ষান্তরে হে মোহাম্মাদ । তোমার কাছে এবং তোমার পূর্বে যারা ছিল তাদের কাছে (এক আল্লার এবাদত করার) অহী করা হয়েছে । অতএব তুমি যদি শিরক কর তাহলে তোমার সমস্ত আমল নিশ্চয় নিশ্চয় বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমিও অবশ্য অবশ্য ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে গণ্য হবে । বরং তুমি আল্লার এবাদত কর এবং তাঁর শুকরিয়া আদায়কারীদের দলভুক্ত হও–সূরা যোমার ৬৪-৬৬ আয়াত–ইবনে জরীর, ইবনে আবী হা-তেম ও তাবারানী) । তারপর বলেন, তোমরাও তো আগামীতে সেই কাজ করবে না যা আমি চাচ্ছি অর্থাৎ আল্লাহ্র এবাদত ।

বাদায়েউল ফাওয়ায়েদে বলা হয়েছে যে, এই সূরাতে ব্যবহৃত "না" বাচক অব্যয়গুলো এই সূরার বিশেষ বৈশিষ্ট । কারণ, এই সূরাটি শিরক থেকে বিরূপভাব প্রকাশক । যেমন হাদীসে এসেছে যে, এর একমাত্র মহান উদ্দেশ্য হল মোঅহ্হেদ (একত্ববাদী) ও মোশরেকদের (আল্লার একত্বে অংশীবাদীদের) মধ্যে পারস্পরিক বিরূপভাব প্রকাশ করা । সেইজন্য উভয়পক্ষে "না" বা না-বাচক অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে । আর এই কারণে হযরত (সঃ) এই সূরাকে এবং সূরা এখলাসকে ফজর ও মগরেবের সুন্নতে পড়তেন । উক্ত সূরা দুটিই তওহীদীভাব সম্বলিত, যা ছাড়া কোন লোকের নাজাত বা মুক্তি হতে পারেনা । দুটোরই মধ্যে আল্লার সাথে শিরক ও কুফরী না করা এবং আল্লার সন্তানাদি ও জনক-জননী হতে পবিত্র হওয়ার কথা কথায় ও কাজে বিদ্যমান আছে । যেমন সূরা এখলাসে কথায় বলা হয়েছে যে, সেই আল্লাহ

একক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারো জনক নন এবং কারো সন্তানও নন । এইরূপ এই সূরা কাফেরূনে কার্যতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহই যেন তোমাদের মাবুদ বা এবাদতের স্বত্ত্বা হয় । তারপর বলা হয়েছে যে, আমি তার পূজারী নই যার পূজা তোমরা অতীতে করেছ । অর্থাৎ এই শিরক আমার দ্বারা কখনই হয়নি এবং আগামীতেও হবে না । আর তোমরাও তার এবাদত করবে না আমি যাঁর এবাদত করি । অর্থাৎ তোমাদের দ্বারাও একাজ কখনো হবেনা । আয়াতে এই অর্থটা সেই মোফাসসেরদের রায় মোতাবেক যারা এই আয়াতে তাকরার বা এক কথার বারংবার উল্লেখ নেই বলেন । তারা বলেন, প্রথম বাক্যটি ভবিষ্যতে এবাদত না করা সম্পর্কিত । যাজ্জাজ বলেন যে, হযরত এই সূরাতে নিজের তরফ থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বহু খোদার পূজা না করার কথা বলেছেন এবং তাদের তরফ থেকে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এক খোদার এবাদত না করার কথা বলেছেন । কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক বাক্যটিতেই বর্তমান ও ভবিষ্যতে দুইই হতে পারে । কিন্তু আমরা একটাকে বর্তমানের সাথে এবং অন্যটিকে ভবিষ্যতের সাথে 'তাকরার' দূর করার উদ্দেশ্যে বিশেষিত করে নিয়েছি । তবে এটা গোপন নয় যে, এগুলো সব মনগড়া ও আয়াসসাধ্য কথা । আসল কথা এই যে, এই তাকরারের উদ্দেশ্য হল তাকীদ এবং কাফেরদের আকাঙ্খার নিরসন করা রসুলুল্লাহ (সঃ) এর জওয়াব দ্বারা ।

'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যা

সবশেষে বলেছেন, তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য । তোমরা শিরক ও কুফুরী কাজে রাজী আর আমি তওহীদ ও ইসলাম নিয়ে খুশী । কিংবা তোমরা তোমাদের কর্মের ফল ভোগ করবে আর আমি আমার আমলের বদলা পাব । কারণ "দ্বীন" শব্দের অর্থ জাযা বা প্রতিদানও হয় ।-কেউ বলেন, এই আয়াতটি আয়াতে সায়ফ্ দ্বারা মনসুখ বা রহিত । কেউ বলেন, এটা মনসুখ নয় বরং এখবার বা সংবাদ দান, আর সংবাদ দানে রহিতকরণ হয় না । কেউ একথাও বলেছেন যে, পুরা সূরাটাই মনসুখ । কাজী বলেন, আমার দ্বীন আমার জন্য আমীন বা রক্ষক, তা কখনই ত্যাগ করার জিনিষ নয় । অতএব এর মধ্যে কুফরীর অনুমতিও নেই এবং জেহাদের নিষেধও নেই । তাহলে আয়াতে কেতাল দ্বারা এর মনসুখ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? যখন কিনা "দ্বীন" শব্দের তফসীরে হিসাব, জাযা ও এবাদত শব্দগুলোও এসেছে । হাফেয ইবনুল কাইয়েম বাদায়েউল ফাওয়ায়েদে লিখেছেন যে, এই সুরাটাকে মনসুখ বলার ব্যাপারে একদল লোক বিরাট ভুল করেছেন । কারণ এই আয়াতটাই তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করে । অন্যান্যরা বলেছেন যে, এই সূরাটা আহলে-কেতাবদের (ইহুদী-খ্রীষ্টানদের) সম্পর্কে, তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের ধর্মের উপর কায়েম

http://islaminonesite.wordpress.com

থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুটি উক্তিই ভুল। এই সূরা মনসুখও নয় এবং এটা কোন খাস আয়াতও নয়। বরং এটা সাধারণ ও স্পষ্ট আয়াত। এটা সেই সব সূরার অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর মনসুখ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই সূরা তো খালেস তওহীদ বা খাঁটি একত্ববাদের শিক্ষা দেয়। সেজন্য একে এখলাসও বলা হয়। সূরাটি কুফর ও শিরকের প্রতি বিরূপভাব প্রকাশের তাগাদা করে। অর্থাৎ আমি কখনই তোমাদের সমর্থন করব না। কারণ, তোমাদের ধর্ম সম্পূর্ণ বাতিল, তা তোমাদের জন্য খাস। ওতে আমার যোগদান মোটেই সম্ভব নয়। আমার দ্বীনে হক বা সত্যধর্মে তোমরাও তো শরীক হচ্ছ না। অতএব এটাতো বিরূপতার চরমরূপ, এখানে স্বীকার বা একরার কোথায়? যার উপর ভিত্তি করে আয়াতটিকে মনসুখ বা খাস করা যেতে পারে? বরং আয়াতটি মোমেন ও কাফেরদের পারস্পরিক পার্থক্যের ব্যাপার স্পষ্ট, প্রতিষ্ঠিত ও প্রামান্য যতক্ষণ না আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ও তাদের এলাকাগুলোকে ঐ মোশরেকদের খপ্পর থেকে পাক না করেন। এটাই রসুলের অনুসারী ও আহলে-সুন্নাত এবং আহলে বেদআত ও গোমরাহদের মধ্যে বিরূপ ভাব প্রকাশের স্পষ্ট হুকুম। রসুলুল্লার খলীফা ও সন্তানগণ তাদেরকে বলেন–লাকুম দীনুকুম অলানা দীনুনা অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়না যে, তাদেরকে তাদের বেদআতের উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বরং এটা বিরূপতারই প্রকাশ মাত্র। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বোধে তাদের সাথে জেহাদ করার জন্য সাধ্যমত তৈরী থাকার কথাও অন্যত্র বলা হয়েছে।

সংযোজন

সূরা কা-ফেরূনে ৬টি আয়াত, ৩৬টি শব্দ এবং ৯৯টি বর্ণ আছে (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)। সূরাটির ১ম আয়াতে কা-ফেরূন শব্দ থাকায় এর নাম কা-ফেরূন রাখা হয়েছে। আরবী কা-ফের শব্দের বহুবচন কা-ফেরূন। কুফর শব্দের শাব্দিক অর্থ গোপন করা ও ঢেকে দেওয়া প্রভৃতি। চাষীরা বীজকে ক্ষেতের মধ্যে ঢেকে দেয় বলে কোরআনে ওদেরকে শাব্দিক অর্থে কাফের বলা হয়েছে। যারা আল্লাহ এবং রসুলকে অস্বীকার কোরে প্রকৃত সত্য গোপন করে তাদেরকে শরীআতের পরিভাষায় কাফের বলা হয়। এই পারিভাষিক কুফর চার প্রকার।

সূরাটির অন্যান্য নাম

কাফেরূন ছাড়াও এই সূরার আরো কয়েকটি নাম আছে। যেমন মোকাশ্‌কেশাহ অর্থাৎ মনের ব্যাধি থেকে আরোগ্যদানকারী এবং শেরক থেকে মুক্তিদানকারী (মোজমূআহ তফসীরে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিআহ, ৪২ ৮ পৃষ্ঠা)। জামা-লুল কোররায় এর নাম সূরা এবা-দাহ বলা হয়েছে এবং একে সূরা এখলাসও বলা হয়।

মোসনাদে দায়লামীতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মোনাফেকরা চাশতের নামায় পড়বেনা এবং কুল ইয়া আইয়োহল কাফেরূন তেলাঅত করবেনা (রূহুল মাআ-নী, আমপারা, ২৪৯ পৃষ্ঠা)।

সূরাটির ফযীলত

একদা রসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত জাবের ইবনে মোতয়েমকে বলেন, তুমি কি এটা চাও যে, যখন তুমি কোন সফরে বের হবে তখন তুমি তোমার সাথীদের চেয়ে সুখে থাকবে এবং তোমার পাথেয়ও অনেক হবে? তিনি বললেন, হাঁ, আমার মা-বাপ আপনার উপরে উৎসর্গিত হোক! তিনি (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি এই পাঁচটি সূরা পড়িও (১) কুল ইয়া-আইয়োহাল কাফেরূন (২) এযা-জা-আ-নাসরুল্লাহ (৩) কুল হুআল্লা-হো আহাদ (৪) কুল আউযো বেরব্বিল ফালাক (৫) কুল আউযো বেরব্বিন না-স। প্রত্যেক সূরাটি বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম দিয়ে শুরু করবে এবং এটা দিয়েই শেষ করবে। হযরত জোবায়র বলেন, আমি প্রথমে যখন সফরে যেতাম তখন খুবই গরীবী অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর রসুলুল্লার (সঃ) কাছ থেকে ঐ সূরাগুলো শিখে আমল করার পর আমার অবস্থা খুবই স্বচ্ছল হয় এবং আমার মালধনও খুবই বেড়ে যায়। এরূপ অবস্থায় আমি সফর থেকে ফিরি (মোসনাদে আবু ইয়ালা, তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)।

–ঃ সংযোজন শেষ ঃ– এস, এ, বারী

সূরায়ে কাওসার

এই সূরাটিকে সূরায়ে নাহ্‌রও বলে। এতে তিনটি আয়াত আছে। ইবনে আব্বাস, কালবী ও মোকাতেল প্রমুখ বলেন, এই সূরাটি মক্কী এবং হাসান, একরেমা ও মোজাহেদ বলেন, এটি মাদানী। কাতাদাহও তা-ই বলেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের ও আয়েশা বলেন, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লার নামে পড়া শুরু করছি)

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

বাংলা উচ্চারণ ঃ– ১। ইন্না আ'তায়না-কাল্ কাওসার। ২। ফসল্লি লিরব্ বিকা অন্‌হার। ইন্না শা-নিআকা হুআল্ আবতার।

http://islaminonesite.wordpress.com

তরজমা

(হে মোহাম্মাদ !) আমি নিশ্চয়ই তোমাকে "কাওসার" (প্রচুর কল্যাণ) দান করেছি। অতএব তুমি (ঐ মহাদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কোরবানী কর। নিঃসন্দেহে তোমার দুশ্মনই লেজকাটা।

কাওসার শব্দের তফসীর

জান্নাতের একটি নহরের নাম কাওসার। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। যে কেউ একবার তা পান করবে সারাজীবন তার আর পিপাসা লাগবেনা। একটি হাওযে তার পানিগুলো জমা হচ্ছে। হাশরের মাঠে তা থেকে দুটি ঝরণা প্রবাহিত হবে–একটি সোনার ও একটি রূপার। হাওযটি চারকোনা এবং তার এক কোন থেকে আর এক কোন দু মাসের পথ। তার মেঝেটি সোনা ও চাঁদির পাত দিয়ে তৈরী এবং তার পাশেই রয়েছে বহু হাওয়াখানা। খালি হাওযটিতে এক একটি মুক্তার ভেতরে বহু সোনা রূপার পানপাত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশের তারা যত, ঐ পানপাত্রগুলোর সংখ্যা তত। হযরত (সঃ) এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তাঁর উম্মতরা সেখানে পৌঁছে পানি পান করবে। হাশরের মাঠে থাকাকালীন তাদের আর পিয়াস মনে হবেনা। অতঃপর সে তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসবে এবং শান্তিতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছুতে পারবেনা তার জন্য আফসোস। কোরবানী হযরতের জন্য যরূরী ছিল এবং তাঁর উম্মতের মালদারদের জন্য এটা এখনও অতীব প্রয়োজনীয়। তবে গরীবদের জন্য এ হুকুম নয়। কাফেররা বলতো যে, তার (মোহাম্মাদের) ছেলেপুলে নেই। সুতরাং যতদিন সে বেঁচে আছে ততদিন তার নামধাম আছে। তারপর তার নাম লেনেওলা কেউ নেই। পক্ষান্তরে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম সমুজ্জ্বল। বরং ঐ কাফেরদের নাম লেনেওলা কেউই নেই।

আনাস বিন মালেক বলেন যে, একদা হযরতের (সঃ) একটু তন্দ্রা আসে। অতঃপর তিনি মাথা তুলে মুচকি হাসলেন। তারপর তিনি নিজেই বললেন, কিংবা সাহাবীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি মুচকি হাসলেন কেন ? তিনি বললেন, এখনই আমার উপর একটি সুরা নাযেল হল। অতঃপর তিনি সুরাটি পড়ে শোনালেন এবং তাদেরকে শুধালেন, তোমরা জান কি, কাওসার কি জিনিষ ? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুল বেশী জানেন। এবারে তিনি বললেন, একটি নহর, যা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। জান্নাতে তার চেয়েও বেশী আছে। কেয়ামতের দিনে আমার উম্মত ঐ নহরের কাছে আসবে। তাদের পাত্র তত, আসমানের তারা যত। তাদের মধ্যে একজনকে টেনে ধরে রাখা হবে। আমি বলবো, হে আমার পরওয়ার দেগার ! এই

লোকটি আমার উম্মতের একজন। তখন আমাকে বলা হবে যে, তুমি জানোনা যে, এরা তোমার মৃত্যুর পর কি কি কীর্তি করেছে (মোসনাদে আহমাদ)। হাওযের গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে দুটি ঝরণা নহরে কাওসারে গিয়ে পড়বে এবং তার পানপাত্রগুলো আকাশের তারকার মত অসংখ্য হবে (মুসলিম, আবুদাউদ ও নাসায়ী)।

অনেক কোররা বলেন যে, সুরাটি মাদানী। বহু ফোকাহা বলেন যে, বিসমিল্লাহ এই সুরাটির অন্তর্ভুক্ত এবং বিসমিল্লাহ এই সুরাটির সাথে নাযেল হয়েছে।

আনাসের রেওয়ায়াতে এসেছে যে, আমাকে কাওসার দেওয়া হয়েছে। তা একটি প্রবাহিত নহর, তার দুই কিনারায় মুক্তার পানপাত্র রাখা আছে। আমি তার মাটিতে হাত মারলাম, তা সুগন্ধি মেশ্‌কের মত, তার কাঁকরগুলো মুক্তার (আহমাদ)। আনাসের অন্য শব্দ এই যে, আমি জান্নাতে দাখেল হলাম। হঠাৎ একটা নহর দেখতে পেলাম, যার দুই কিনারাতে মুক্তার তাঁবু রয়েছে। আমি হাত দিয়ে দেখলাম যে, ঐ পানিটা কিসের ? তা খাঁটি মেশ্‌ক ছিল। আমি বললাম, হে জিব্রীল ! এটা কি জিনিষ ? তিনি বললেন, এটা সেই কাওসার যা আল্লাহ পাক আপনাকে দান করেছেন (আহমাদ ও বোখারী)। আনাস থেকে মরফুভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যখন আসমানে যান, বলেন, একটি নহরের পাশ দিয়ে আমাকে যেতে হল, যার কিনারায় মুক্তার খালি পানপাত্র রাখা ছিল। আমি বললাম, হে জিব্রীল ! এটা কি জিনিষ ? তিনি বললেন, এটা কাওসার। বোখারীতেও এই শব্দগুলোই আছে। আনাস বিন মালেক বলেন হযরত যখন মে'রাজে যান তখন জিব্রীল তাঁকে দুনিয়ার আসমানে নিয়ে যান। সেখানে একটি নহর ছিল যার কিনারায় মুক্তা ও মার্বেল পাথরের বালাখানা ছিল। হযরত তার মাটিগুলো শুঁয়ে শুঁয়ে দেখতে লাগলেন এবং জিব্রীলকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ? তিনি বললেন, এটা কাওসার, যা আপনার জন্য আপনার প্রভু লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর অন্য শব্দ এই যে, হযরত (সঃ) বলেন, আমি জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ সামনে একটি নহর দেখতে পেলাম, যার দুইধারে মতির খালি গ্লাস সাজানো রয়েছে। একজন ফেরেস্তা যিনি আমার সাথী ছিলেন বললেন, আপনি জানেন কি, এটা কি ? এটা হল কাওসার যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। হযরত যমীনে হাত মেরে একটু মাটি তুলে দেখলেন যে, সেটা খাঁটি মেশ্‌ক ছিল। তাঁর তৃতীয় শব্দ এই যে, হযরতকে জিজ্ঞেস করা হয় কাওসার কি জিনিষ ? তিনি বলেন, একটি নহর, যা আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। তার মাটী খাঁটি মেশ্‌ক ও দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। তার কাছে এমন সব পাখী আসে যার গর্দান উটের মত। আবু বাক্‌র বললেন, হে আল্লার রসুল ! ঐ পাখীগুলো তাহলে খুব ভাল হবে। তিনি বললেন, ঐ পাখীগুলোকে ভক্ষণকারী ব্যক্তি ওদের চেয়েও উত্তম হবে (ইবনে জরীর)। এই

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদও রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাতে আবু বাক্‌রের জায়গায় ওমরের নাম আছে। আয়েশার শব্দ এই যে, আমি নবী (স:)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কাওসার কি জিনিষ? তিনি বললেন, একটি নহর যা তোমাদের নবীকে দান করা হয়েছে। তার কিনারায় বহু মনিমুক্তা আছে এবং তার গ্লাসগুলো আকাশের নক্ষত্রের মত অগণিত (বোখারী, আহমাদ, ইবনে জরীর)। মাসরূক একদা আয়েশাকে বলেন, আমাকে কাওসারের হাল—হকীকত শোনান। তিনি বললেন, বোত্‌নানে জান্নাতের একটি নহর কাওসার। আমি শুধালাম, বোতনা-নে জান্নাত কি জিনিষ? তিনি বললেন, জান্নাতের মাঝখান। তার কিনারায় মতি ও ইয়াকুত পাথরের অট্টালিকা আছে। তার মাটিগুলো মেশ্‌কের মত সুগন্ধ এবং কাঁকরগুলো মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের (আবদুবনো হোমায়দ)।

বোখারী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাওসার সেই উত্তম বস্তু যা আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্‌হ (স:)-কে দান করেছেন। সায়ীদ বিন জোবায়রকে আবু বাশার বলেন লোকেরা মনে করে যে, কাওসার বেহেশতের একটি নহর। তখন সায়ীদ বললেন, ঐ নহরটি সেই উত্তম বস্তুসমূহের মধ্যে একটি। ইবনে আব্বাস কাওসারের তরজমা "খায়রে কাসীর" বা প্রভূত কল্যাণ করেছেন। এই তফসীরের মধ্যে নহরও অন্তর্ভুক্ত। মোজাহেদ বলেন, কাওসারের অর্থ দুনয়্যা ও আখেরাতের প্রভূত কল্যাণ। একরেমা বলেন, কাওসারের অর্থ নবুওত, কোরআন এবং আখেরাতের সওয়াব। ইবনে আব্বাস থেকে কাওসারের অর্থ নহরও সহী সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, উহা জান্নাতের একটি নহর, যার ধারে ধারে সোনা চাঁদি রয়েছে এবং ইয়াকুত ও মুক্তার উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হচ্ছে। তার পানি বরফের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি। এইরূপ একটি রেওয়ায়াত ইবনে ওমার থেকেও বর্ণিত আছে এবং তিরমিযীও মওকুফভাবে একটি রেওয়ায়াত এনেছেন। ইবনে ওমার মরফুভাবে হুবহু ঐরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমন আগে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম)। তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও উত্তম এবং সহীহ ও বিশুদ্ধ। ওসামা ইবনে যায়দ মরফুভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যমীনের কাওসার হল ইয়াকুত, মারজান, যাবারজাদ (সাদা, লাল ও সবুজ মার্বেল পাথর) এবং মুক্তা। কাওসারের অর্থ 'হাওয' হওয়া সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসগুলো অধিকাংশ হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট মোতাঅ-তের। আনাস, আবুল আলিয়াহ, মোজাহেদ ও অনেক সালাফের (সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখদের) মতে কাওসার জান্নাতের একটি নহর। আতা বলেন, হাওয।

নাহর শব্দের ব্যাখ্যা

তারপর আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাকে যেমন কাওসার দিয়েছি সেইরূপ তুমিও তোমার একমাত্র প্রভুর উদ্দেশ্যে ফরয ও নফল নামায পড় এবং তাঁর নামে কোরবানী কর। যেমন অন্যত্রে আল্লাহ্ বলেন: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ..... وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (অর্থাৎ তুমি বল—আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সারা জগতের

প্রতিপালকের জন্য নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এই সবের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর আমিই সর্বপ্রথম তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলমান (সূরা আনআ-ম)। ইবনে আব্বাস আতা, মোজাহেদ, একরেমা ও হাসান প্রমুখ বলেন "নাহ্‌রের" অর্থ উট বা ঐ জাতীয় জানোয়ারের কোরবানী করা। কাতাদাহ, কোরাযী, যাহহাক, রাবীঅ, আতা, হাকাম, ইসমাইল ইবনে আবী খালেদ ও অনেক সালাফও এ কথাই বলেছেন। এই হুকুমটা তার বিপরীত যার উপরে মোশরেকরা আমল করতো। তারা গায়রুল্লাহকে সেজদা করতো এবং গায়রুল্লার নামে কোরবানী করতো। যেমন আল্লাহ্ বলেন—

وَلَا تَأْكُلُوا ..... وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

(অর্থাৎ তোমরা তা খেয়োনা যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি, কারণ নিঃসন্দেহে উহা ফাসেকী জিনিষ (সূরা আনআম)। কেউ বলেন, নাহরের অর্থ নাহর বা সীনার নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। এটা হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। কিন্তু এ বর্ণনা সহী বা বিশুদ্ধ নয়। শাবীও এইরূপ বলেছেন। ইমাম বা-কের (আ:) বলেন, নাহরের অর্থ নামায শুরু করার সময় রাফ্‌য়ে য়্যাদায়ন বা দুই হাত তোলা। কেউ বলেন, নাহরের সাথে কেবলার দিকে মুখ কর। এই তিনটি উক্তিকেই ইবনে জরীর উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আলী থেকে একটি মুনকার (অগ্রাহ্য) রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। যদ্বারা নাহ্‌রের ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে, নামাযের প্রত্যেক তকবীরের সময় হাত তোলা উচিত (মোস্তাদরকে হাকেম)। আতা খোরাসানী বলেন, রুকুর পরে নিজের পিঠকে সোজা কর এবং সোজা হোয়ে দাঁড়াও আর রুককে টান কর। এগুলো সব অভিনব উক্তি। সঠিক কথা এই যে, নাহরের অর্থ কোরবানীর জানোয়ার যব্‌হ করা। এইজন্য নবীয়ে করীম (স:) ঈদের নামায পড়ে স্বীয় কোরবানীর জন্তু যব্‌হ করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে এবং আমাদের মত কোরবানী করে তার কোরবানী ঠিকই হয়। আর যে ব্যক্তি নামাযের আগে জানোয়ার যব্‌হ করে তার কোরবানী হয় না। আবু বোরদাহ ইবনে নাইয়ার বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আমার বকরী নামাযের আগে যব্‌হ করেছি এবং আমি জেনেছি যে, আজ সেই দিন যেদিন গোস্ত খাবার আকাংখা করা হয়। তিনি বললেন, শা-তুকা শা-তু লাহ্‌মিন অর্থাৎ তোমার বকরী কেবল গোস্ত খাবার বকরী। এটা কোরবানী হল না। এবার তিনি (রাযি:) বললেন, আমার কাছে একটি "এনা-ক" আছে, সেটাকে আমি দুটি বকরীর চেয়েও ভালবাসি। সেটা আমার জন্য যথেষ্ট হবে কি? নবীজী বললেন, হাঁ, হবে। তবে তোমার পরে অন্য কারোর জন্য "এনাক" যথেষ্ট হবে না। এনাকের অর্থ ছ'মাসের ছাগল ছানা। ইবনে জরীর বলেন, এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ এই যে, তুমি তোমার সর্বপ্রকার নামায একমাত্র তোমার পরওয়ারদেগারের উদ্দেশ্যে পড়। অন্য কোন শরীক বা মিথ্যা উপাস্যের জন্য নয়। এইরূপ তোমার কোরবানী কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য কর। কোন বুত বা ঠাকুরের জন্য নয়। যাতে করে তোমার এই নিখুঁত কাজগুলো তোমার সেইসব কল্যাণ ও সম্মানের শুকরিয়া হয় যা আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন এবং যদ্বারা তিনি তোমাকে অতুলনীয়

http://islaminonesite.wordpress.com

ও অনুপম করেছেন। ইবনে কাসীর বলেন, এই কথাটাই সবচেয়ে উত্তম কথা। ইমাম কোরাযী ও আতা এই কথাটা বলেছেন। আমি বলি যে, নামায এবাদতে বাদানী বা শারিরিক এবাদত এবং যব্হ করা এবাদতে মা-লী বা আর্থিক এবাদত। আল্লাহ্ দুরকম এবাদতই খালেস আল্লাহ্র জন্য করার হুকুম দিয়েছেন। এই হুকুমের ফলে শিরক ও বেদআতের জড় কেটে গেছে—অলিল্লাহিল হাম্দ।

আবতারের ভাবার্থ

তারপর আল্লাহ্ বলেন, হে মোহাম্মাদ! তোমার দুশমন এবং যে হেদায়ত ও সত্য এবং অকাট্য প্রমাণাদি ও উজ্জ্বল জ্যোতি তুমি সবার সামনে পেশ করেছো তার দুশমনই লেজকাটা, অর্থাৎ লাঞ্ছিত এবং নাম ও যশ থেকে বঞ্চিত।

সূরা কাওসার অবতীর্ণের কারণ

আ-স ইবনে অয়েল বলেছিল, তাকে ছেড়ে দাও, সে তো একজন অবতার বা আটখুড়ো, যার কোন বংশধর নেই। তার মৃত্যুর পর তার নাম কেউ নেবেনা! তখন এই সূরাটি নাযেল হয়। শিম্র বিন আতিয়্যাহ বলেন, ওকবা ইবনে আবী মুঈতের শানে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে আব্বাস ও ইকরেমা বলেন, কাব ইবনে আশরাফ ও কোরায়েশদের একদল কাফেরের ব্যাপারে সূরাটি নাযেল হয়। ইবনে আব্বাস বলেন, কাব ইবনে আশরাফ মক্কায় এল। কোরায়েশরা তাকে বললো, তুমি তোমার কওমের সর্দার, তুমি কি ঐ আটখুড়ো ও বংশধর থেকে বঞ্চিত লোকটিকে দেখছ না, যে এই ধারণা পোষণ করে যে, সে আমাদের চেয়ে শ্রেয়? পক্ষান্তরে আমরা আহ্লে হাজীজ (হজ্জব্রত পালনকারীদের দেখাশুনাকারী), আহলে সাদা-নত (কাবা ঘরের মোতাওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক) এবং আহলে সেকায়ত (মোসাফেরদের পানি দানকারী)। তিনি বলেন, তোমরা তার চেয়ে শ্রেয়। তখন এই আয়াত নাযেল হয় (বাযযা-র। এর সনদগুলো বিশুদ্ধ)। আতা বলেন যে, আবু লাহাবের ব্যাপারে এটি নাযেল হয়। কারণ, যখন রসূলুল্লাহ্র ছেলে মারা যায় তখন আবু লাহাব মোশরেকদের কাছে গিয়ে বলে, বাতিরা মুহাম্মাদু নিল লায়লাতা অর্থাৎ আজকের রাতে মোহাম্মাদ লেজকাটা আটখুড়ো হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ এই আয়াত পাঠান। ইবনে আব্বাস বলেন এই সূরা আ-স ইবনে অ-য়েল এর শানে নাযেল হয়েছে। মোজাহেদ, সায়ীদ ইবনে জোবায়ের ও কাতাদহও একথাই বলেন। ইবনে আব্বাসের অন্য বর্ণনায় আছে যে, সূরাটি আবু জাহ্লের ব্যাপারে নাযেল হয়েছে।

শা-নী এর অর্থ দুশমন! এই শব্দটি ব্যাপক। যারা উল্লিখিত দোষে দুষ্ট তারা সবাই এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত। ইকরেমা বলেন, আবতার এর অর্থ একলা। সুদ্দী বলেন, যখন কোন লোকের ছেলেপুলে মরে যায় তখন বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আবতার হয়ে গেছে। যখন ছেলেগুলো মারা যায় তখন কাফেররা বলে "বাতিরা মুহাম্মাদুন", তখন এই সূরা নাযেল হয়। প্রকৃতপক্ষে আবতার তাকে বলে যার নাম-ধাম মিটে যায়। তারা

তাদের মূর্খতার কারণে বলেছিল যে, মুহাম্মদের পুত্র মারা গেল তাই তার নাম নিশানা মুছে যেতে শুরু হল। হা-শা ও কাল্লা! না, না, কখনই না। বরং আল্লাহ্ তাঁর নাম যশকে সমস্ত লোকের মধ্যে অক্ষুন্ন রেখেছেন এবং তাঁর শরীআতকে সবার ঘাড়ে চাপিয়ে ফরয করে দিয়েছেন। এই হুকুম কেয়ামত, হাশর ও আখেরাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অলিল্লা-হিল হাম্দ!

ফতহুল বায়া-নে বলা হয়েছে যে, যে জিনিষ সংখ্যায় প্রভুত অথবা সম্মানিত কিংবা মহামূল্য হয় আরবরা তাকে কাওসার বলে। কাওসারের অর্থ খায়রে কাসীর বা প্রভুত কল্যাণ, যা প্রাচুর্যে অনন্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। অধিকাংশ মোফাসসিরীনের বক্তব্য, কাওসার বলতে জান্নাতে একটি নহর অথবা হাশরের মাঠে একটি হাওয, কিংবা কোরআন অথবা নবুওয়ত, নতুবা তফসীরে কোরআন, কিংবা সাহাবী ও উম্মতের প্রাচুর্য, অথবা স্বার্থত্যাগ, নতুবা ইসলাম, কিংবা উচ্চযশ, অথবা দিলের নুর, নতুবা কেয়ামতের দিনের শাফাআত, অথবা মুজিযাবলী, কিংবা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ঘোষণার গ্রহণ, নতুবা ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান অথবা পাঁচঅক্ত নামায। কিন্তু এগুলো সব এক একজনের অভিনব অভিমত। সঠিক উক্তি এই যে, জান্নাতে একটি নহর যার উল্লেখ বহু হাদীসে এসেছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ্র ঐ হাদীসী-তফসীরের দিকে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আরবী অভিধানে কাওসারের অর্থ খায়রে কাসীর বা প্রভুত কল্যাণ বলা হয়েছে। সেজন্য যারা কাওসারের অর্থ মরফু হাদীস দিয়ে না করে অভিধান দিয়ে প্রভুত কল্যাণ করেন তারা অভিধানকে হাদীসের ওপর প্রাধান্য দান করেন। রসূলুল্লাহ্ (স:) কাওসারের তফসীরে নহর করেছেন। অতএব অভিধানের তুলনায় এই শরয়ী তফসীর প্রাধান্যযোগ্য ও অগ্রগণ্য। প্রবাদে বলে: إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللهِ بَطَلَ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র নহর এসে গেছে তখন যুক্তিবুদ্ধির নহর বাতিল হয়ে গেছে।

কুরতুবী বলেন, সঠিক উক্তি দুটি উক্তি। একটি এই যে, কাওসার একটা নহর এবং দ্বিতীয় এই যে, কাওসার একটা হাওয। কারণ, নহর হওয়ার কথা হাদীসে এসেছে। কাযী ইয়ায বলেন, হাওযের হাদীসগুলো সহীহ ও বিশুদ্ধ এবং ওগুলোর উপর ঈমান আনা ফরয আর ওর উপরে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ। এই হাদীসগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতেও স্পষ্ট। আহলে সুন্নত অল্ জামাআত এই হাদীসগুলোর তাবীল (মনগড়া ব্যাখ্যা) করেন না। এতে কারো মতভেদও নেই। এই হাদীসগুলো বর্ণনার দিক দিয়ে মোতাঅ-তের এবং অকাট্য। সাহাবীদের একটি বিরাট দল এগুলো রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বায়হাকী "কিতাবুল বা'সি অন্নুশূর" গ্রন্থের মধ্যে এগুলোকে বিভিন্ন প্রকার সনদ সহকারে একত্রে সন্নিবিষ্ট করেছেন। কূতুল কুলূব গ্রন্থপ্রণেতা বলেন যে, নবী (স:) এর হাওয পুল সেরাতের পরে। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, রসূলুল্লাহ্র হাওয দুটি এবং দুটোরই নাম কাওসার। তবে হাঁ, মীযান ও হাওযের ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, কোন্টা আগে এবং কোন্টা পরে। আবুল হাসান ফা-সী বলেন, প্রকৃত কথা এই যে, হাওয আগে। বুদ্ধিও তাই বলে। কারণ, মানুষ কবর থেকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বের হবে। তাহলে পুলসেরাত ও মীযানের আগে হাওযেরই কাছে আসা উচিত।

http://islaminonesite.wordpress.com

আমপারা, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন, আল্লাহ্র ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরতের প্রত্যেক বিরোধী ব্যক্তিই প্রত্যেক বিষয় থেকে বঞ্চিত। যেমন তাদের আয়ুতে বরকত নেই যদ্বারা তারা পরকালের পাথেয় যোগাড় করতে পারে। তাদের অন্তরেও সদগুণ নেই, যদ্বারা তারা আল্লাহ্র পরিচয় ও প্রেম লাভ করতে পারে। তাদের আমলেও বরকত নেই, যার ফলে তাদের কাজে নিঃস্বার্থপরতা নেই এবং আল্লাহ্র ঐশী-মদদও নেই (রূহুল মাআনী, আমপারা, ২৪৮ পৃষ্ঠা)। রসূলুল্লাহ্ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদেরও যারা বিরোধিতা করে তাদেরও দশা ঐরূপ হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার অলীদের সাথে দুশমনি করে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি (বায়ানুল কোরআন ১২ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে আরাআইতা

এই সূরাটিকে সূরায়ে দীন, সূরায় মা-উন ও সূরায়ে ইয়াতীমও বলে। এতে ৬টি কিংবা ৭টি আয়াত আছে যা মক্কায় নাযেল হয়েছে। আতা ও জাবের একথা বলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, সূরাটির প্রথম অর্ধেকাংশ মক্কী এবং শেষ অর্ধেকাংশ মাদনী! প্রথম অংশ আ-স ইবনে অয়েলের শানে এবং দ্বিতীয় অংশ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের কারণে নাযেল হয়েছে। সুদ্দী বলেন, অলীদ ইবনে মুগীরার কারণে, যাহহাক বলেন, আমরিবনে আয়েয এর ব্যাপারে, ইবনে জুরাইজ বলেন, আবু সুফয়ান সম্পর্কে এবং কেউ বলেন, কতিপয় মোনাফেকের ব্যাপারে সূরাটি নাযেল হয়েছে।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ سَبْعُ اٰيٰتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু করছি)

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢
وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

বাংলা উচ্চারণ

১। আরাআইতাল্লাযী ইয়ুকায্ যিবু বিদ্দীন। ২। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদুও উল্ ইয়াতীম। ৩। অলা ইয়াহুয্যু আলা তআ-মিল মিসকীন। ৪। ফাঅইলুল্ লিল্মুসল্লীন। ৫। আল্লাযীনা হুম আন সলা-তিহিম সা-হূন। ৬। আল্লাযীনা হুম ইয়ুরা-উন। ৭। অইয়াম্ নাউনাল মা-উন।

তরজমা

তুমি কি দেখেছ তাকে যে ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে (পরকালের) বিচারের দিনকে? ২। (শোন) সে সেই ব্যক্তি যে এতীমকে ধাক্কা মেরে তেড়ে দেয়। ৩। এবং মিসকীনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে (অন্য কাউকে) উৎসাহ না দেয়। ৪। অতঃপর দুর্ভোগ রয়েছে সেইসব নামাযীদের জন্যে। ৫। যারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন থাকে। ৬। যারা উহা লোক দেখানো পড়ে থাকে। ৭। আর যারা ঘরোয়া ব্যবহারযোগ্য ছোট্টখাটো জিনিষ (পাড়া প্রতিবেশীকে) দিতে বিরত থাকে।

তফসীর

আল্লাহ্ বলেন, হে রসূলুল্লাহ্! তুমি কি কেয়ামত এবং পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারে অবিশ্বাসী লোককে দেখেছো? এরূপ লোকই তো মা-বাপ হীন ছেলেদেরকে বকাঝকা করে এবং তাদের হক মারে, তাদেরকে খাওয়ায় না, তাদের প্রতি কোনরূপ এহসান করে না এবং গরীবদেরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কাউকে উৎসাহ দেয় না। যেমন আল্লাহ্ বলেন: كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (অর্থাৎ তারা এতীমের সম্মান করে না এবং মিসকীনদের খাওয়ানোর ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহ দেয় না, সূরা ফজর)। মিসকীন এর অর্থ সেই ফকীর যার কাছে কোন জিনিষ নেই যদ্বারা তার দিন অতিবাহিত হয়।

ইবনে আব্বাস বলেন, সা-হূন এর অর্থ মোনাফেক। যারা প্রকাশ্যে নামায পড়ে, কিন্তু গোপনে নামায পড়ে না। কিংবা শরীআত নামাযের যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেছে তারা তার পরওয়া করে না। বরং যখন সময় একেবারে শেষ হয়ে আসে তখন তারা নামাযে দাঁড়ায়। এটা মাসরূক ও আবুয্ যোহার উক্তি। অথবা তারা সব সময়ই নামাযে দেরী করে। নতুবা তারা নামাযের নিয়ম কানুন ঠিকমত পালন করে না যেভাবে শরীআত তাদেরকে হুকুম দিয়েছে। কিংবা তারা নামাযে খুশূখুযূ করে না বা আল্লাহ্র ভয়ে জড়সড় হয় না এবং কোরআনের আয়াতের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে না! মোটকথা "সা-হূন" শব্দটির মধ্যে সবগুলো অর্থই পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত গুণগুলোর মধ্যে একটি গুণে গুণান্বিত হবে সে আয়াতটির একটি অংশের সাথে জড়িত হবে এবং যার মধ্যে সব গুণগুলো পাওয়া যাবে সে পুরাপুরি মোনাফেকে পরিণত হবে। যেমন সহীহায়ন বা বোখারী মুসলিমে এসেছে, নবী (সঃ) তিনবার বলেছেন, এ নামায মোনাফেকের। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে এবং সূর্য যখন শয়তানের দুটো শিংয়ের মাঝখানে এসে যায় তখন সে উঠে চার টক্কর মেরে নেয়। আর সে আল্লাহ্কে স্মরণ করে না, কিন্তু খুব কম। এই নামায আসরের নামায। এই সংকীর্ণ সময়ে যেহেতু তারা খুশূ ও খুযূ করতে পারে না সেজন্য বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্কে খুব কম স্মরণ করে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আর তাদের উঠে নামায পড়া এইজন্য যে, যাতে লোক দেখে। সেটা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ.....إِلَّا قَلِيلًا

অর্থাৎ নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহ্‌কে ধোকা দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা (আল্লাহ্‌কে নয়, বরং) নিজেদেরকেই ধোকা দিয়ে থাকে। আর যখন তারা নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা দাঁড়ায় খুবই কুড়েমিভাবে লোক দেখানোর জন্যে এবং তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, কিন্তু যৎসামান্য (সূরা নিসা, ১৪২ আয়াত)! ইবনে আব্বাস মরফুভাবে বলেন, জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে, যাথেকে স্বয়ং জাহান্নামে দিনে ৪০০ চারশো বার আল্লাহ্‌র পানাহ চায়। ঐ উপত্যকাটি মোহাম্মাদ (স:) এর রিয়াকার বা লোকদেখানেওলা উম্মতদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। চায় সে উম্মত আল্লাহ্‌র কেতাবওলা হোক, কিংবা গায়রুল্লার উপর বিশ্বাসী হোক, অথবা বাইতুল্লার হজ্জকারী হোক কিংবা আল্লাহ্‌র পথে বিচরণকারী হোক (তাবারানী)

ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীসে আছে :— من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কোন আমলের কথা লোককে শোনায় আল্লাহ্ তার সেই আমলকে স্বীয় সৃষ্টিজীবের প্রত্যেক শ্রবণকারীকে শুনিয়ে দেন এবং তারপর তাকে হেয় ও তুচ্ছ করে দেন (মুসনাদে আহমাদ)। তবে হাঁ, যদি কেউ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কোন আমল করে এবং লোকেরা সেটা জানতে পারে আর সে তাতে খুশী হয় তাহলে সেটা "রিয়া" বা লোক দেখানোর মধ্যে গণ্য হবে না। এর দলীল আবু হোরায়রা বর্ণিত এই হাদীসটি—একদা আমি নামায পড়ছিলাম, হঠাৎ একজন লোক এসে পড়ে। আমি এতে খুশী হই। অতঃপর আমি নবী (স:) এর নিকট এই ঘটনাটা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য দুটি নেকী লেখা হয়েছে। একটি নেকী লুকিয়ে করার এবং অপরটি অপরের জেনে ফেলার (আবু ইয়ালা)। হারুন ইবনে মারুফ বলেন, আমি খবর পেয়েছি যে, ইবনে মোবারক বলেছেন : نعم الحديث للسرائين এই হাদীসটি এদিক দিয়ে গরীব। আবু হোরায়রার অন্য শব্দ এই যে, একদা একব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! একজন মানুষ একটি কাজ লুকিয়ে করছে। অতঃপর যখন কেউ সেটা জেনে ফেলে তখন তাকে সেটা ভাল লাগে। নবী (স:) বললেন :— له اجران اجر السر واجر العلانية (লাহু আজরা-নি আজরুস সিররি অআজরুল আলা-নিয়াতি) অর্থাৎ তার জন্য দুটি পুরস্কার একটি গোপন করার এবং অপরটি প্রকাশ হয়ে পড়ার (আবু ইয়ালা, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে গরীব বা বিরল সূত্র বলেছেন।

আবু বারযাহ আসলামী বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযেল হয় :— الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ তখন নবী (স:) বলেন, এই আয়াতটি তোমাদের জন্য সারা দুনিয়ার চেয়ে ভাল। এটা সেই ব্যক্তি যে নামায পড়ে, কিন্তু কল্যাণের আশা করে না এবং যদি সে ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না (ইবনে জরীর)। এই রেওয়ায়াতটির

সনদে একজন রাবী জাবির জুফী যয়ীফ এবং তাঁর শায়খের নাম জানা যায় না। সাদ ইবনে আবী অক্কাস বলেন, আমি নবী (স:)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, যারা দেরী কোরে নামায পড়ে (ইবনে জরীর)। ইবনে কাসীর বলেন, নামাযে দেরী বলতে দুটি দিক হতে পারে। এক, হয় সে নামায মোটেই পড়ে না কিংবা অক্তের পরে পড়ে। অথবা আউঅল অক্তের চেয়ে দেরী করে। মোসআব বলেন, সাহূনের অর্থ সে এত গাফেল থাকে যে, সময় একেবারে সংকীর্ণ হয়ে যায়।

মানয়ে-মা-উন এর ভাবার্থ হল তারা তাদের রব্বের ইবাদত ঠিকমত করে না এবং সৃষ্টিজীবের প্রতিও তারা এহসান ও কল্যাণ করে না। এমন কি যে জিনিষ দ্বারা লোকের কোন উপকার হয় অথবা কোন সাহায্য হয় তা-ও তারা ধার দেয় না। অথচ কাজ হয়ে যাবার পর সে জিনিষটা তারা আবার ফেরতও পেয়ে যায়। তারা আত্মীয়-স্বজনকে যাকাতও দেয় না। মোজাহেদ বলেন, মা-উন এর অর্থ যাকাত। সুদ্দী, আবু সালেহ, ইবনে ওমর, মোহাম্মাদ ইবনে হানফিয়্যাহ, সায়ীদ ইবনে জোবায়র, একরেমা, মোজাহেদ, আতা, আতিয়্যাহ, যুহরী, হাসান, কাতাদাহ, যাহ্হাক ও ইবনে যায়দ রাহেমাহুমুল্লাহ্‌প্রমুখও তা-ই বলেন। হাসান বাসরী বলেন, যদি তারা নামায পড়ে তাহলে লোক দেখানো পড়ে। আর যদি কাযা হয়ে যায় তাহলে তাদের কোন দুঃখ হয় না এবং তারা মালের যাকাতও দেয় না। অন্য শব্দ এই যে, তারা মালের সদাকাহ্ দেয় না। যায়দ ইবনে আস্‌লাম বলেন, এরা মোনাফেক। নামায যেহেতু প্রকাশ্যে হয় তাই তারা এটা পড়ে এবং যাকাত যেহেতু গোপনে হয় তাই সেটা তারা দেয় না। ইবনে মসউদ বলেন, মাউন সেই জিনিষ যা লোকেরা হাতে হাতে নিয়ে থাকে। যেমন—কুড়াল, ডেগচি ও বালতি প্রভৃতি। তাঁর অন্য শব্দ এই যে, আমরা মহানবীর সাহাবীরা আপোষে আলোচনা করতাম যে, মাউন হল বালতি, ডেগচি ও কুড়াল। যেগুলো ছাড়া বহু কাজই হয় না। সায়ীদ ইবনে ইয়াযও একথা নবীর সাহাবীদের মুখে শুনেছিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ভাল জিনিষই সদাকাহ্। আমরা রসূলুল্লাহ্‌র যুগে মাউন বলতে বালতি ও ডেগচি ধার দেওয়া-নেওয়া বুঝতাম। অন্য বর্ণনায় মীযান (দাঁড়িপাল্লা) শব্দটি বেশী আছে। ইবনে আব্বাস বলেন, মাউন এর অর্থ ঘরের আসবাবপত্র। মোজাহেদ, ইবরাহীম নাখয়ী, সায়ীদ ইবনে জোবায়র ও আবু মালেক প্রমুখও বলেন যে, ঘরের সামান ধার দেওয়া। কেউ বলেন, ইবাদত থেকে বিরত রাখা। আলী বলেন, কুড়াল, বালতি ও ডেগচি না দেওয়া। ইকরিমা বলেন, যাকাতের মাল না দেওয়া। যার মধ্যে তুচ্ছ জিনিষ হল চালনী, বালতি ও সুঁচ প্রভৃতি। মোহাম্মাদ ইবনে কাব বলেন, মাউন এর অর্থ মারুফ বা ভাল জিনিষ। হাদীসে এসেছে :— كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (কুল্লু মারুফিন সাদাকাতুন) অর্থাৎ প্রত্যেক ভাল জিনিষই সদাকাহ। যুহরী বলেন, কোরায়শদের ভাষায় মাউন হল মালধন। আলী নোমায়রীর হাদীসে বলা হয়েছে যে, মাউন হাজার বা পাথর এবং হাদীদ বা লোহা (ইবনুল আসীর)। হাজারের ভাবার্থ পাথরের ডেগচি এবং হাদীদের অর্থ পিতলের ডেগচি— আল্লাহ্ আলাম।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, আরাআয়তা (তুমি কি দেখেছ)-র মধ্যে সম্বোধন

http://islaminonesite.wordpress.com

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে করা হয়েছে। আর দীন এর অর্থ আখেরাতের হিসাব নিকাশ ও বদলা দেওয়া। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌র হুকুম। সে যুগের লোকেরা মেয়েদের ও নাবালক ছেলেদেরকে অ-রেস বা সম্পত্তির ভাগীদার করতো না। আল্লাহ বলেন, এরা এতীমকে ধাক্কা মারে, মিসকীনকে খাওয়ায় না এবং মালধনে কঞ্জুসী করে। অয়ল এর অর্থ আযাব কিংবা ধ্বংস অথবা জাহান্নামের একটি উপত্যকা। সা-হূন এর অর্থ গাফেল ও বেপরওয়া। এখানে আল্লাহ্ عَن আন বলেছেন, فِي ফী বলেননি। কারণ মোমেনের নামায ভুলত্রুটিমুক্ত নয়। তার দলীল এই যে, নবীদেরও ভুল হয়ে যেত। নামাযে গাফলতির অর্থ নামাযে দেরী করা। অ-হেদী বলেন, এই আয়াতটি মোনাফেকদের শানে নাযেল হয়েছে। কারণ তারা নামায তো পড়ে, কিন্তু সওয়াবের আশা রাখে না-এবং নামায না পড়লে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করে না। সেজন্য তারা এত গাফলতি করে যে, নামাযের অক্তই চলে যেতে থাকে। যদি তারা মোমেনদের সঙ্গে থাকে তাহলে অপরকে দেখানো ও শোনানোর জন্য পড়ে নেয় এবং যখন কেউ থাকে না তখন উড়িয়ে দেয়—আর কে পড়ে! নাখয়ী বলেন, মাথা দিয়ে ইশারাতে সেজদা করে নেয় এভাবে এভাবে। ইবনে মাসউদের কিরাআতে "সাহূন" এর জায়গায় লা-হূন আছে। মোসআব ইবনে সাদ বলেন, তুমি কি এই আয়াতটি লক্ষ্য করেছ, আমাদের মধ্যে কে না ভুল করে? অথবা মনে মনে কথা বলে না? তিনি বলেন, আসল কথা তা নয়, বরং সাহূন এর অর্থ সময় নষ্টকারী। সাদ ইবনে আবী অক্কাস এই আয়াতের অর্থ নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন। জওয়াবে তিনি বলেন, সাহূন তারা, যারা নামায দেরী করে পড়ে (হা-কেম ও বাইহাকী)। হাদীসটি মওকুফ (অর্থাৎ উত্তরটা রসূলুল্লাহ্‌র নয়, বরং সাহাবীর)। এ রেওয়ায়াতটি বেশী সহীহ্। রিয়ার অর্থ নামায দেখানো কিংবা প্রত্যেক নেক আমল দেখানো, যাতে লোকে তার তারীফ করে। খা-যেন বলেন, যে ব্যক্তি নফল কাজ প্রকাশ্যে করে এবং এই উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা তার অনুসরণ করুক এবং তার দিল রিয়া থেকে পাক থাকে তার কোন ভয় নেই এবং সে রিয়াকার বা লোক দেখানেওলাও নয়। অধিকাংশ মোফাসসিরীন বলেন, মা-ঊন এর অর্থ কুড়াল, বালতি, ডেগচি এবং সেইসব জিনিষ যেগুলো দিতে মানা করা যায় না। যেমন—পানি ও নুন কিংবা যাকাতের মাল। কেউ বলেন, সাধারণভাবে গোলামের হক অথবা মালের লাভসমূহ। আল্লাহ্ তা আলা সদাকা, যাকাত ও প্রত্যেক ভাল জিনিষের নাম মা-ঊন রেখেছেন। কারণ, এটা বহুর মধ্যে কম। ইবনে মাসউদ বলেন, মুসলমানরা মোনাফেকদের কাছ থেকে বালতি, কুড়াল ইত্যাদি জিনিষ ধার চাইতো, কিন্তু তারা তা দিত না। তখন এই আয়াতটি নাযেল হয়।

সংযোজন

এই সূরাতে ৬টি আয়াত, ২৫টি শব্দ এবং ১২৫টি বর্ণ আছে। সূরাটি অবতীর্ণের কারণ এই যে, আবু জাহলের অভ্যাস ছিল যখন কোন ধনী ব্যক্তি অসুখে পড়তো তখন সে তার কাছে গিয়ে বলতো যে, তোমার মালধনের তত্ত্বাবধায়ক আমাকে কোরে দাও।

আমি তোমার নাবালক ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করব এবং সুভাবে লালনপালন করব। আর অন্য অরেস যেন তাদের উপর যুলম করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখব। এভাবে যখন সে কোন মরণাপন্ন ব্যক্তির মালের অধিকারী হোয়ে যেত তখন সে ঐ মৃত ব্যক্তির এতীম সন্তানদের হাঁকিয়ে দিয়ে মালগুলো লুটেপুটে খেত। ফলে এতীমরা পরের দোরে দোরে কেঁদে কেঁদে বেড়াত। এভাবে একদিন সে এক এতীমকে তাড়িয়ে দিলে ছেলেটি খালি গায়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এসে ফরিয়াদ করে। ফলে তিনি ছেলেটির দায় উদ্ধারের জন্য মালউন আবু জাহ্‌লের কাছে যান এবং তাকে কিয়ামতের মাঠে জওয়াবদেহীর ভয় দেখিয়ে উপদেশ দেন। আবুজাহল নবীজীর কথায় কান না দিয়ে কিয়ামত এবং পরকালের বিচারকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। ফলে নবী (সঃ) দুঃখিত হোয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর এই সূরাটি নাযেল হয় (তফসীর ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৭৮ পৃষ্ঠা ও তফসীরে হাককানী, আমপারা, ২৫০ পৃষ্ঠা)। ইবনে জোরায়েজ বলেন, আবু সুফয়্যান প্রতি সপ্তাহে দুটি কোরে উট নহর করতেন। অতঃপর একদা তাঁর কাছে এক অনাথ এসে কিছু গোশ্‌ত ভিক্ষা করে। ফলে তিনি তাকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। তখন সূরাটি নাযেল হয় (তফসীর কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা)।

সূরাটির শুরুতে 'তুমি' শব্দের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং তারপরে প্রত্যেক কোরআন-পাঠক। পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তির পরিচয় জানার প্রতি আগ্রহসৃষ্টির জন্য জিজ্ঞাসাবাচক অব্যয় দিয়ে সূরাটি আরম্ভ করা হয়েছে (রূহুল মাআনী, আমপারা, ২৪১ পৃষ্ঠা)। ২য় এবং ৩য় আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এতীমকে তাড়ানো এবং কাঙালদের না-খাওয়ানো পরকালে অবিশ্বাসীর আলামত। উক্ত দুই দোষে দুষ্ট ব্যক্তি খুবই কঠোর এবং পাষাণহৃদয় হয়। এরূপ এক ব্যক্তি একদা নবী (সঃ) এর কাছে তার হৃদয়ের কঠোরতার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি এতীমের মাথা ঝেড়ে দাও এবং মিসকীন ও কাঙালদের খানা খাওয়াও (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত ৪২৫ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াতে মোনাফেকের নিশানী বর্ণনা কোরে বলা হয়েছে যে, যারা ঠিক সময়ে নামায পড়ে না, বরং একেবারে শেষ সময়ে পড়ে এবং পড়লেও আল্লাহ্‌র ভয়ে নয় বরং লোক দেখানো পড়ে, তারা মোনাফেক ও কপট। ৪র্থ আয়াতে فِي صَلَاتِهِمْ আছে, عَن صَلَاتِهِمْ নেই। মোফাসসেরীনে কেরাম বলেন, "আন" শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, ওটা মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা নামায থেকে উদাসীন থেকে। "ফী" বললে মোমেনদের গুণ বোঝাতো। কারণ, মোমেনরা নামায থেকে গাফেল নয় বটে, কিন্তু নামাযের মধ্যে তারা কখনো কখনো শয়তানের অসঅসায় গাফেল হোয়ে যায় (মা আলা-মিল মোফাস্‌সিরীন, আমপারা ১৪৫ পৃষ্ঠা)। মোনাফেকরা যখনই কোন ভাল কাজ করে তখন তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং মানুষের কাছে নাম পাবার জন্য করে। এই লোকদেখানো-ভাব থেকে বাঁচা খুবই কঠিন। কারণ, মহানবী (সঃ) বলেন, অন্ধকার রাতে কালো বিছানাতে ছোট্ট কাল পিঁপড়ে যেমন সুড়সুড় কোরে আসে তেমনি মানুষের মধ্যে "রিয়া" বা লোক দেখানো-ভাব ওর চেয়েও অধিক সংগোপনে ঢুকে পড়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

(কাবীর ৮ম খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ্ রিয়া থেকে আমাদের বাঁচান—আমীন!

'মাউন' শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ বলেন, মাউন হল পানি, নুন ও আগুন প্রভৃতি। তাই একদা আয়েশা (রাযিঃ) নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! পানির গুরুত্ব বুঝলাম, কিন্তু নুন ও আগুনের গুরুত্ব কি? তিনি বলেন, হে হোমায়রা! যে ব্যক্তি কাউকে একটু আগুন দেয় সে যেন তাকে সেইসব জিনিষই সদাকাহ্ করল যে জিনিষগুলো ঐ আগুন দ্বারা রাঁধা হয়েছে। যে ব্যক্তি কাউকে নুন দেয় সে যেন সেইসব জিনিষই সদাকা করল যাতে ঐ নুন দিয়ে খাবারটি সুস্বাদু করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন জায়গায় এক চুমুক পানি পান করালো যেখানে পানি পাওয়া যায় সে যেন একটা দাসকে মুক্ত করলো এবং যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে যদি কেউ কোন মুসলমানকে এক চুমুক পানি খাওয়ায় তাহলে সে যেন মৃতকে জ্যান্ত করলো (ইবনে মাজাহ, তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ২৫০ পৃষ্ঠা)।

এইজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, মানুষ যেন তার ঘরে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বাড়তি জিনিষও রাখে যদ্দারা তার প্রতিবেশীর কাজ হয় এবং সে সেটা তাদেরকে ধার স্বরূপ দিতে থাকবে (কানযুল ঈমান, ৭১৪ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে কুরাইশ

সূরা কুরাইশকে সূরায়ে লিঈলা-ফি বলে। এতে ৪টি আয়াত আছে। অধিকাংশ আলেমের মতে সূরাটি মক্কী এবং যাহ্হাক ও কালবীর মতে মাদনী। কিন্তু প্রথম মতটা ঠিক। ইবনে আব্বাস বলেন, সূরাটি মক্কায় নাযেল হয়েছে। আবু তালেবের কন্যা উম্মে হা-নী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা কোরায়েশ বংশকে ৭টি ফযীলত (বৈশিষ্ট্য) দান করেছেন, যা তাদের পূর্বে আর কাকেও দান করেননি এবং তাদের পরেও আর কাউকে দান করবেন না। তা হল (১) নবুওঅত (২) খেলাফত বা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব (৩) হেজাবত বা কাবা ঘরের তত্ত্বাবধান-ভার (৪) সেকায়ত বা হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বভার (৫) হাতী আক্রমণের সময় গোদায়ী মদদ (৬) সাত কিংবা দশ বৎসরের এবাদত। কোরায়েশরা ছাড়া আর কেউ ঐ সময়ে আল্লাহ্র এবাদত করেনি। (৭) নুযুলে কোরায়েশ ছাড়া অন্য কারোর কথা উল্লেখ নেই (তারীখে বোখারী, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে মারদোঅয়হে ও হা-কেম)। ইমাম হা-কিম এই হাদীসটিকে সহী ও বিশুদ্ধ বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন, এই হাদীসটি গরীব বা অভিনব। কিন্তু যোবায়ের ইবনুল আউআম বর্ণিত হাদীসটি এর শা-হেদ ও সমর্থক। তা হল এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ কোরায়েশদেরকে ৭টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (১) তারা ১০ বৎসর আল্লাহ্র এবাদত করেছে। যখন কোরায়েশ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করেনি। (২) হাতী হামলার দিনে আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেন অথচ তখন তারা মোশরেক ছিল। (৩) তাদের শানে কোরআনের ১টি সূরা নাযেল করেছেন যাতে সারা জাহানের কেউ শরীক নেই। (৪) তাদেরকে আল্লাহ্

নবুওঅত (৫) খেলাফত (৬) সেকায়ত ও (৭) হেজাবত দান করেছেন (তাবারানী, ইবনে মারদোঅয়হে, ইবনে আসা-কির)। খাতীব বাগদাদী ইবনে মোসাইয়িব হতে মরফুভাবে তদীয় তা-রীখে বাগদাদে এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ রেওয়ায়াতটি মুরসাল।

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَّكِّيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু করছি)

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ
وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

বাংলা উচ্চারণ

১। লিঈলা-ফি কুরায়শিন। ২। ঈলা-ফিহিম রিহ্লাতাশ্ শিতা-য়ি অস্সায়ি-ফ। ৩। ফল্য়্যাবুদূ রব্বা হা-যাল বায়ি-ত। ৪। আল্লাযী আত্ আমাহুম মিন জূইন অআ-মানাহুম মিন খাও-ফ।

তরজমা

১। কোরায়েশদের অনুরাগ সৃষ্টির জন্য। ২। (আল্লাহ্ কর্তৃক) তাদেরকে শীত ও গ্রীষ্মকালে সফরের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। ৩। তাদের উচিত এই ঘরের মালিকের গোলামী করা। ৪। যিনি তাদেরকে ভুখার সময় খাবার দিয়েছেন এবং ভয়ের সময় অভয় দান করেছেন।

তফসীর

মহানবীর (সঃ) উর্ধতন ১২ পীড়িতে এক মহান ব্যক্তি ছিলেন নাযর বিন কিনানাহ্। তাঁরই বংশধরকে কোরায়েশ বলা হয়। তারা সবাই মক্কায় থাকতেন। আরবের লোকেরা যখন হজ্জে যেত তখন তারা কোরায়েশদেরকে কাবার খাদেমরূপে দেখত। ফলে কোরায়েশরা যখন তাদের কারো ঘরে যেত তখন তারা তাদের খুব সম্মান ও আদর আপ্যায়ন করতো। এটাই তাদের জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল। তারা শীতকালে য়্যামনের দিকে এবং গরমকালে সিরিয়ার দিকে সফর করতো। তারা আপোষে লড়াই করতো। কিন্তু কাবা শরীফের সম্মানার্থে কোন চোর, ডাকাত

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদের উপর হামলা করত না। সেজন্য আল্লাহ্ বলেন যে, এই কাবাঘরের বদৌলতে তোমরা রুজি পাচ্ছ এবং নিরাপদে আছ। অথচ এই মহাদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমরা এই ঘরের মালিকের এবাদত ও উপাসনা এবং কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করছ না!

ইবনে কাসীর বলেন, এই সূরাটি তার পূর্ববর্তী সূরা থেকে ভিন্ন। মোসহাফে ইমামে দুটোর মাঝখানে একটি লাইন "বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম" লেখা আছে। ইবনে ইসহাক ও ইবনে যায়দ এই বিষয়টির বিশ্লেষণ এভাবে করেছেন যে, আল্লাহ্ হাতীকে মক্কা থেকে রুকেছেন, এবং হাতীওলাদেরকে ধ্বংস করেছেন যাতে কোরায়েশরা শান্তি ও নিরাপদে নিজ শহরে সমবেতভাবে থাকতে পারে। কিংবা এর অর্থ হল য়্যামনের দিকে গ্রীষ্মকালীন সফর এবং সিরিয়ার দিকে শীতকালীন সফর। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঐসব জায়গায় যেত। তারপর তারা নিরাপদে নিজ শহরে ফিরে আসতো। কারণ, লোকেরা তাদের ইয্যত ও সম্মান করতো এবং তাদেরকে হরমবাসী মনে করতো। সুতরাং যে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো সেইই তাদের সম্মান করতো। বরং অন্য কেউ যদি তাদের সাথী হোত তাহলে সে-ও সফরকালীন নিরাপদে থাকতো। মক্কা শহরে তাদের অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি হরম শরীফকে নিরাপদ জায়গা বানিয়ে দিয়েছি। পক্ষান্তরে তার আশপাশ থেকে লোকদেরকে ছোঁ মেরে ছিনতাই করা হয়ে থাকে (সূরা আনকাবুত ৬৭ আয়াত)। এইজন্য আল্লাহ্ বলেছেন—লিয়ীলা-ফি কোরায়েশ বা কোরায়েশদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য।

ইবনে জরীর বলেন:—সঠিক কথা এই যে, লিয়ীলাফের মধ্যে "লাম" হরফটি লামে তাআজ্জুব বা আশ্চর্যব্যঞ্জক অব্যয়। সুতরাং আল্লাহ্ যেন বলেছেন যে, কোরায়েশদের অনুরাগ সৃষ্টির জন্য তোমরা আশ্চর্যান্বিত হও। কারণ, এই অনুরাগের সম্পদ কিভাবে আমি তাদেরকে দান করেছি। মুসলমানরা এ বিষয়ে সর্ববাদীসম্মত যে, দুটো সূরা (অর্থাৎ সূরায়ে কোরায়েশ ও সূরায়ে ফীল) ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র সূরা। অনুরাগের পর তাদেরকে শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার নিয়ম বাতলে দিয়েছেন এই বলে যে, তোমরা এই কাবা ঘরের এবাদত কর। এই এবাদতের অর্থ হল খালেস তওহীদ বা খাঁটি একত্ববাদ। এই এবাদতের সাথে তিনি তাদের জন্য নিরাপদ হরম এলাকা এবং পবিত্র ঘর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন: إِنَّمَا أُمِرْتُ ..... الْمُسْلِمِينَ

আমাকে এই শহরের সেই মালিকের এবাদতের হুকুম দেওয়া হয়েছে যিনি এই শহরটিকে সম্মান দান করেছেন। আর সমস্ত জিনিষ তাঁরই অধিকারে। এবং আমাকে এই আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর হুকুমবর্দার হয়ে থাকি (সূরা

নামাল ৯১ আয়াত)।

তারপর আল্লাহ্ বলেন, অনুরাগ সৃষ্টি ও কৃতজ্ঞতার পদ্ধতি শিক্ষাদানের পর আমি তাদেরকে নিরাপত্তা ও অভয় দান করেছি। অতএব তাদের উচিত যে, এক আল্লাহ্র এবাদত করা এবং তিনি ছাড়া আর কোন বুত, শরীক ও মূর্তির পূজা না করা। অতঃপর যারা আল্লাহ্র এই হুকুম তামীল করেছে তিনি তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা দান করেছেন এবং যারা তাঁর কথা মানেনি তিনি তাদের কাছ থেকে এই দুটি জিনিষ ছিনিয়ে নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন:— ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ..... ظَالِمُونَ আল্লাহ্ একটি জনপদের উদাহরণ দিয়েছেন যারা নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দে ছিল। প্রত্যেক জায়গা থেকে তাদের কাছে অঢেল রুযী চলে আসতো। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নামতের শুকরিয়া আদায় করল না। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এমন মজা চাখালেন যে, ভুক ও ভয় তাদের পোষাকে পরিণত হল। অথচ তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রসূল এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা বলে মনে করে। ফলে (আল্লাহ্র) আযাব তাদেরকে পাকড়াও করে তখন তারা যালেম ছিল (সূরা নাহ্ল ১১২-১৩ আয়াত)।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ নবী (সঃ)কে বলতে শোনেন: অইলুল লাকুম কোরায়শিন লিয়ীলা-ফি কোরায়শিন অর্থাৎ হে কোরায়েশ! তোমাদের জন্য ধ্বংস তোমাদের অনুরাগ সৃষ্টির জন্য (ইবনে আবী হাতেম)। ওসামা ইবনে যায়দের শব্দ এই—অয়হাকুম ইয়া মা'শারা কোরায়শিন উবুদু রব্বা হা-যাল বায়ে-ত—হে কোরায়েশের দল! তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা এই ঘরের মালিকের এবাদত কর (ইবনে আবী হা-তেম)। কিন্তু আসমা বিনতে ইয়াযীদের বর্ণনাটি সঠিক। ওসামা ইবনে যায়দের বর্ণনা ঠিক নয়।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, লিয়ীলাফের লাম অব্যয়টি আগের সূরার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেন একথা বলেছেন:— اهلكت اصحاب الفيل لاجل تالف قريش উহ্লিকাত আসহাবুল ফীল লিআজ্লি তাআল্লুফি কোরায়শিন অর্থাৎ কোরায়েশদের অনুরাগ সৃষ্টির নিমিত্ত হাতীওলাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ফার্রা বলেন, এই সূরাটি আগের সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা কোরায়েশদের উপর তাঁর মহা অবদান অর্থাৎ হাবশাওলাদের কথা উল্লেখ করে পুনরায় বলেন লিয়ীলা-ফি কোরায়েশ অর্থাৎ হাতীওলাদের সাথে আমি যা করেছি তা আমার একটি বিরাট অবদান এবং কোরায়েশদের উপর এটিও ১টি ন্যামত যে, তারা ব্যবসার জন্য বের হত কিন্তু কেউই তাদেরকে লুটে নিত না। কারণ, তাদেরকে সবাই আল্লাহ্র ঘরওলা মনে করতো। ইবনে কোতায়বাও এই কথা বর্ণনা করেছেন। উবাই ইবনে কাব এই সূরা এবং সূরা ফীলকে একই সূরা বলেছেন। সেজন্য তিনি এই দুই সূরার মধ্যে কোন পার্থক্য

http://islaminonesite.wordpress.com

রেখা রাখেননি এবং ফীলকে একই সূরা বলেছেন। সেজন্য তিনি এই সূরার মধ্যে কোন পার্থক্য রেখা রাখেননি এবং এদের মধ্যে বিসমিল্লাহও লেখেননি। কিন্তু প্রায় সমস্ত সাহাবী এই সূরাটিকে সূরা ফীল থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র সূরা বলে গ্রহণ করেছেন। তফসীরে কাশশা-ফে বলা হয়েছে যে, এই সূরার "লাম অব্যয়টি "ফালয়্যাবুদু" শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাশশাফের আগে খলিল ইবনে আহমাদ একথা বলেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা যদি সমস্ত অবদানের কারণে আল্লাহ্‌র এবাদত না করে অন্ততঃপক্ষে এই বিরাট অবদানের নিমিত্ত তাঁর এবাদত করুক। কাসায়ী ও আখফাশ বলেন যে, এই "লাম" তাআজ্জুব বা বিস্ময়ের অব্যয়। অর্থাৎ কোরয়েশদের অনুরাগের জন্য বিস্ময়বোধ কর। কেউ বলেছেন, এই লামটি "এলা" অর্থে বলা হয়েছে। অন্য একটি কেরাআতে লাম অব্যয়টি 'যের' নয় বরং 'যবর' দিয়ে পড়া হয়েছে। মোসহাফে ইবনে মাসউদে এইরূপ আছে। নায্‌র ইবনে খোযায়মাহ ইবনে মোদরেকাহ ইবনে ইলইয়াস ইবনে মোযার এর সন্তান সন্ততিদেরকে কোরায়েশ বলা হয়। যে ব্যক্তি নাযর এর বংশধর সেই কোরায়শী। কেউ কেউ বলেন, ফেহর ইবনে মালেক ইবনে নায্‌র এর বংশধররা কোরায়েশ। প্রথম কথাটি বেশী ঠিক।

রিহলাত এর অর্থ য়্যামন ও সিরিয়ার সফর। তারা শীতকালে য়্যামনে যেত। কারণ, এটা গরমদেশ। সুতরাং এই সফরটা গরমদেশ সফর হোত। আর গরমকালে সিরিয়ার দিকে ভ্রমণ করত। কারণ, এটা ঠাণ্ডাদেশ। সুতরাং এই সফরটা শৈত্য সফর হোত। একথাও বর্ণিত আছে যে, শীতকালে তারা মক্কার ভেতরে থাকতো গরমকালে তায়েফে যেত। কিন্তু প্রথমটাই ঠিক। তেজারতের উদ্দেশ্যে কোরায়েশদের সফর জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। ইবনে কোতায়বাহ বলেন, কোরায়েশদের জীবন তেজারতের উপর ছিল। তারা প্রতি বছর দুবার সফর করতো। একবার শীতপ্রধান দেশে এবং দ্বিতীয়বার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। যদি তাদের এই অবস্থা না হোত তাহলে তারা মক্কায় অবস্থান করতে পারতো না। আর যদি নিরাপত্তা না থাকতো তাহলে আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজের হেফাযতে রাখতেন না। সর্বপ্রথম যিনি এই সফরের প্রচলন করেন তিনি হলেন হাশেম ইবনে আব্দ মানাফ। তারা মূর্তিপূজারী হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা এই কাবা ঘরের দরুণ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর অন্য আর কারো নয়। কিংবা এই ঘরের কারণে তারা সমস্ত আরবদের উপর প্রাধান্য লাভ করতো। সেজন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাঁর এই অবদানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এতআম এর অর্থ এও হতে পারে যে, যখন তারা নবী (সঃ)-কে মিথ্যা মনে করে তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর বদদোআ করেন। ফলে ইউসুফ (আঃ) এর যুগের মত সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন তারা নবীজীকে বলে যে, আপনি দোআ করুন, আমরা ঈমান এনেছি। নবী (সঃ) দোআ করলেন।

ফলে আল্লাহ্‌ তাদের দুর্ভিক্ষ দূর করে দিলেন। তারা খাদ্য পেল, তাদের খিদে মিটল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতআম এর ভাবার্থ হযরত ইবরাহীমের এই দোআ :— وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ হে পরওয়ার দেগার! এই শহরবাসীকে ফলমূল থেকে রিয্‌ক দান কর (সূরা বাকারাহ ১২৬ আয়াত)। তারপর আল্লাহ্‌ বলেন, যে মহাভয়ের মধ্যে তারা ছিল তাথেকে তিনি তাদেরকে অভয় দান করেছেন। ইবনে যায়দ বলেন, কতিপয় আরব কতিপয় আরবকে লুটে নিত এবং কয়েদ করতো। কিন্তু আল্লাহ্‌ হরম শরীফের বদৌলতে কোরায়েশদেরকে নিরাপদে রেখেছিলেন। যাহহাক, রবীঅ, শরীক ও সুফ্‌য়ান প্রমুখ বলেন যে, হাবশা ও হাতীর ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেন। ইবনে আব্বাস বলেন কুষ্ঠব্যাধি থেকে। কেউ বলেন, এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর এই উক্তির ফল :—— رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে নিরাপদ স্থলে পরিণত করিও (সূরা বাকারাহ ১২৬ আয়াত)।

ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌ তাদেরকে সফর করতে নিষেধ করেননি। তিনি তাদেরকে এই হুকুম দিয়েছিলেন যে, তোমরা এই ঘরের রক্বের ইবাদত কর। এটাই আল্লাহ্‌র এক ন্যামত ছিল তাদের উপরে। কোরায়েশদের ফযীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন সাধারণ জনগণ ভাল ও মন্দের ব্যাপারে কোরায়েশদের অনুসারী এবং এই জিনিষ অর্থাৎ খেলাফত সর্বদা তাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ দুজন লোকও বেঁচে থাকবে। এই হাদীসগুলো দাওয়া-ঈনে ইসলামে মওজুদ আছে। অলিল্লা-হিল হাম্‌দ অলমিন্নাহ।

সংযোজন

এই সূরাতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ এবং ৭৩টি হরফ আছে। এতে কোরায়েশদের বর্ণনা আছে বলে সূরাটির নাম কোরায়েশ রাখা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বংশের উর্ধতন ১৩নং পুরুষ হলেন নায্‌র ইবনে কিনা-নাহ নামক এক মহান ব্যক্তি। তাঁরই বংশধরকে কোরায়েশ বলা হয়। কোরায়েশ শব্দের আভিধানিক অর্থ সেই সামুদ্রিক জন্তু যা অন্যান্য সব জানোয়ারকে ধরে খেয়ে ফেলে এবং সবার উপরে আধিপত্য বিস্তার করে। নাযার ইবনে কিনানার বংশধরগণ কালক্রমে বিভিন্ন জায়গায় ছত্রভঙ্গ হোয়ে পড়ে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উর্ধতন ৫ম পিতামহ কোসাই তাদের সবাইকে এখান থেকে ওখান থেকে ডেকে এনে মক্কা শহরে একত্রিত করতঃ অন্যান্য গোত্রসমূহের উপরে প্রভাব বিস্তার করেন। ফলে উপরোক্ত সামুদ্রিক জন্তুর গুনানুসারে এঁদের নাম কোরায়েশ হয়ে পড়ে। (ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা)।

http://islaminonesite.wordpress.com

সূরাটির বৈশিষ্ট্য

আবুল হাসান কাযবীনী থেকে মওকুফভাবে বর্ণিত আছে, যদি কেউ তার দুশমন বা অন্য কারও থেকে ভয় পায় তাহলে সূরায়ে কোরায়েশ পড়লে সবরকম অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। আল্লামা জাযারী "হিসনে হাসীন" গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, এটা পরীক্ষিত। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী বলেন, আমার ওস্তাদ শাহ অলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) সবরকম বিপদ আপদ থেকে মুক্তির জন্য এই সূরাটি পড়তে আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এটা পরীক্ষিত। আমিও এ ব্যাপারে বহুবার পরীক্ষা করেছি এবং ফল পেয়েছি (তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে ফীল

সমস্ত তফসীরকারদের মতে এই সূরাতে ৫টি আয়াত আছে। ইবনে আব্বাসও তা-ই বলেন।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

বাংলা উচ্চারণ

১। আলাম্ তারা কাইফা ফাআলা রব্বুকা বিআস্‌হা-বিল ফীল। ২। আলাম্ ইয়াজ্‌আল্ কাইদাহুম্ ফী তাদ্‌লীল। ৩। অআরসালা আলাইহিম্ তাইরান্ আবাবীল। ৪। তারমীহিম বিহিজা-রতিম মিন সিজ্জীল। ৫। ফাজাআলাহুম কাআস্‌ফিম মা-কুল।

তরজমা

১। তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু হাতীওলাদের সাথে কী করেছিলেন? ২। তিনি কি তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেননি? ৩। তিনি তাদের ধ্বংস করার জন্য ঝাঁক ঝাঁক পাখী পাঠিয়েছিলেন। ৪। যারা তাদের উপর পাথরকুচির কাঁকর ফেলতে থাকে। ৫। ফলে তিনি তাদেরকে চিবিয়ে খাওয়া ভূসির মত গুঁড়ো করে

দেন।

তফসীর

য়্যামন দেশে এক যুগ ধরে হাবশীদের আধিপত্য ছিল। তারা দেখে যে, আরবের লোকেরা কাবার হজ্জ করে। ফলে তাদের মনে এই ইচ্ছা জাগে, যে, সবাই যেন তাদের নিকটে আসে। সেজন্য তারা য়্যামনে কাবার মত একটা ঘর তৈরী করে। কিন্তু কেউই সেখানে না আসায় তারা কাবার ঘর ভাঙতে যায় এবং বহু হাতী সঙ্গে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে বহু আরব তাদের বাধা দেয়। কিন্তু সবাইকে তারা শেষ করে দেয়। পরিশেষে যখন তারা হরম শরীফের সীমার মধ্যে পৌঁছয় তখন আসমান থেকে ঝাঁক ঝাঁক ছোট ছোট সবুজ পাখী দুটো পায়ে ২টি ও ঠোঁটে ১টি, মোট ৩টি কোরে কাঁকর বন্দুকের গুলির মত তাদের উপর মারতে থাকে। যখন কোন কাঁকর কোন উটের পিঠের উপর পড়তো তখন তা তার পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত। এভাবে সব সৈন্যই ধ্বংস হয়ে যায়। কেউই বাঁচেনি। ঐ বছরেরই শেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) পয়দা হন।

ইবনে কাসীর বলেন: এটা আল্লাহ্‌র একটি এহসান যা তিনি কোরায়েশদের উপর করেছিলেন হাতীওলাদেরকে ধ্বংস করে। ঘটনাটি এই:—হিময়্যার গোত্রের এক মোশরেক বাদশার নাম ছিল যু-নাওয়াস। যিনি খৃষ্টান মতাবলম্বী "আসহা-বে উখদূদ (সূরা বুরূজে বর্ণিত গর্ত্তওলাদের)-কে হত্যা করেছিলেন। যারা সংখ্যায় ২০ হাযার ছিল। তারা সবাই মারা যায়, কিন্তু যু-সালাবান দওস নামক এক ব্যক্তি বেঁচে যায়। অতঃপর তিনি সিরিয়া দেশের কাইজারের নিকট ফরয়্যাদ পেশ করেন যিনি খৃষ্টান ছিলেন। তিনি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট তার জন্য সুপারিশ নামা লিখে দেন। কারণ, তিনি দওসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ফলে তিনি দওসের সাথে দুজন আমীরকে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের এক জনের নাম এরবাত এবং অন্যজনের নাম আবরাহাহ ইবনুস সাবা-হ আবু য়্যাকসুম ছিল। তারা বিরাট বাহিনী নিয়ে য়্যামনে আসে এবং ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। অতঃপর তারা দেশটিকে হিময়্যারদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। যু-নাওয়াস দরিয়ায় ডুবে মারা যায় এবং য়্যামন হাবশীদের অধীনে চলে যায়। এরপরে ঐ দুজন আমীর এখানে শাসক নিযুক্ত হন। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং পরে যুদ্ধও হয়। যুদ্ধে এরবাত হেরে যায় এবং নিহতও হয়। এতে নাজ্জাশী ক্ষুব্ধ হয় এবং আব্‌রাহাকে খুব তিরস্কার করে। সেই সঙ্গে তিনি তাকে এই বলে হুমকিও দেন যে, আমি শপথ করেছি—তোমার দেশকে পয়মাল করে দেব এবং তোমার সামনের চুল কেটে নেব। তখন আবরাহা বহু তোহফা ও উপঢৌকন দিয়ে একজন দূতকে তাঁর দরবারে পাঠান। তার সাথে তিনি একটি মোজাতে য়্যামনের মাটি মাখিয়ে দিয়ে এবং নিজের সামনের চুল কেটে দিয়ে খুব অনুনয় বিনয় সহকারে একটি

http://islaminonesite.wordpress.com

পত্রে এই লেখেন যে, হুযুর! এই মোজাটাকে পয়মাল করে নিজের শপথ পুরা করবেন আর এই আমার মাথার চুল হাযির, যা হুযুরের খেদমতে পাঠালাম। দূত যখন ঐসব নিয়ে পৌঁছায় তখন বাদশাহ খুব খুশী হন এবং আবরাহাকে তার পদে বহাল রাখেন। অতঃপর আবরাহা নাজ্জাশীর নিকট দরখাস্ত করেন যে, আমি য়্যামনে একটা তুলনাহীন গির্জ্জা বানাতে চাই। তারপর তিনি সানআ শহরে একটা খুব উঁচু, চওড়া দালানওলা সুসজ্জিত ও কারুকার্য খচিত গির্জ্জা তৈরী করেন। আরবের লোকেরা তার উচ্চতার জন্য তার নাম দেয় কোলায়ীস। যে কেউ তার দিকে চেয়ে দেখত তার মাথার টুপি পড়ে যাবার উপক্রম হোত। ঘরটি তৈরীর পর আবরাহা চাইলেন যে, আরবরা যেমন কাবার হজ্জ করে তেমনি তারা কাবার বদলে এই গির্জায় হজ্জ করুক। অতঃপর তিনি সারা দেশে ঐ ঘোষণা করে দিলেন। আরবের আদনান, কাহতান বংশ এতে নারাজ হয় এবং কোরায়েশরাও এতে খুব রুষ্ট হয়। এই রাগের বশে কিছু কোরায়েশ ঐ কোলায়ীসে গিয়ে পায়খানা করে আসে। গির্জার খাদেমরা যখন এইসব দেখা পায় তখন তারা আবরাহাকে খবর দেয়। সব বিষয় জানার পর আবরাহা কসম খায় যে, আমি মক্কায় গিয়ে একটি একটি কোরে পাথর উপড়ে ফেলে কাবাকে বীরান করে দেবো। মোকাতেল ইবনে সোলায়মান বলেন, কতিপয় কোরায়েশ যুবক সেখানে গিয়ে গির্জাটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেদিনে ঝড়ো হাওয়া বইতে ছিল। গির্জাটি জ্বলে পুড়ে যমীনে পড়ে যায়। তখন আবরাহা প্রস্তুত হন এবং একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে পাড়ি দেন। সঙ্গে তিনি একটি খুব লম্বা চওড়া ও এমন মস্ত বড় হাতী নিলেন যার মত হাতী কেউ দেখেনি। হাতীটির নাম মাহ্মুদ ছিল। হাতীটিকে হাবশার বাদশাহ পাঠিয়েছিল। কথিত আছে যে, ঐ হাতীটির সাথে আরো ৮টা কিংবা ১২টা হাতী ছিল—আল্লাহো আলাম। এসবের উদ্দেশ্য ছিল কাবাকে ধ্বংস করা। ঘরটিকে ভাঙবার প্লান এভাবে হয়েছিল যে, কাবা ঘরের দেওয়ালগুলোতে জিঞ্জির বেঁধে ঐ জিঞ্জিরগুলোকে হাতীগুলোর গলায় বেঁধে দেওয়া হবে এবং তারপর হাতীগুলোকে হাঁকিয়ে দিলে কাবার দেওয়ালগুলো একেবারেই পড়ে যাবে। আরবরা যখন কাবা ধ্বংসের কথা শুনলো তখন তারা দুঃখিত হল এবং মনে মনে ভাবলো যে, আমাদের উচিত ধ্বংসের হাত থেকে কাবাকে বাঁচানো। সুতরাং যু-নাফার নামে য়্যামনের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তার কওমকে আবরাহার বিরুদ্ধে জেহাদ করবার জন্য ডাক দিল। তারাও সবাই তার ডাকে মোকাবেলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটা সংঘর্ষ হল। যু-নাফার হেরে গেল এবং গ্রেফতার হল। আবরাহা তাকে সঙ্গে নিলেন এবং আগে বাড়লেন। যখন তিনি খাস্আমে পৌঁছলেন তখন নোফায়েল ইবনে হাবীব তাঁর সামনে এল এবং মোকাবেলা করতে লাগল। আবরাহা একেও হারিয়ে দিলেন এবং বন্দী করলেন। একে তিনি হত্যা করতে চাইলেও পরে ক্ষমা করে দেন এবং হেজাযের পথ দেখাবার জন্য

সঙ্গে নিয়ে নেন। অতঃপর যখন তারা তায়েফে পৌঁছুল তখন সেখানকার লোকেরা তায়েফে "লাত" ঠাকুরের কাছে গিয়ে জমায়েত হল। আবরাহা তাদের সম্মান করলেন এবং রেগালকে সঙ্গে নিলেন। তারপর তারা মক্কার নিকটবর্তী মোগাম্মাস নামক জায়গায় তাঁবু গাড়লো। অতঃপর সৈন্যরা মক্কাবাসীদের উট ও অন্যান্য জিনিষ লুটপাট করতে লাগলো। একবার তাদের চোরাই মালের মধ্যে আবদুল মোত্তালেবের ২০০ উট ছিল। যে ব্যক্তি এই উটগুলো চুরি করে সে হল আবরাহার এক আমীর। তার নাম আসওয়াদ ইবনে মাকসুদ। তারপর আবরাহা হিময়্যারের একজনকে মক্কার দিকে পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে, কোরায়েশদের যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ডেকে আনো। আর তাকে বলে দিও যে, বাদশাহ তোমাদের সাথে লড়তে আসেননি। তবে তোমরা যদি তাকে কাবা ভাঙতে বাধা দাও তাহলে কথা আলাদা। লোকটি মক্কায় ঢুকলে লোকেরা তাকে হাশেমের পুত্র আব্দুল মোত্তালেবের সন্ধান দিল। সে গিয়ে আবদুল মোত্তালেবকে আবরাহার পয়গাম পৌঁছে দিল। আবদুল মোত্তালেব বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরাও লড়তে চাই না, আমাদের মধ্যে লড়ার শক্তি নেই। এটা আল্লাহ্র ঘর এবং তার বন্ধু ইবরাহীম খলীলের ঘর। অতএব আল্লাহ্ যদি তাকে বাধা দেন তা তিনি করতে পারেন। আর যদি তিনি তাকে একাজ করতে দেন তাহলে আমাদের বলার ও করার কিছু নেই। আবরাহার প্রতিনিধিটি বললো যে, তাহলে আপনি আমার সাথে বাদশার কাছে চলুন।

অতঃপর তিনি যখন আবরাহার কাছে পৌঁছুলেন তখন আবরাহা তার সম্মান করলেন এবং সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁর সাথে বিছানায় বসলেন। তারপর দোভাষীর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, ২০০ উট আমার, যা বাদশাহ নিয়ে নিয়েছেন তা আমাকে ফেরত দেওয়া হোক। একথা শুনে আবরাহা বললেন, আমি তোমাকে দেখে খুশী হয়েছিলাম কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে তোমার প্রতি হীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লাম। তুমি ২০০ উটের জন্য আমার সাথে কথা বলছ এবং সেই ঘর, যা তোমাদের ও তোমাদের বাপদাদদের ধর্মস্থান, তাকে ছেড়ে দিচ্ছ? আমি তো এই ঘর ভাঙতে এসেছি। তুমি আমার সাথে কথা বল না! আবদুল মোত্তালেব বললেন, আমি তো স্রেফ উটগুলোর মালিক। থাকলো ঘর, তার মালিক অন্যজন। তিনি নিজের ঘর নিজেই বাঁচাবেন। আবরাহা বললেন, সে আমাকে রুকতে পারবে না। তিনি বললেন, তা আমি জানি না, সে তুমি জান এবং তোমার কাজ জানে। কেউ কেউ বলে যে, আবদুল মোত্তালেবের সাথে আরবদের একদল কুলিনব্যক্তিও গিয়েছিল। তারা আবরাহাকে তাহামার এক তৃতীয়াংশ মাল দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, তুমি ফিরে যাও, কাবাঘর ভেঙো না। কিন্তু তিনি তা শোনেনি। তিনি আবদুল মোত্তালেবের উট ফিরিয়ে দেন। আবদুল মোত্তালেব কোরায়েশদের নিকট ফিরে এসে বললেন, তোমরা মক্কা ছেড়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

পাহাড়ে আশ্রয় নাও। তারপর তিনি কতিপয় কোরায়েশকে নিয়ে কাবার দরজা ধরে আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করলেন এবং আবরাহার বিরুদ্ধে আল্লার মদদ চাইলেন এই বলে :— لا هم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك

ইবনে ইসহাক বলেন, তারপর আবদুল মোত্তালেব কাবার দরজা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যান। মোকাতেল ইবনে সোলায়মান বলেন যে, একশো উটনি কাবার নিকটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সবের গলায় কোরবানীর 'কালা-দাহ' (হার) ঝোলান ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি আবরাহার সৈন্যরা অন্যায়ভাবে ওগুলোকে নেয় তাহলে আল্লাহ্ হয়তো তার বদলা নিয়ে নিতে পারেন। যখন সকাল হল তখন আবরাহা মক্কার জন্য তৈরী হলেন এবং মাহমুদ হাতীটিকে রেডী করে লস্করদের তৈরী হতে বললেন। হাতীর মুখ যখন তারা কাবার দিকে করল তখন নোফায়েল ইবনে হাবীব হাতীর পাশে দাঁড়িয়ে মাহমুদের কান ধরে বললো, হে মাহমুদ! বসে যাও এবং যেখান থেকে এসেছ সেখানে সোজা চলে যাও। কারণ, তুমি আল্লাহ্‌র সম্মানীয় শহরে রয়েছ। তারপর সে তার কান ছেড়ে দেয়। হাতীটি বসে পড়লো এবং নোফায়েল সেখান থেকে দৌড়ে একটি পাহাড়ের ওপরে উঠে গেল। সৈন্যরা হাতীটিকে খুবই মারধোর করে, কিন্তু সে ওঠেই না। তারপর তারা একটি ডাণ্ডা দিয়ে তার মাথায় মারে এবং একটি আঁকসি তার গলায় লাগিয়ে দিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে ওঠাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই সে ওঠে না। এরপর তার মুখ য়্যামনের দিকে করা হল। তখন সে উঠে জলদি জলদি পা ফেলতে লাগলো। তারপর সিরিয়ার দিকে মুখ করা হল। এবারও সে তা-ই করল। অতঃপর তার মুখ পূর্ব দিকে করা হল। তবুও সে চলতে থাকলো। কিন্তু আবার যখন তার মুখ মক্কার দিকে করা হল তখন সে বসে পড়লো। এবার আল্লাহ্ তাআলা দরিয়ার দিক থেকে টুনটুনি পাখীর মত খুব ছোট্ট ছোট্ট পাখী পাঠালেন। প্রত্যেক পাখীর সাথে তিনটে কাঁকর ছিল। একটা ঠোঁটে এবং দুটো দু পায়ে। কাঁকরগুলো শস্যদানা ও মুসুরির ডালের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল। যারই উপরে ঐ কাঁকর পড়ে সে-ই মারা যায়। সবাইকে কাঁকর লাগবার আগে কিছু লোক রাস্তায় পালিয়ে যায় এবং নোফায়েলকে রাস্তা জিজ্ঞেস করতে থাকে। নোফায়েল তখন কোরায়েশদের সাথে পাহাড়ের চূড়ায় ছিল এবং হেজাযের আরবদের সাথে তামাশা দেখছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা হাতীওলাদের সাথে কিরূপ বদলা নিচ্ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি মনের আনন্দে এই শের গাচ্ছিলেন : اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب

ইবনে ইসহাক বলেন, আবরাহা দুটো হাতী এনেছিলেন তন্মধ্যে মাহমুদ তো বসে পড়ে এবং দ্বিতীয়টি বাহাদুরী দেখায়। ফলে সে কাঁকর দ্বারা হালাক হয়। আতা ইবনে য়্যাসার প্রমুখ বলেন, সে সময় সবাই আযাবে পড়েনি। বরং কিছু লোক তখনই ধ্বংস হয় এবং কতিপয়ের কোন কোন অঙ্গ খসে খসে পড়তে থাকে ফলে তারা পালাতে থাকে। আবরাহা তাদের মধ্যে ছিলেন যাদের অঙ্গ

খসে পড়তে থাকে। পরিশেষে খাসআম নামক জায়গায় গিয়ে তিনি মারা পড়েন। ইবনে ইসহাক বলেন, আবরাহার অঙ্গ খসতে খসতে যখন তিনি সানআয় পৌঁছন তখন তার চুল ও লোমগুলো খসে গিয়ে তিনি একটি পাখীর বাচ্চার মত হয়ে যান। তারপর তার কলিজা ফেটে যায় এবং তিনি মারা যান। মোকাতেল ইবনে সোলায়মান বলেন, কোরায়েশরা তার অনেক মাল ছিনিয়ে নেয়। আবদুল মোত্তালেব সেদিন একটি পাত্র ভর্তি সোনা পান। ইয়াকুব ইবনে ওতবাহ বলেন, ঐ বছরেই আরবে বসন্তরোগ দেখা দেয় এবং হারমল ও হানযাল (মাকাল) গাছ পরিলক্ষিত হয়।

ইবনে হেশাম বলেন, আবাবীল এর অর্থ ঝাঁক। আরবরা ওর একবচন বলেনি। আরবদের নিকটে শক্ত ও নিরেট জিনিষকে সিজ্জীল বলে। এ কথা ইউনুস নাহ্‌বী ও আবু ওবায়দাও বলেন। কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ দুটি শব্দ ফারসী। আরবরা একে একটি শব্দ করে নিয়েছে। অর্থাৎ আসল হল সাঙ্গ ও গিল। সাঙ্গ এর অর্থ পাথর এবং গিল এর মানে মাটি। ঐ কাঁকরটা এই দুই জাতীয় ছিল—অর্থাৎ পাথর ও মাটির। 'আস্‌ফ' এর অর্থ এক প্রকার গাছের পাতা যা কাটা হয়নি। এর এক বচন আস্‌ফাতুন।

ইবনে আব্বাস ও যাহহাক বলেন, আবাবীল সেই পাখী যারা একে অপরের পেছনে পেছনে থাকে। হাসান বাসরী ও কাতাদাহ বলেন, আবাবীল এর অর্থ অনেক। মোজাহেদ বলেন, আবাবীল বলে পরস্পর লাইন দেওয়া দলকে। কোন নাহ্‌বী বলেন যে, আবাবীল এর এক বচন আবীল। একরেমা বলেন, ওগুলো সবুজ পাখী ছিল, যা দরিয়া হতে এসেছিল। ওদের মাথাগুলো জন্তুদের মাথার মত ছিল। ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন, কালো পাখী ছিল, যাদের পায়ে ও ঠোঁটে কাঁকর ছিল। এই সমস্ত সূত্রগুলো বিশুদ্ধ।

ইবনে আব্বাস বলেন, সিজ্জীল এর অর্থ পাথরী মাটি। সাঈদ ইবনে জোবায়র বলেন, 'আস্‌ফ মাকুল' এর অর্থ কাঁচা ঘাস ও ভুসি। অন্য শব্দে গমের ভুসি। ইবনে আব্বাস বলেন, আস্‌ফ দানার খোসাকে বলে, যেমন গমের ভুসি। ইবনে যায়দ বলেন, আস্‌ফ গাছের পাতা ও পিয়াজের কলি যখন জানোয়াররা তা খেয়ে চিবিয়ে ফেলে দেয়। ভাবার্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেন এবং কোরআনী-প্রবাদ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ অনুযায়ী তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাদেরই ঘাড়ে পড়ে। হযরত আয়েশা বলেন, আমি কায়েদ ও সায়েস হাতীকে মক্কায় দেখেছি। দুজনই অন্ধ ও অকেজো ছিল এবং মানুষের কাছে রুটী চেয়ে বেড়াত (ইবনে ইসহাক ও অকেদী)। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র বলেন, হাতীর মাহুতের নাম আনীস ছিল। হাফেয আবু নোআয়ীম দালায়েলুন্ নুবুওঅত নামক গ্রন্থে উসমান ইবনে মুগীরাহ থেকে হাতীওলাদের ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একথা উল্লেখ করেননি যে, আবরাহা য়্যামন

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে মক্কায় এসেছিলেন কি না। বরং ঐ লস্করদের সেনাপতি শামস্ ইবনে মাকসুদ ছিল এবং সমস্ত লস্কর ২০ হাযার ছিল। পাখীগুলো রাত্রে তাদের উপর হামলা করে এবং সকালে সৈন্যগুলো পড়ে থাকে। কিন্তু এই বর্ণনাটা অতি অভিনব। প্রকৃত কথা এই যে, আবরাহা আশরাম নিজে স্বয়ং এসেছিলেন। উপরিল্লিখিত বর্ণনাবলী এবং বহু কবিতা এর প্রমাণ। নবী (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাক মক্কা থেকে হাতীকে রুকেছিলেন এবং আজকে তাঁর রসূল ও মোমেনদেরকে তার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আজকের দিনে তার সম্মান সেইভাবেই ফিরে এল যেমন সেদিন ছিল। এখন উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিতদেরকে এই সংবাদ দিয়ে দিক (বোখারী, মুসলিম)।

ফতহুল বায়া-নে বলা হয়েছে যে, এখানে 'আলাম তারা'-র অর্থ দিলের দেখা অর্থাৎ জানা বা অবগত হওয়া। ফার্‌রা বলেন, তুমি কি এই খবর শোননি? যাজ্জাজ বলেন, তুমি কি জান না? এটা রসূলুল্লাহ্‌র জন্য বিস্ময়বোধক, আল্লাহ্‌র কীর্তির দিক থেকে যে, আমি হাতীওলাদের সাথে কী ব্যবহার করেছি যারা কাবার ঘর ভাঙতে এসেছিল? এখানে সম্বোধন নবী (সঃ)-কে করা হয়েছে কিংবা প্রত্যেক নেক বান্দাকে। অর্থাৎ হে মোহাম্মাদ! (সঃ) কিংবা সেইসব লোক যারা তাঁর যুগে মওজুদ ছিলেন এবং যারা তাদের পরে আসবে। তাদের বহুলোকের মুখে তারা হাতীওলাদের কথা শুনছে এবং জানছে তথাপি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনছে না কেন?

হাতীওলা হল য়্যামনের বাদশাহ আবরাহা যার আসল নাম আশরম। কারণ, তার বাপ তাকে অস্ত্র দিয়ে মেরেছিল। তার নাকে ও কপালে চোটের দাগ ছিল—তীবী একথা বলেন। প্রত্যেক সাদা চেহারার উপাধী হল আবরাহা। তিনি খৃষ্টান ছিলেন। তার সাথে মোট ১৩টা হাতী ছিল। ইবনে আব্বাস বলেন, হাতীওলারা এসে সাফাহ্‌তে নামলে আবদুল মোত্তালেব তাদেরকে গিয়ে বলেন যে, এটা আল্লাহ্‌র ঘর। এর ওপরে কারোর আধিপত্য চলবে না। তারা বললো, আমরা যতক্ষণ এটাকে না ভাঙবো ততক্ষণ আমরা কেউই যাব না। তারা হাতীকে যতই আগে বাড়ায় সে ততই পিছু হটে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তায়রে আবাবীলকে ডাকেন এবং কালোমাটি লাগান কাঁকর দিয়ে তাদেরকে পাঠান। তারা এসে হাতীওলাদের ওপর কাঁকর মারতে থাকে। তাতে কেউই বাদ যায়নি। সবারই গায়ে চুলকানি হয়। তারপর যে কেউ নিজের গা চুলকাতো তার গায়ের গোশ্‌ত গলে পড়ে যেত (ইবনুল মুনযির, আবদুবনো হোমায়দ, আবুনোআয়ীম ও বায়হাকী।

তায়র ইসমে জিন্‌স। আবাবীলের অর্থ ঝাঁক ঝাঁক, যেমন উটের সারি। সৈন্যরা পালিয়ে যায় এবং হরম শরীফে আগেই তারা আরাফাতের কাছাকাছি হালাক হয়। এই মতটাই সবচেয়ে সঠিক। একদল বলেন যে, মিনা ও মোযদালিফার মাঝখানে মুহাস্‌সির উপত্যকায় তারা ধ্বংস হয়—ইবনে হাজার একথা বলেছেন। সায়ীদ

ইবনে জোবায়র বলেন যে, ওটা আসমানী পাখী ছিল। এই ঘটনার আগে তাদের দেখা যায়নি এবং পরেও আর তাদের দেখা যায়নি। কেউ বলেন যে, ওটা পাশ্চাত্যের "আনকা" পাখী ছিল। যাকে প্রবাদে বলা হয়। কিন্তু আরবরা আবাবীল শব্দটি পাখীর বেলায় যেমন ব্যবহার করে তেমনি পাখী ছাড়া অন্যের ব্যাপারেও ঐ শব্দটি তারা ব্যবহার করে। যাজ্জাজ বলেন, সিজ্জীল শব্দটি "সাজাল" থেকে উৎপন্ন। সেজন্য এর অর্থ সেই আযাব যা তাদের জন্য রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছিল। সোহা-হ্‌তে বলা হয়েছে যে, এটা একটা মাটির কাঁকর যা জাহান্নামের আগুনে পোক্তা করা হয়েছিল এবং তার ওপরে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। ইবনে য়ুবায়ী বলেন, এটা সেই পাথর যা কওমে লুতের উপর বর্ষণ করা হয়েছিল। কিংবা এটা সিজ্জীন এর পাথরকুচি যা জাহান্নাম থেকে এসেছিল। যাকেই সে কাঁকর লাগে তার গায়ে গুটি বের হয় এবং সমস্ত শরীরে ফোসা পড়ে যায়। দানাগুলো মুসুরির ডালের চেয়ে বড় ছোলার মত ছিল। ইবনে আব্বাস বলেন, বন্দুকের মত ফায়ারিং ছিল। পাখীগুলো আসমান থেকে এসে লস্করদের ঘিরে নেয় এবং কাঁকরের ফায়ারিং করতে থাকে। ফলে সমস্ত হাতীওলারা সেই তুসের মত হয়ে যায় সেগুলোকে জন্তুরা চিবিয়ে ফেলে দেয়। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী (সঃ)-এর জন্ম "আমুল ফীল বা হাতীর বছরে হয়েছে। কুরতুবী বলেন যে, এই ঘটনা নবীজীর জন্মের ৫০ দিন আগে সংঘটিত হয়েছে। খা-যেন বলেন যে, এই উক্তিটি বেশী সঠিক। এই হাতীর বছরকে হযরতের জন্ম সন বলা হয়। কায়েস ইবনে মাহ্‌রাম বলেন, আমি ও নবী (সঃ) দুজনই হাতীর বছরে পয়দা হয়েছি। কেউ কেউ বলেন যে, হাতীর বছর হযরত মুহাম্মাদের চেয়ে ৪০ বছর আগে এবং কেউ বলেন ২৩ বছর আগে।

সংযোজন

সূরা ফীলে ৫টি আয়াত, ২৩টি শব্দ ও ৯৯টি বর্ণ আছে। হাতীকে আরবীতে ফীল বলে। হাতী দ্বারা কাবা আক্রমণকারী আবরাহা বাদশার ঘটনা এই সূরাতে বর্ণিত হয়েছে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে সূরায়ে ফীল।

এই সূরাটি আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণাঙ্গ কুদরতের (শক্তির) একটি প্রমাণ। যা একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলার ছোট্ট ছোট্ট শাস্তিকে হাতীর মত বড় বড় জানোয়ারও যখন সহ্য করতে পারেনি তখন তাঁর বড় বড় আযাবগুলোকে সহ্য করতে কে পারবে? সূরাটি একথাও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র ঘরের অসম্মান করার শাস্তি যদি ঐরূপ হয় তাহলে তাঁর মনোনীত ধর্ম এবং তাঁর রসূলের অবমাননা করার শাস্তি কিরূপ হতে পারে! এই ঘটনাটি নবী (সঃ) এর জন্মের খুব নিকটবর্তী সময়ে হয়েছিল। সেজন্য এটি তাঁর নবুত্বপ্রাপ্তিরও একটি আলামত ও নিদর্শন (ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৭১ পৃষ্ঠা)।

http://islaminonesite.wordpress.com

মোহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, আবরাহা যখন কাবার উপরে হামলা করে তখন কাবার মোতাওয়াল্লী আবদুল মোত্তালেব আবরাহার ছাউনী থেকে ফিরে এসে সাধারণ কোরায়েশদের পাহাড়ে চলে যেতে বলেন এবং নিজে কতিপয় কোরায়েশ-সরদারকে সঙ্গে নিয়ে কাবা শরিফের দরজা ধরে আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘরকে বাঁচান এবং ওর খাদেমদের হেফাযতে রাখেন। ঐ সময়ে কাবার মধ্যে ৩৬০টি দেবতাও ছিল। তথাপি তারা ঐ সংকটময় মুহূর্তে ঐসব কৃত্রিম দেবতাদের ভুলে যায় এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌রই কাছে কাঁদা-কাটায় রত হয়। তাদের ঐ দোআ সংক্রান্ত যেসব বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায় তাতে কেবল তওহীদেরই পরিচয় পাওয়া যায়, শেরকের নামগন্ধ মোটেই নেই। যেমন ইবনে জরীর বর্ণনা করেন:—

এই ঘটনাটি কোরায়েশদের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, এর পর থেকে মোশরেক কোরায়েশরা ১০টি কিংবা ৭টি বছর দেবদেবীর পূজা না করে কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতে থাকে। অতঃপর ঘটনাটির প্রভাব কমে আসার সাথে সাথে তারা আবার মোশরেকে পরিণত হতে থাকে। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) নবী হবার পর মক্কার লোকেরা যখন তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে তখন এই সূরাটি নাযেল কোরে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ঐ ঘটনা এবং ওর পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চান যে, কাবার দুশমনদের যেমন তিনি ধ্বংস করেছেন তেমনি তাঁর মনোনীত ধর্মের যারা বিরোধিতা করবে তাদেরকেও তিনি সমূলে উৎপাটন করতে পারেন। অতএব বিরোধিরা সাবধান হও এবং রসূলের বিরোধিতা থেকে বিরত হও (রূহুল মাআনী, কবীর প্রভৃতি)।

কেউ কেউ বলেন, আবরাহা নাকি আবিসিনিয়ার বাদশাহ সেই নাজ্জাশীর পিতামহ ছিলেন যিনি রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) যুগে ছিলেন (তফসীরে আবুস সউদ, আমপারা ৫২৯ পৃষ্ঠা)।

কাবা আক্রমণের উক্ত ঘটনাটি ৫৭০ কিংবা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে ঘটেছিল। এই ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যার গুরুত্ব আরবদের কাছে এত বেশী ছিল যে, আরবরা ঐ সালটির নাম আ-মুল ফীল বা হস্তীসন রেখে দেয়। অতঃপর ওর পর থেকে তারা তাদের বইপুস্তকে এবং অফিস-আদালতে হস্তীসন অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করতে থাকে (আযরাকীর তা-রীখে মক্কা, ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

এই ঘটনার কিছু আগেপরে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্ম হয়। তাঁর জন্ম কত আগে বা পরে হয় সে সম্পর্কে বহু উক্তি পাওয়া যায়। যেমন কারো মতে ১০ বছর আগে অন্য মতে ১৫ বছর আগে কিংবা ২৩ বছর, অথবা ৩০ বছর, নতুবা ২০ বছর কিংবা ৭০ বছর আগে। অধিকাংশের মতে ঐ বছরেই নবী (সঃ) এর জন্ম হয়। ঐ বছরে কখন হয়? সে ব্যাপারেও কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন ইবনে আব্বাস বলেন, হাতী আক্রমণের দিনেই নবী (সঃ)

পয়দা হন (তারীখে ইবনে হিব্বান)। আল্লামা সোহায়লী বলেন, ৫০ দিন পর। হাতী-আক্রমণ হয় মোহার্‌রম মাসে এবং নবীজীর জন্ম হয় রবীউল আউঅলে (আর রওযুল উনুফ)। হাফেয দিময়া-তী বলেন, ৫৫ দিন পর। কেউ বলেন, ৪০ দিন পর, কারো মতে ১ মাস পর। তবে প্রসিদ্ধ মত ঐটি, যেদিকে আল্লামা সোহায়লী গিয়েছেন। অর্থাৎ ৫০ দিন পর (রূহুল মাআনী, আমপারা, ২৩৩ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে হুমাযাহ

এই সূরাতে ৯টি আয়াত আছে, যা সর্বসম্মত মতে মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে আব্বাসও এই কথা বলেন। মাহাল্লী বলেন, সূরাটি মাদানী, কিন্তু প্রথম মতটাই ঠিক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَ
مَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

বাংলা উচ্চারণ :

১। অয়লুল্ লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ্। ২। আল্লাযী জামাআ মা-লাঁও ওয়া আদ্দাদাহ। ৩। য়্যাহ্‌সাবু আন্না মা-লাহূ আখ্‌লাদাহ্। ৪। কাল্লা লাইয়ুম্বাযান্না ফিল হুতামাহ্। ৫। অ মা-আদ র-কা মাল হুতামাহ। ৬। না-রুল্ল-হিল মূকাদাহ। ৭। আল্লাতী তাত্তালিয়ু আলাল আফ্‌য়িদাহ। ৮। ইন্নাহা আলাইহিম মু-সাদাহ। ৯। ফী আমাদিম মুমাদ্দাদাহ।

তরজমা

১। প্রত্যেক খোঁচাদানকারী ও দোষ অন্বেষণকারীর সর্বনাশ হোক। ২। যে মাল জমা করে এবং তা গুণে গুণে রাখে। ৩। সে এও মনে করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে। ৪। কখনই না, বরং তাকে হোতামাতে

http://islaminonesite.wordpress.com

অবশ্য অবশ্য ফেলা হবে। ৫। তুমি কি জান যে, ঐ হোতামাহ কি জিনিষ? ৬। (শোন, তা হল) আল্লাহ্‌র সেই জ্বলন্ত আগুন। ৭। যা (হোতামাবাসীদের) হৃদয়সমূহের উপর চড়ে থাকবে। ৮। নিশ্চয়ই উহা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে। ৯। যা লম্বা লম্বা থামের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে।

তফসীর

ইবনে কাসীর বলেন, 'হাম্মায' কথায় হয় এবং 'লাম্মায' কাজে। এর অর্থ সেই ব্যক্তি যে মানুষকে হেয় করে এবং তার দোষ বের করে। ইবনে আব্বাস বলেন, হোমাযাহ-লোমাযাহ সেই, যে খোঁচা মারে এবং গীবত (পরনিন্দা) করে। রাবী ইবনে আনাস বলেন, যে ব্যক্তি মুখের উপর বলে যে হাম্মায্ এবং সে পেছনে বলে সে লাম্মায্। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, যে মুখ ও চোখ দিয়ে মানুষের গোশ্‌ত খায় এবং তাদেরকে গঞ্জনা দেয়। মোজাহেদ বলেন, হাম্‌য হাত ও চোখ দিয়ে হয় এবং লাম্‌য মুখ দিয়ে। ইবনে যায়দের উক্তিও তাই। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন, হোমাযাহ মানুষের গোশ্‌ত। এখানে আখনাস ইবনে শোরায়েক কিংবা আর কেউ। মোজাহেদ বলেন, এই শব্দটা ব্যাপক।

মাল জমার অর্থ গুণে গুণে ওপরে তুলে রাখা। যেমন আল্লাহ্ বলেন وَجَمَّعَ فَأَوْعَىٰ (সে জমা করে, অতঃপর তার হেফাযত করে)। সুদ্দী এবং ইবনে জারীরও একথা বলেন। কাব বলেন, তার মাল তাকে গাফেল করে দিয়েছে। সে দিনে এদিক থেকে তুলে ওদিকে রাখে এবং যখন রাত আসে তখন সে এমনভাবে শোয় যেমন কোন দুর্গন্ধময় মৃতদেহ পড়ে থাকে। সে কি এটা মনে করে যে, এইসব মাল জমা করার জন্যে সে চিরকাল এ জগতে থাকবে? এরূপ কখনই হবে না। বরং এই মাল সংগ্রহকারীকে হোতামায় ফেলে দেওয়া হবে। আগুনের একটা স্তরের নাম হোতামাহ। তার কারণ এই যে, ঐ আগুনের কিছু অংশ অন্য কিছু অংশকে দলিত মথিত করে। সাবেত বুনানী বলেন, ঐ আগুন তাদের হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে এবং তখন তারা জ্যান্তও থাকবে। মোহাম্মাদ ইবনে কাব বলেন, আগুন মানুষের সমস্ত শরীরকে খেয়ে ফেলবে এবং যখন তা দিল পর্যন্ত পৌঁছুবে তখন সে আবার শরীরে অন্যান্য অঙ্গের দিকে ফিরে আসবে। দিলটা বেঁচে থাকার কারণ হবে এই যে, আযাবের কষ্ট যাতে শরীরের উপর হয় এবং দিলও তড়পায়।

মো-সাদাহ এর অর্থ মোতবাকাহ বা বন্ধকৃত। এই তফসীরটি হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে (ইবনে মারদোওয়াহে)। আতিয়্যাহ আওফী বলেন, ঐ থাম লোহার হবে। সুদ্দী বলেন, আগুনের। ইবনে আব্বাস বলেন, আমাদ এর অর্থ দরজা। ইবনে মসউদের কেরাআত এরূপ:— مُؤْصَدَةٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ইবনে আব্বাস বলেন, তাদেরকে থামের মধ্যে পুরে দিয়ে তাদের গলায় জিঞ্জীর বেঁধে

দরজা বন্ধ কোরে দেওয়া হবে। কাতাদাহ বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, তাদেরকে আগুনের থামসমূহে আযাব দেওয়া হবে। ইবনে জারীরও এই মতটা গ্রহণ করেছেন।

ফতহুল বায়া-নের শব্দ এই যে, অয়ল্ এর অর্থ খিয্‌যুন (লাঞ্ছনা), আযাব ও ধ্বংস। এটা তাদের জন্য বদ্‌দোআ। হোমাযাহ ও লোমাযার অর্থ অনেক রকম বর্ণিত হয়েছে। তবে সবেরই ভাবার্থ খোঁচামারা ও দোষ বের করা। কথা, কাজ ও আওয়ায প্রভৃতি নকল করে খুশী হওয়া সবই এর অন্তর্ভুক্ত। ঐসব দোষে দুষ্ট সবাই এই আয়াতের মধ্যে গণ্য। আয়াতটি বিশেষ ব্যাপারে নাযেল হলেও এর হুকুম ব্যাপক। ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ চোগলখোর (একের কথা অপরকে লাগানেওয়ালা)। যে ভাই ভাইকে উত্তেজিত করে।

'মাল' শব্দটিকে 'নাকেরাহ' বা অনির্দিষ্ট ব্যবহার করার মানে হল এই যে, এটা সেই মাল যা গোলমালের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এরূপ মালের জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো গর্ব করতে পারে কি? যাজ্জাজ বলেন, যুগের বিপদ ও কালের চক্র থেকে বাঁচার জন্যে সে মাল গুণে গুণে রাখে। যাহ্হাক বলেন, অরেস বা উত্তরাধিকারীদের জন্যে। এখানে মাল জমা করা, তা আটকে রাখা এবং ভাল কাজে খরচ না করার নিন্দা করা হয়েছে। সে কি এটা মনে করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী ও জীবন্ত করে রাখবে এবং সে কখনো মরবে না? একরেমা বলেন, আয়ু বাড়াবে। কেউ বলেন, এর মধ্যে নেক আমলের বা সৎকাজের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ মালধন দিয়ে আয়ু বাড়ে না, বরং সৎকাজ দ্বারা অমর জীবন লাভ করা যায়।

এই মাল তো তাকে সেই জাহান্নামে নিয়ে যাবে যাকে 'হোতামাহ' বলা হয়। সেই হোতামাহ আল্লাহ্‌র জ্বলন্ত একটি আগুন যা হৃদয়ের উপর ছেয়ে যায়। হৃদয়ের উল্লেখ খাসভাবে করার কারণ এই যে, দিল হল সবরকম জঘন্য ও ঘৃণ্য খেয়ালের জায়গা এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজের উৎপত্তি স্থল। কিংবা এই কারণে যে, কষ্ট যখন দিল পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন দিলওয়ালা মরে যায়। কারণ, সমস্ত শরীরে এই দিলটাই সবচেয়ে বেশী নরম এবং সবচেয়ে বেশী দুঃখ পাবার জায়গা। সামান্য দুঃখ পেলে দিল মরে যায় কিন্তু তারা মরবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন— لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ অর্থাৎ তারা সেখানে মরবে না এবং জ্যান্তও থাকবে না। এই আগুন তাদের উপর ঢেকে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে থামের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে। মোকাতেল বলেন, তাদেরকে দরজার ভেতরে বন্ধ করা হবে। তারপর লোহার পেরেক দিয়ে দরজাগুলো সেঁটে দেওয়া হবে। যাতে তারা কেউ বাইরে না আসতে পারে এবং বাইরের কেউ সেখানে না যেতে পারে। মোমাদ্দাদাহ-র অর্থ ঐ থামগুলো ছোট ছোট নয় বরং লম্বা লম্বা হবে। আমাদ এর অর্থ জাহান্নামের বেড়ী কিংবা জিঞ্জীর। আল্লা-হো আলাম!

http://islaminonesite.wordpress.com

সংযোজন

সূরা হুমাযাতে ৯টি আয়াত, ২৩টি শব্দ এবং ৯৬ টি বর্ণ আছে (ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)। এই সূরাটি কতিপয় ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। উসমান ইবনে ওমর বলেন, উবাই ইবনে খালফের ব্যাপারে সূরাটি নাযেল হয়। সুদ্দী বলেন, আখ্‌নাস ইবনে শোরায়েকের ব্যাপারে (ইবনে আবী হাতেম)। আহলে-রিক্কার এক ব্যক্তি বলেন, জামীল ইবনে আ-মেরের ব্যাপারে (ইবনে জরীর)। ইবনে ইসহাক বলেন, উমাইয়া ইবনে খালফ যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখা পেতো তখন কথার খোঁচা মারতো এবং পেছনে নিন্দা করতো। ফলে সূরাটি নাযেল হয়। মোকাতেল বলেন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ নবী (সঃ) এর অগোচরে গীবত ও দূর্নাম করতো এবং মুখের সামনে লানতান করতো। তাই তার শানে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। মোজাহেদ বলেন, সূরাটি কতিপয় বিশেষ ব্যক্তির জন্য অবতীর্ণ হলেও এতে 'লিকুল্লি' বা প্রত্যেক ব্যক্তি শব্দ থাকায় ঐ দোষে দুষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে সূরাটি প্রযোজ্য (তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা ও তফসীরে বাগাভী, আমপারা, ২৯১ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার ১ম আয়াতটি প্রমাণ করে যে, কাউকে সামনাসামনি অন্যায়ভাবে অপমান করা এবং পেছনে তার দূর্নাম করা জাহান্নামে যাবার কারণ। হাদীসে আছে, ওকবা ইবনে আমের জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে চাইলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, নিজের জিহ্বার হেফাযত কর। ঘরে বসে থাক এবং নিজের পাপের কথা মনে করে কাঁদতে থাক (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী, মিশকাত, ৪১৩ পৃষ্ঠা)।

২নং আয়াতে সেইসব মালধনের কুৎসা বর্ণনা করা হয়েছে যে মাল সৎকাজে ব্যয় না করে তার মালিক তাকে প্রায়ই গুণে গুণে হিসাব কোরে কারূনের ধনের মত জমা কোরে রেখে দেয়। এইরূপ পরনিন্দুক ও কঞ্জুষ হোতামা জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামের আগুনের গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল বলেন, জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক হাযার বছর জাল দেওয়া হয় ফলে তা কালো কুচকুচে হোয়ে যায় (তিরমিযী, মিশকাত, ৫০৩ পৃষ্ঠা)। অন্য হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমাদের তো ঐ আগুনই যথেষ্ট। তিনি (সঃ) বললেন, শুধু তাই নয়, বরং ওর তাপ আরো ৬৯ গুণ বাড়ানো হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, ৫০২ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ্ আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন—আমিন!

পরনিন্দার সংজ্ঞা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমার কোন ভায়ের অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমন কথা আলোচনা করা যা শুনলে সে অপছন্দ করে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, তার মধ্যে যদি ঐ দোষ থাকে? তিনি (সঃ) বললেন, তাহলে সেটা গীবত হবে এবং যদি ঐ দোষ না থাকে তাহলে সেটা বোহতান ও মিথ্যা

অপবাদ হবে (মুসলিম, মিশকাত, ৪১২ পৃষ্ঠা)। গীবতের পাপ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল বলেন, পরনিন্দা ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতর। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, তা কি করে হে আল্লাহ্‌র রসূল? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার কোরে তওবা করলে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করতে পারেন। কিন্তু পরনিন্দুক ততক্ষণ ক্ষমা পায় না যতক্ষণ তার নিন্দিত ব্যক্তিটি তাকে ক্ষমা না করে (বায়হাকীর শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত, ৪১৫ পৃষ্ঠা)। কোরআনে বলা হয়েছে যে, গীবত করা মৃত ভায়ের গোস্ত খাওয়া (সূরায়ে হুজুরাত, ১২ আয়াত)।

এতএব যদি কারো মধ্যে কোন দোষ থাকে তাহলে তাকে নিরালায় ডেকে তার দোষ এমনভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে যাতে সে রাগ না করে, বরং অনুতপ্ত হয়। এভাবে তাকে সাবধান করার পরও যদি সে ঐ দোষ ত্যাগ না করে এবং তার ঐ দোষের কারণে যদি সামাজিক ক্ষতি দেখা দেয় তাহলে তার দোষটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া গীবত হবে না, বরং তা ইসলামেরই নির্দেশ পালন হবে (মওলানা আকরম খাঁ রচিত বাংলা আমপারা, ৪৩ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে আসর

অধিকাংশ মোফাস্‌সিরীনের মতে এই সূরাতে ৩টি আয়াত আছে এবং এগুলো মক্কায় নাযেল হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, সূরাটি মাদানী; ইবনে আব্বাস বলেন, মক্কী। আবু মুযীনা বলেন: দুজন পুরুষ সাহাবী যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করতেন তখন একে অপরের উপরে সূরা আস্‌র না পড়া পর্যন্ত কেউ আলাদা হতেন না। তারপর তারা সালাম করে চলে যেতেন (তাবারানী ও বায়হাকী)। আমরিবনে আ-স হযরতের নবী হওয়ার পরে ও তাঁর মুসলমান হওয়ার আগে মোসায়লামা কাযযাবের নিকট যান। তখন মোসায়লামা বলেন, এই সময়ে তোমাদের সাহেবের উপর কি নাযেল হয়েছে? তিনি বললেন, একটি ছোট্ট বাগ্মীতাপূর্ণ সূরা। সে বলল, তা কি? তিনি বললেন: অল্ আস্‌রে সূরাটি। সে বললো, আমার উপরেও ঐরূপ একটি সূরা নাযেল হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তা কি? সে বললো: يادبر يادبر انما انت اذنان وصدر وسائر حقر نقر অতঃপর সে বললো, হে আমর! বল, সূরাটি কেমন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিজেই জান যে, আমি তোমাকে মিথ্যুক বলে জানি। খারা-য়েতী এটাকে তাঁর কেতাব 'মাসা-বিল আখলা-কে' এভাবে বা এর মত অন্যভাবে লিখেছেন। 'অবার' একটি পোকার নাম, যা দেখতে বিড়ালের মত। ওর দেহে দুটি কান ও ১টি সীনা আছে এবং বাকী সমস্ত তুচ্ছ জিনিষ। মোসায়লামা এই পাগলামি উক্তিটিকে ছন্দ মিলিয়ে কোরআনের মোকাবেলায় পেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর পূজারীদের মধ্যেও সে ওটাকে প্রচলিত করতে পারেনি। ইমাম শাফেয়ী

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন:— মানুষ যদি এই সূরাটি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে তাহলে এটা তাদের অনেক বিষয়ের সন্ধান দিতে পারে।

سُوْرَةُ الْعَصْرِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيٰتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

বাংলা উচ্চারণ

১। অল্ আস্‌রি ২। ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুস্‌রি। ৩। ইল্লাল্ লাযীনা আ-মানু অ আমিলুস্ স-লিহা-তি অতাওয়া-সও্ বিল হাক্কি; অতাওয়া-সও্ বিস্ সব্‌রি।

তরজমা

১। আসরের (সময়ের) কসম! ২। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা (আল্লাহ্‌কে) বিশ্বাস করে এবং (সেই বিশ্বাস মোতাবেক) সৎকাজ করে আর একে অপরকে সত্যের জন্য উপদেশ দান করে ও (বিপদে-আপদে) পরস্পরকে ধৈর্য ধরার জন্য পরামর্শ দান করে (তারা ঐ ক্ষতির মধ্যে নয়)।

তফসীর

আস্‌র সেই সময় যখন আদম সন্তানের ভালমন্দ কাজের সময় হয়। যায়দ বিন আসলাম বলেন, আসর বলতে আসরের নামাযের সময়। কিন্তু প্রথমটা বেশী প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ কসম খেয়ে বলছেন যে, সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে সেই সব লোক ক্ষতিগ্রস্ত নয় যারা অন্তরে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সেই বিশ্বাস মোতাবেক সৎ কাজ করে। আর সত্যের জন্য নসিহত করে। অর্থাৎ লোকদেরকে আল্লাহ্‌র এবাদত ও বন্দেগীর হুকুম করে এবং হারাম ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবার চেষ্টা করে। আর বিপদের সময় এবং দুঃখদানকারীর দুঃখ দেবার সময় সবর করার ও ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয়। শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) বলেন, ধর্মের আসল জিনিষ ৩টি— (১) যে কাজের হুকুম দেওয়া হয়েছে তা করা। (২) যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা না করা। (৩) এবং বিপদের সময় সবর করা। এর মধ্যে থেকে শরীআতের কোন জিনিষ বাদ যায় না। মোটকথা 'তাওয়া-সও' এর ভাবার্থ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ 'আসরের কসম খেয়েছেন। ঐ আসরের অর্থ দাহ্‌র বা যুগ ও কাল। কালের মধ্যে বহু শিক্ষা রয়েছে। যেমন দিন ও রাতের আসা যাওয়া। তকদীর বা ভাগ্যের ভাল মন্দ হওয়া এবং আঁধার ও আলোর প্রকাশ পাওয়া। ঐসব শিক্ষার মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ও তাঁর একত্ববাদের বহু জাজ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে। রাতকে আসর বলে। এইরূপ দিন এবং সকাল সন্ধ্যাকেও আসর বলে। রাযী বলেন, আসরের মধ্যে আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিষ আছে। যেমন স্বচ্ছলতা ও অভাব, শরীর ভাল থাকা ও অসুখ হওয়া, ধনী ও গরীব হওয়া ইত্যাদি। মানুষের জীবনের বাকি সময় একটি অমূল্য সম্পদ। কারণ, যদি তার জীবনের হাযার বছর আজেবাজে কাজে নষ্ট হয় এবং তারপর জীবনের শেষ সময়টুকু যদি ভাল কাজে ব্যয় হয় তাহলে সে চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সবচেয়ে উত্তম জিনিষ মানুষের জীবনের শেষ বাকি সময়। এজন্য যুগ ও কাল সমস্ত ন্যামতের (আল্লাহ্‌র অবদানের) জড় বলে প্রমাণিত হয়। সেই সাথে এটাও জানা যায় যে, জায়গার চেয়ে সময় বেশী উত্তম। সে জন্য আল্লাহ্ তাআলা সময়ের কসম খেয়েছেন। কারণ, সময় আল্লাহ্‌র একটি খাস ন্যামত ও বিশেষ অবদান। যার মধ্যে কোন দোষত্রুটি নেই। কাতাদাহ ও হাসান বলেন, আসরের ভাবার্থ সূর্য চলার পর থেকে সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত সময়টুকু। কাতাদাহ বলেন, দিনের শেষ সময়। মোকাতেল বলেন, আসরের নামাযের সময় যাকে 'সালা-তে ওস্তা' বলে এবং আল্লাহ্ তার হেফাযতের বিশেষ হুকুম দিয়েছেন। কেউ বলেন এটা হযরত মুহাম্মাদের নবুওঅতের সময়ের কসম। কেউ বলেন, আসরের রব্বের (প্রতিপালকের) কসম। কিন্তু প্রথম মতটা বেশী ঠিক। ইবনে আব্বাসও ঐ মত পোষণ করেন। হযরত আলীর কেরাআত এই ছিল:— ইবনে মাসউদও এইরূপ পড়েছেন:— وانه لفيه الى اخر الدهر আবদুবনো হোমায়দ এই হাদীসটি রেওয়ায়ত করেছেন।

খুস্‌র এর অর্থ লোকসান। পুঁজি ঘটে যাওয়াকে খোস্‌রান বলে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যবসা ও চেষ্টা এবং জীবনের সময় কাটানোর ব্যাপারে দুনয়্যার আমলের ভেতরে লোকসান ও দিশেহারার মধ্যে রয়েছে। কেউ বলেছেন, এখানে ইন্‌সান বলতে কাফের বা কাফেরদের জামাআত। যেমন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আস ইবনে অয়েল ও আসঅদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আসাদ। কিন্তু প্রথম উক্তিটাই বেশী ঠিক। কারণ, 'ইনসান' শব্দের মধ্যে ব্যাপকতা আছে যার দলীল আয়াতের ইস্‌তিস্‌না বা ব্যতিক্রম অংশটি। আখফাশ বলেন , খুস্‌র এর অর্থ ধ্বংস। ফার্‌রা বলেন, শাস্তি। ইবনে যায়দ বলেন, অমঙ্গল। কেউ বলেন, দোষ। এগুলো সবই প্রায় সমার্থবোধক অর্থ। খুস্‌র শব্দটি অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহারের মধ্যে মহানত্বের ভাব প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ওর প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্‌ই জানেন। মানুষ সবদিক থেকে লোকসানের মধ্যে ঘেরা ও ঢাকা আছে। তার যে মুহূর্তটি পাপের

http://islaminonesite.wordpress.com

কাজে ব্যয় হয় তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক। আর যে ব্যক্তি গর্হিত কাজে লিপ্ত সেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত এবং যে সময়টা আল্লাহ্‌র কাজে ব্যয় হয় তা অন্তহীন হয়। তবে হাঁ, যারা ঈমানদার (আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী) ও নেক আমলকারী বা সৎকাজ সম্পাদনকারী তারা কষ্ট ও লাভের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু লোকসান ও ক্ষতির মধ্যে নয়। কারণ, তারা আখেরাতের (পরকালের) জন্য কাজ করেছে, দুনয়্যার কাজ তাদেরকে বাধা দিতে পারেনি। তারপর তারা একে অপরকে হকের ও সত্যের জন্য আদেশ করেছে। হক এর ভাবার্থ ঈমান, খাঁটি একত্ববাদ, শরীআতের হুকুম পালন করা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। কাতাদাহ বলেন, হক কোরআন, কিন্তু শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা উত্তম। সব্‌র এর অর্থ পাপ থেকে বিরত থাকা এবং ফারায়েয বা অবশ্য পালনীয় কাজ সম্পাদনে ও বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণ করা। সূরাটিতে হকের সাথে সবর এর উল্লেখ এসেছে। এটা একথার দলীল যে, সবরের মূল্য বিরাট ও তার মর্যাদা অতুলনীয়। সেইজন্য সাবিরীন বা ধৈর্যশীলদের সওয়াব বে-হিসাব ও অসংখ্য এবং আল্লাহ্‌ পাকও সবরকারীদের সাথে থাকেন। অলিল্লা-হিল হাম্‌দ অল মিন্নাহ।

সংযোজন

সূরা আস্‌রে ৩টি আয়াত, ১৪টি শব্দ এবং ৬৮টি বর্ণ আছে। এই সূরাটি অবতীর্ণের কারণ এই যে, কালদাহ ইবনে ওসায়দ নামক এক কাফের প্রাক ইসলামী যুগে হযরত আবু বাকর সিদ্দীকের (রাযিঃ) সঙ্গী ছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বাকর ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর ঐ সঙ্গীটি তাঁকে বলেন, হে আবু বাক্‌র তুমি তো সর্বদাই বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবসা করতে এবং লাভবান হতে! কিন্তু এখন তোমার কি হল যে, লোকসানে পড়ে গেলে? বাপদাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে লাত এবং ওয্‌যা ঠাকুরের পূজা না কোরে তাদের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হোয়ে গেলে? ঐ মূর্খের জওয়াবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করে সে সৎকাজই করে সে কখনো লোকসানে পড়ে না। হযরত আবু বাকরের এই দাঁতভাঙা জওয়াবে সন্তুষ্ট হোয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা এই সূরাটি নাযেল করেন (তফসীল ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৬৫)।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব ও অলীদ ইবনে মুগীরাহ প্রমুখ মোশরেকরা বলত যে, মোহাম্মাদ (সঃ) নিশ্চয়ই লোকসানে পড়ে আছে। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা এই সূরাটি অবতীর্ণ কোরে কসম খেয়ে বলছেন যে, ব্যাপারটি তা নয়, বরং ওদের অপবাদের বিপরীত (তফসীরে কাবীর ৮ম খণ্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)। পূর্ববর্তী যুগের কোন এক মনীষী বলেন, সূরা আসরের ব্যাখ্যা আমি ঐ বরফ বিক্রেতা দ্বারা জানতে পেরিছি যিনি এই বলে চীৎকার করছিলেন, তোমরা তার উপরে দয়া কর যার পুঁজি গলে যাচ্ছে! তোমরা তার উপরে রহম

কর যার পুঁজি গলে যাচ্ছে! একথা শুনে আমি বললাম যে, এটাই হল ইয়াল ইনসা-না লাফী খোসরে—এর অর্থ। কাল বয়ে যাচ্ছে, সেইসাথে মানুষের আয়ুও বরফের মত গলে কমে যাচ্ছে। এরই মধ্যে যে ব্যক্তি তার আয়ু দ্বারা পরকালের পাথেয় যোগাড় করতে না পারছে সেইই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (ঐ, ৪৭৬ পৃষ্ঠা)।

তাই আল্লাহ্‌ বলেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে আছে। কেবল তারা নয় যারা ৪টি গুণে গুণান্বিত। তারা হল এই:— (১) যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে। (২) যারা ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক ভাল ভাল কাজ করে। (৩) তারা কেবল একা একা ঐ ভাল কাজ করে না, বরং অন্যান্যদেরকেও ভাল কাজ করার উপদেশ দান করে। যাতে গোটা সমাজটাই ভাল হোয়ে যায় এবং (৪) ঐসব ভাল কাজ করতে গিয়ে যদি তারা কোন আপদ-বিপদ ও বাধার সম্মুখীন হয় তাহলে নিজেরা ধৈর্য্যধারণ করে এবং অন্যান্যদেরও সবর করার উপদেশ দান করে। এইসব গুণে যারা গুণান্বিত তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। কিন্তু যারা এই গুণাবলী থেকে বঞ্চিত তারা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত। একথার সাক্ষী অতীত কালের ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের কার্যধারা। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্ববাসীর সামনে যুগের সাক্ষী পেশ করে মানুষকে জ্ঞান দেবার জন্য যুগের কসম খেয়ে বলেন, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।

সূরায়ে তাকা-সুর

এই সূরাতে ৮টি আয়াত আছে। সবারই মতে সূরাটি মক্কায় নাযেল হয়েছে। কিন্তু বোখারী বর্ণনা করেছেন যে, সূরাটি মাদানী। ইবনে আব্বাস বলেন, মক্কী। ইবনে ওমার থেকে মরফুভাবে বর্ণিত আছে, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রত্যেকদিন এক হাযার আয়াত পড়তে পারে না কি? সাহাবীরা বললেন, কার এত শক্তি আছে যে, সে প্রতিদিন এত পড়তে পারে? তিনি বললেন, আলহা-কুমুত তাকা-সুর পড়তে পারে না কি? (হা-কেম, বায়হাকী)। মুনযেরী বলেন, এই হাদীসটির সনদে সেকা-ত বা নির্ভরযোগ্য রাবী রয়েছেন ওকবা ছাড়া, আমি তাকে চিনি না। ওমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হো আনহো বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একরাতে হাযার আয়াত পড়ে সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আল্লাহ্‌ও তার মুখের সামনে হাসবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কার এত শক্তি আছে যে, হাযার আয়াত পড়বে? নবী (সঃ) তখন বিসমিল্লা-হ পড়ে এই সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়লেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এই সূরাটি এক হাযার আয়াতের সমান (খাতীব ও দায়লামী)। আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীরের শব্দ এই যে, আমি একদিন হযরতের কাছে গেলাম। তখন তিনি আলহা-কুমুত তাকা-সোর পড়ছিলেন কিংবা তাঁর ওপরে এই সূরা নাযেল হচ্ছিল।

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি বলতে লাগলেন, আদম জাত বলে— মাল আমার, ধন আমার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাল তোমার নয়, তবে অতটা মাল তোমার যতটা তুমি খেয়ে শেষ করে দিয়েছো (মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)। আবু হেরায়রাহ থেকে মরফুভাবে বর্ণিত, বান্দাহ বলে—মাল আমার, মাল আমার। কিন্তু মালের মধ্যে মাত্র ৩টি জিনিষ তার। এক, যা সে খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। দুই, যা সে পরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তিন, যা সে দান খয়রাত করে জমা করে রেখেছে। এগুলো ছাড়া বাকি যা আছে সে সব তার নয়, সেগুলোকে পরের জন্য ছেড়ে যেতে হবে (মুসলিম)। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন নবী (সঃ) আমাকে বললেন, আমি সূরা "আলহা-কুমুত তাকা-সুর" তোমাদের কাছে পড়ছি। এটা শুনে যে কেউ কাঁদবে তার জন্য জান্নাত রাখা আছে। তারপর তিনি সূরাটি পড়লেন। তখন আমাদের মধ্যে কেউ কাঁদল এবং কেউ কাঁদল না। যারা কাঁদেনি তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কাঁদার জন্য খুব চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমরা তা পারলাম না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি আবার সূরাটি তোমাদের শুনাচ্ছি। এবার যে কাঁদবে তার জন্য বেহেস্ত থাকবে। আর যারা কাঁদতে পারে না তারা কাঁদার মত মুখ করবে (বায়হাকী স্বীয় শোয়াবুল ঈমানে এটাকে রেওয়ায়ত করেছেন)। হাফেয ইবনুল কাইয়িম এই সূরার একটি সংক্ষিপ্ত তফসীর লিখেছেন। এদামাতুস সুব্বর নামক পুস্তিকাতে এই তফসীরের উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি এটা প্রমাণ করেছেন যে, এই সূরাটি কেবল কাফেরদের শানে খাস নয় বরং মুসলমানদেরও জন্য। আমার মতে এই মতটি বেশী সহী ও প্রাধান্যযোগ্য।

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ ثَمَانِ اٰيَاتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ
يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

বাংলা উচ্চারণ

১। আলহা-কুমুত্ তাকা-সুর। ২। হাত্তা-যুরতুমুল মাকাবির। ৩। কাল্লা-সাওফা তা'লামুন। ৪। সুম্মা কাল্লা-সাওফা তা'লামুন। ৫। কাল্লা-লাও তা'লামুনা ইল্‌মাল্ ইয়াকীন। ৬। লাতারাউন্নাল্ জাহীম। ৭। সুম্মা

লাতারাউন্নাহা-আইনাল ইয়াকীন। ৮। সুম্মা লাতুস্‌আলুন্না ইয়াওমায়িযিন আনিন্ নায়ীম।

তরজমা

১। (সব জিনিষ) বেশী বেশী পাবার আশা তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) ভুলিয়ে রেখেছে। ২। যতক্ষণ না তোমরা কবরের মুখ দেখ। ৩। (দুনিয়াবী বিষয়ে এত মজে থাকা) কখনই (উচিত) নয়, খুব জলদি তোমরা (নিজের ভুল) জানতে পারবে। ৪। আবার (বলছি) কখনই (এরূপ কর) না, অতি শীঘ্রই তোমরা (এর পরিণাম) জ্ঞাত হবে। ৫। কখনই (গাফেল থাকতে) না যদি তোমরা জ্ঞান রাখতে। ৬। নিশ্চয়ই তোমরা (গাফলতির কারণে) জাহীম দোযখ দেখবে। ৭। পুনরায় তোমরা তাকে বিশ্বাসের চোখে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। ৮। তারপর (আল্লাহ্‌র) ন্যামত সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্য প্রশ্ন করা হবে।

তফসীর

আল্লাহ্ বলেন, দুনয়্যার মায়া ও সুখশান্তি তোমাদেরকে আখেরাতের খবর ও পরকালের পুঁজি যোগাড় করা থেকে বিরত রেখেছে। আর এই অবস্থা এত দীর্ঘ হয় যে, তোমাদের কাছে মওত এসে হাযির হয়ে যায় এবং তোমাদেরকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়। আসলাম বলেন, হযরত বলেছেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ফর্মাবর্দারী থেকে গাফেল করে রেখেছে,পরিশেষে তোমরা মরে যাও (ইবনে আবী হাতেম)। হাসান বলেন, খুব বেশী মালধন ও ছেলেপুলে তোমাদেরকে বেখবর করে রেখেছে। উবাই ইবনে কাব বলেন, لو كان لابن آدم واديان من ذهب 'লাও কা-না লিবনে আ-দামা ওয়া-দিম মিন যাহাবিন (যদি আদম সন্তানের জন্য একটা সোনার পাহাড় হোত) হাদীসটিকে আমরা কোরআন মনে করতাম। পরিশেষে সূরায়ে আলহা-কুমুত্ তাকাসুর নাযেল হয় (বোখারী)। আনাস ইবনে মালেকের হাদীসে বলা হয়েছে, মরা লাশের সাথে তিনটি জিনিষ থাকে। দুটো ফিরে আসে এবং একটা তার সাথে থেকে যায়: ১। আত্মীয়-স্বজন, ২। মালধন, ৩। আমল। আত্মীয় ও মালধন ফিরে আসে এবং আমল সাথে থেকে যায়। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)। হযরত আনাসের অন্য শব্দ মারফুভাবে এই যে, আদম সন্তান বুড়ো হয় এবং দুটো জিনিষ তার সাথে থেকে যায়। এক, লোভ এবং দুই, আশা (আহমাদ, বোখারী ও মুসলিম)। ফারসী কবি বলেন: মার্দ চুঁ পীর শাওদ + হের্‌স্ জওয়াঁ মী গার্‌দাদ্—অর্থাৎ মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন তার লোভ জওয়ান হয়। হাফেয ইবনে আসাকের আহনাফ ইবনে কায়েসের জীবনী বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, আহনাফ একদা এক ব্যক্তির হাতে একটি দেরহাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার? সে বলল, আমার। তিনি বললেন, এটা

http://islaminonesite.wordpress.com

তোমার তখনই হবে যখন তুমি এটাকে কোন মজুরীর বদলে কিংবা কৃতজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করে দেবে। তারপর তিনি এই কবিতা পড়েন:

অর্থাৎ তুমি মালের, যখন তুমি তাকে রুখে রাখবে। অত:পর যখন তুমি সেটাকে খরচ করবে তখনই মাল তোমার হবে।

সূরাটি অবতীর্ণের কারণ

ইবনে বোরায়দাহ বলেন, এই সূরাটি আনসারদের দুটো গোত্রের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হল বানী হারেসাহ ও বানী হারস্। তারা আপোষে গর্ব ও আধিক্যের দর্প করেছিল। একটি গোত্র বলে, তোমাদের মধ্যে অমুকের ছেলে অমুকের মত অমুক অমুক কেউ আছে কি? অন্য গোত্রটিও তাদের জীবিত ব্যক্তিদের নিয়ে ঐরূপ গর্ব করে। অত পর বলে, আচ্ছা, আমাদের সাথে কবরডাঙ্গায় চল। এবার তারা কবরের দিকে এশারা করে বলে যে, অমুকের মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? অন্য দলটিও ঐরূপ বলে। তখন আল্লাহ্ সূরাটি নাযেল করেন। কাতাদাহ বলেন, তারা বলত যে, আমরা লোকসংখ্যার দিক দিয়ে অমুক বংশের চেয়ে বেশী এবং অমুক গোত্রের চেয়ে বেশী তৈরী। কারণ, তারা তো প্রতিদিন কমে যাচ্ছে। আল্লাহ্র কসম! তারা এভাবে কমে কমে কবরবাসী হয়ে যাক।

হাত্তা-যুরতুমুল্ মাকা-বির এর সঠিক অর্থ এই যে, তোমরা কবরে গিয়ে প্রোথিত হয়ে যাবে।। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, যে, নবী (স:) একবার এক গেঁয়ো আরবের ইয়াদত (রোগীর অবস্থা জানা ও তাকে সান্তনা দেওয়া) করতে গিয়ে বলেন, لاباس طهور انشاءالله সে বলল, আপনি 'তাহুর (পবিত্র) বলেছেন?' এটা তো নারীর তাড়নায় একজন বুড়ো লোকের গায়ের তাপ যা তাকে কবরের মুখ দেখাবে। নবী (স:) বললেন, হাঁ, তাই। হযরত আলী বলেন, আমরা সব সময় কবরের আযাব সম্পর্কে সন্দেহ করতাম। পরিশেষে এই সূরাটি নাযেল হয় (ইবনে আবী হাতেম ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী এই রেওয়াতটিকে গরীব ও বিরলসূত্র বলেছেন)। মায়মুন ইবনে মিহরান বলেন, আমি একদা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে বসেছিলাম। তিনি "আল্হা-কুমুত তাকা-সুর" সূরাটি পড়লেন, তারপর একটু থেমে আমাকে বললেন, হে মায়মুন! আমার মতে ঐ মাকা-বেরের (কবরসমূহের) অর্থ যিয়ারত। আর যিয়ারতকারীর জন্য অপরিহার্য স্বীয় ঘরে ফিরে আসা। অর্থাৎ জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে যাওয়া, কারণ এটাই তার ঘর। এরূপভাবে এটাও উল্লিখিত আছে যে, একজন দেহাতী আরব কোন ব্যক্তিকে এই সূরাটি পড়তে শুনে বলে: যিয়ারতকারী তার জায়গা থেকে খুব তাড়াতাড়ি অন্য দিকে পাড়ি দেয়। অর্থাৎ কবরে চিরকাল থাকতে হবে না। কারণ, কবরবাসী কবর থেকে বেরিয়ে বেহেশ্তে বা দোযখে যাবে। হাদীসে আছে:

অর্থাৎ কবর হয় জান্নাতের বাগানের একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্ত্তের

একটি গর্ত্ত।

হাসান বলেন, "খুব জলদি তোমরা জানতে পারবে" এটা হুমকীর পর আর একটা ভয়ের হুমকী। যাহ্হাক বলেন, এর সম্বোধিত কাফেররা এবং দ্বিতীয়টার মোমেনরা। তারপর বলা হয়েছে, যদি তোমরা যথাযথভাবে এর রহস্য জানতে তাহলে বেশী বেশী পাবার আশা তোমাদেরকে আখেরাতের পাথেয় যোগাড় করা থেকে বিরত রাখত না। যতদিন না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। বরং তোমরা বিশ্বাসের চোখে জাহান্নামকে দেখে নিতে। এটা হল প্রথম হুমকীর ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ তাদেরকে এই অবস্থার ভয় দেখিয়েছেন। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের। কারণ, জাহান্নাম যখন একবার আওয়ায করবে তখন সমস্ত মুকার্রাব (অতি সম্মানীয়) ফেরেশ্তা এবং নবী ও রসূলগণ তার ভয়ে এবং ভয়ংকর অবস্থা দেখে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন। এই হুমকীতে একটা বিরাট প্রভাব আছে। তারপর এসব প্রশ্ন হবে যে, তারা আল্লাহ্র ন্যামতের ও বিশেষ অবদানের কি শুকরিয়া আদায় করেছে? ঐ ন্যামত হল শরীর সুস্থ থাকা, নিরাপদে থাকা ও সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকা প্রভৃতি।

হযরত ওমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি:) বলেন, নবী (স:) একদিন দুপুরের সময় বাইরে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে আবু বাক্রকে পেলেন। অত:পর তাঁকে তিনি বললেন, এসময় তুমি কিভাবে এলে? আবু বাক্র বললেন, যে জিনিষ আপনাকে ঘর থেকে বের করেছে। তারপর ওমার এলেন তাঁকে নবী (স:) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে বের হলে? তিনি বললেন, আমাকে সেই বের করেছে যে আপনাদের দুজনকে বের করেছে। অত:পর ওমর বসে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ (স:) আবু বাক্র ও ওমরের সাথে কথা বলতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা দুজন এ গাছটা পর্যন্ত যেতে পার কি? তাহলে খানাপিনা ও ছায়া সবই পাওয়া যাবে। তাঁরা বললেন, হাঁ। নবীজী বললেন, তাহলে আমার সাথে তোমরা ইবনে তাইহান আবু হায়সাম আনসারীর বাড়ী পর্যন্ত চল। নবীজী আগে বাড়লেন এবং কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বসবার অনুমতি চাইলেন। তাইহানের স্ত্রী বিবি উম্মে হায়সাম দরজার পেছন থেকে কথাগুলো শুনছিলো এবং সে চাচ্ছিল যে, নবী (স:) আরো সালাম দিন। সালামের উত্তর না পেয়ে নবীজী যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন উম্মে হায়সাম পেছন থেকে দৌড়ে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার সালামের আওয়ায শুনেছিলাম, কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে, আপনি আরো বেশী কোরে সালাম করুন। তিনি (স:) বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। অত:পর মেয়েটি বললো, আবু হায়সাম মিষ্টি পানি আনার জন্য নিকটেই গিয়েছেন। আপনারা তশরীফ রাখুন। তিনি এখনই এসে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্! তারপর একটি গাছের নীচেয় তিনি কিছু বিছিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আবু হায়সামও এসে গেলেন এবং তাঁদেরকে

http://islaminonesite.wordpress.com

দেখে খুব খুশী হলেন। আর তাঁর চোখও জুড়িয়ে গেল। তারপর তিনি একটি গাছে চড়লেন এবং কিছু ফল পাড়লেন। নবী (স:) বললেন, বাস, আর নয় হে আবু হায়সাম! তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ডাঁসা ও পাকা দুরকমই খান। তারপর পানি আনলেন। সবাই পানি পান করলেন। এবার নবী (স:) বললেন: হা-যা মিনান নায়ীমিল্লাযী তুস্-আলুনা আন্‌হু— এটা সেই ন্যামতের মধ্যে একটা যে সম্পর্কে তোমাদেরকে সওয়াল করা হবে (ইবনে আবী হাতেম)। এভাবে এই বর্ণনাটি বিরলসূত্র।

এই হাদীসটি ইবনে জারীরও আবু হোরায়রাহ থেকে অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। যার আসল মুসলিম ও ৪টি সুনানে (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে) আছে। ইমাম আহমাদও এর রাবী। আবু ওসায়েব বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স:) বাইরে এলেন ও আমাকে ডাকলেন। আমি বের হলাম এবং গিয়ে আবু বাক্‌রকে ডাকলাম, তিনি বের হলেন। তারপর ওমরকে ডাকলাম, তিনিও বের হলেন। ফের আমরা সবাই কোন এক আনসারের বাগানে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, আমাদের কিছু খাওয়াও। তিনি একটি ডাল নিয়ে আসলেন। নবী (স:) তাঁর সাথীদের সাথে তাথেকে কিছু খেলেন এবং ঠান্ডা পানি চেয়ে পান করলেন। অতঃপর বললেন: লাতুস্‌আলুন্না আন হা-যা-ইয়াওমাল কিয়া-মাহ—অর্থাৎ এই ন্যামত সম্পর্কে কেয়ামতের দিনে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। কথাটি শোনার পর ওমর ডালটি তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন। নবীজীর সামনে কিছু ফল ছড়িয়ে পড়লো। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই জিনিষ সম্পর্কে কেয়ামতের দিন আমাদেরকে সওয়াল করা হবে কি? নবী (স:) বললেন, হাঁ, কিন্তু ৩টি জিনিষের নয়। এক, সেই কাপড় যা দিয়ে সতর (শরীরের যতটা অঙ্গ শরীআত অনুযায়ী ঢাকা ফরয) ঢাকা হয়েছে। দুই, এক টুকরা রুটী যা দিয়ে ক্ষুধা দূর করা হয়েছে। তিন, একটি ঘর যেখানে গরমে ও শীতে মাথা গোঁজা হয়েছে (আহমাদ)। মাহমুদ ইবনে রাবীঅ বলেন, যখন এই সূরাটি নাযেল হয় তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদেরকে কোন্ ন্যামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে? কারণ, এখানে তো এই পানি ও খেজুর এবং কাঁধের ওপরে তলোয়ার আর সামনে দুশমন মাথার ওপর। তাহলে কোন্ আরামের সওয়াল হবে? নবী (স:) বললেন, আমা-ইন্না যা-লিকা সাইয়াকুন অর্থাৎ শুনে নাও, ঐ আরাম খুব জলদি হবে (আহমাদ)। আবু হোরায়রার বর্ণনায় নবী (স:) বলেন, সর্ব প্রথম যে জিনিষের সওয়াল বান্দার কাছে কেয়ামতের দিন হবে তা হ'ল আল্লাহ্‌র ন্যামত বা খাস অনুদান। তাকে বলা হবে— তোমার শরীর কি সুস্থ রাখা হয়নি? তোমাকে ঠান্ডা পানি পান করানো হয়নি কি? (তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান)। একরেমা বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযেল হয় তখন সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি সুখে আছি? আধ পেট খাই, তাও আবার

যবের রুটী? তখন আল্লাহ্ অহী পাঠান যে, তোমরা কি জুতা পরনা এবং ঠান্ডা পানি পান করনা? এটাই তো নায়ীম (ইবনে আবী হাতেম)।

নায়ীম শব্দের ব্যাখ্যা

ইবনে মাসউদের হাদীসে নবী (সঃ) পেট ভরে খাওয়া, ঠাণ্ডা পানি ও ছায়ার জায়গাকে নায়ীম বলেছেন এবং যায়েদ ইবনে আসলামের রেওয়ায়তে পরিমিত চরিত্র ও ঘুমের স্বাদকে নায়ীম বলে উল্লেখ করেছেন। এই দুটি রেওয়ায়তই ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন। সায়ীদ ইবনে জোবায়ের বলেন, মধুর শরবতেরও সওয়াল হবে। মোজাহেদ বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেক লয্যত ও স্বাদের প্রশ্ন হবে। হাসান বলেন, সকাল ও সন্ধ্যার খাবার হল নায়ীম। আবু কেলাবাহ বলেন, ঘি, মধু ও চাপাতি রুটী হল নায়ীম। ইবনে কাসীর বলেন, মোজাহেদের মতে উত্তম মাল। ইবনে আব্বাস বলেন, শরীর, কান ও চোখের নীরোগ থাকাই নায়ীম। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন যে, ওগুলোকে কোন্ কাজে ব্যবহার করেছ, যদিও আল্লাহ এগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:—

ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কান, চোখ ও দিল প্রত্যেকটি সম্পর্কে সওয়াল করা হবে (সূরা বানী ইসরাইল ৩৬ আয়াত)। ইবনে আব্বাসের হাদীসে নবী (সঃ) বলেছেন, ২টি ন্যামত এমন আছে যে ব্যাপারে প্রায়ই লোক আমানতের খেয়ানত করে। তা হল স্বাস্থ্য ও অবসর সময় (বোখারী, তিরমিযী নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)। এর অর্থ এই যে, তারা ঐসব ন্যামতের শুকরিয়া ঠিকভাবে আদায় করে না। ইবনে আব্বাসের অন্য মরফু শব্দ এই যে, ইযার (পরনের কাপড়), ছায়া, দেওয়াল, ও রুটী ছাড়া যা বেশী হবে তার হিসাব কেয়ামতের দিনে বান্দার কাছে নেওয়া হবে অথবা তার সওয়াল করা হবে (বায্যার)। আবু হোরায়রাহ মরফুভাবে বলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে বলবেন, আমি তোমাকে ঘোড়া ও উটের ওপর চড়িয়েছি, তোমাকে স্ত্রী দিয়েছি, তুমি এক চতুর্থাংশ নিতে, তুমি ধনী ছিলে, তার কি শুকরিয়া আদায় করেছ? (আহমাদ)

ফতহুল বায়ানের শব্দ এই যে, মালধন ও ছেলেপুলে আধিক্যের প্রতিযোগিতা এবং গর্ব ও দর্প তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন থেকে উদাসীন করে রেখেছে। হাসান বলেন, তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে এমন কি মৃত্যু এসে ধরে নিয়েছে এবং তোমরা ঐ ভুলেই পড়েছিলে। কাতাদাহ বলেন, বংশ ও গোত্রের আধিক্য নিয়ে গর্ব করা। যাহ্হাক বলেন, পার্থিব জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকা। কাতাদাহ বলেন, এই আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যখন তারা একথা বলে যে, আমরা অমুক বংশের চেয়ে বেশী এবং অমুক অমুকের চেয়ে অধিক। তাদেরকে এ বিষয় এত মজিয়ে রাখে যে, তাদের মওত এসে হাযির হয়। কালবী বলেন, কোরায়েশদের

http://islaminonesite.wordpress.com

দুটি গোত্রের ব্যাপারে সূরাটী অবতীর্ণ হয়। আব্দে মানাফ ও বানী সাহম নামক দুটি গোত্র ইসলাম কবুল করার পরও নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের গর্ব করত। প্রত্যেক কবীলা একথা বলত যে, আমাদের সরদারী, ইয্যত ও মাহাত্ম্য তোমাদের চেয়ে বেশী। তারপর তারা মৃত লোকদের ব্যাপারেও গর্ব করত। আয়াতটিতে একথার প্রমাণ রয়েছে যে, দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকা এবং গর্ব ও দর্প করা একটি জঘন্য স্বভাব। তবে হাঁ, সৎকাজ বেশী করার আকাংখা রাখা এবং ঐ ব্যাপারে গর্ব করা শরীআতের দিক দিয়ে নিন্দিত নয়। যেমন—এবাদত-বন্দেগী ও সচ্চরিত্র প্রদর্শন। এটা তখনই চলতে পারে যখন এটা দেখা যায় যে, আমার দেখাদেখি অন্যান্য লোকও আমার অনুসরণ করবে। আল্লাহ একথা বলেন নি যে, অমুক তাকা-সুর (বেশী বেশী পাবার নেশা) তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। বরং তিনি সাধারণভাবে বলেছেন, যা মন্দের ব্যাপারে বেশী প্রযোজ্য। কারণ, মানুষের খেয়াল সবদিকে দৌড়ে বেড়ায়। সুতরাং শুধু তাকা-সুর বলার মধ্যে সব রকম তাকাসোর এসে যায়।

তারপর মানুষকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, খুব জলদি তোমরা জানতে পারবে। প্রথম হুমকিটী মরণকালে কিংবা কবরের এবং দ্বিতীয়টী কেয়ামতের। ফাররা বলেন, এই বারবার হুমকি কোন বিষয়ে কোন বিষয়কে জোরদার ও দৃঢ় করার এক পদ্ধতি। তারপর বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে একথা জানতে পারতে যে, তোমাদের শেষ পরিণতি কি হবে তাহলে এই জ্ঞান তোমাদেরকে প্রাচুর্যের নেশা এবং গর্ব ও দর্প করা থেকে নিশ্চয়ই বিরত রাখতো। কিংবা এর ভাবার্থ এই যে, নিশ্চয়ই তোমরা নিজেদের ফায়দার কাজ করতে এবং যেসব আজেবাজে কাজে ফেঁসে আছ তা ছেড়ে দিতে। আখফাশ বলেন, যদি তোমরা ধ্রুবজ্ঞান লাভ করতে তাহলে অনেক পাবার নেশা তোমাদেরকে গাফলতির মধ্যে ফেলে রাখত না। তৃতীয় 'কাল্লা' শব্দটি প্রথম দুটির মত হুমকি ও ডাঁটের জন্য। ফাররা বলেন, এখানে কাল্লা শব্দগুলোর অর্থ হাক্কা। আর কেউ বলেন, এই তিন জায়গাতেই কাল্লার অর্থ ইল্লা। ইবনে আবী হাতেম এটা বর্ণনা করেছেন। কাতাদাহ বলেন, এখানে য়্যাকীন এর অর্থ মওত। তাঁর অন্য রেওয়ায়ত এই যে, এলমে য়্যাকীনের অর্থ—মানুষ যেন এটা বিশ্বাস রাখে যে, মরার পর আল্লাহ তাকে আবার তুলবেন।

তারপর আল্লাহ বলেছেন, লাতারাউন্নাল জাহীম। এটা উহ্য কসমের জওয়াব যার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই তোমরা আখেরাতে জাহীমকে দেখবে। এর মধ্যে আরো বেশী হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন আছে। তারপর এই হুমকি ও ভীতিকে আরো জোরদার কোরে বলা হয়েছে, সুম্মা লাতারাউন্নাহা আয়নাল য়্যাকীন অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিতভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে দোযখকে দেখবে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম দেখা চোখে দেখা এবং দ্বিতীয় দেখা ঢোকার সময় দেখা। কিংবা এর

অর্থ এই যে, যদি দুনয়্যায় বিশ্বাসের জ্ঞানলাভ হয়ে যেত তাহলে দিলের মধ্যে চাক্ষুস দেখার বিশ্বাসও হাসেল হোত। অতঃপর দুন্‌য়্যার যে ন্যামত তোমাকে আখেরাত থেকে ভুলিয়ে রেখেছে সে সম্পর্কে তোমাকে সওয়াল করা হবে। কাতাদাহ বলেন, মক্কার কাফের যারা দুন্‌য়্যাতে আরাম ও আয়েশের মধ্যে ছিল, তাদেরকে সওয়াল করা হবে। কারণ, তারা কোন ন্যামতের শুক্‌রিয়া আদায় করেনি। বরং তারা পরের এবাদত করেছে এবং শির্ক করেছে। হাসান বলেন, কেবলমাত্র জাহান্নামীদেরকে ন্যামতের সওয়াল করা হবে। কাতাদাহ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে ন্যামত দান করা হয়েছে তাকে আল্লাহ সেই ন্যামত সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। এটাই প্রকাশ্য ভাব। কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে এই ন্যামতের সওয়াল খাস নয়। কারণ, (আন্‌নায়ীমের আলিফ লাম জিন্স ও ইস্‌তিগ্‌রাকের জন্য। শুধু সওয়াল দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, যাকে সওয়াল করা হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে। কারণ,) আল্লাহ তো মোমেনদেরকে সওয়াল করবেন যে, তুমি আমার ন্যামতকে কোথায় খরচ করেছে, যাতে সে তার অক্ষমতার কথা জানতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, আমার দ্বারা শুক্‌রিয়া আদায় হয়নি। আলেমরা বলেন যে, অমুক অমুক জিনিষের সওয়াল হবে। কিন্তু ব্যাপক অর্থই বেশী ঠিক।

সংযোজন

এই সূরাতে ৮টি আয়াত, ২৮টি শব্দ এবং ১৩০টি বর্ণ আছে। এই সূরার মধ্যে তাকাসুর অর্থাৎ পার্থিব জিনিষ বেশী বেশী পাবার আকাংখা করার দোষ বর্ণনা ও নিন্দা করা হয়েছে বলে সূরাটির নাম তাকাসুর রাখা হয়েছে (ফতহুল আযীয, আমপারা ৩৬৩ পৃষ্ঠা)।

মানুষ উক্ত তাকাসুরের মধ্যে এত বুঁদ হোয়ে থাকে যে, কবরের মুখ না দেখা পর্যন্ত তার মোহ কাটে না। তাই আল্লাহ বলেন যে, এই তাকা-সুরের পরিণাম যদি সে জানতো তাহলে সে ওতে অত মজে থাকতো না। জ্ঞানের স্তর তিনটি (১) এলমে ইয়াকীন বা ধারণা জ্ঞান। যেমন আগুন কোন জিনিষকে জ্বালিয়ে দেয় ঐ জ্ঞান লাভ করা। (২) আইনে ইয়াকীন বা চাক্ষুস জ্ঞান। যেমন কোন জিনিষকে চোখের সামনে আগুনে জ্বলতে দেখা। (৩) হাক্কুল ইয়াকীন বা ধ্রুব জ্ঞান। যেমন নিজের কোন অঙ্গকে আগুনে রেখে জ্বলনের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। এলমে ইয়াকীনের তুলনায় আইনে ইয়াকীন অধিক বিশ্বাসযোগ্য হয়। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, শোনা খবর চোখে দেখার মত হয় না (তাবারানী ও খাতীব বাগদাদী)। যেমন মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ও হাকেমে ইবনে আব্বাস থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে তূর পাহাড়ে থাকা অবস্থায় তাঁর অগোচরে তাঁর কওমের বাছুর পূজোর খবর দিতে তাঁর মনে তেমন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু যখন তিনি পাহাড় থেকে লোকালয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

এসে স্বচক্ষে দেখলেন যে, সত্যিই তাঁর কওম আল্লাহ্র পূজো ছেড়ে দিয়ে বাছুর পূজো করছে তখন তাঁর হাত থেকে তওরাতের ফলকগুলো আপনাআপনি পড়ে যায় এবং তা ভেঙে যায় (তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)।

হযরত মোআয ইবনে জাবাল থেকে মরফূভাবে বর্ণিত আছে যে, মোমেনকে কেয়ামতের দিনে তার সবরকম প্রচেষ্টা এমনকি দুচোখের সুরমা সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে (আবু নোআইম, তফসীরে মাযহারী, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)। অন্য এক হদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তিনটি বিষয়ে আল্লাহ্র বান্দার কাছে হিসাব নেওয়া হবে না:— (১) সাহরী খাবার (২) যা দিয়ে ইফতার খাওয়া হয় তার এবং ভায়েদের সাথে যা খাওয়া হয় তার (মোসনাদে ফেরদৌস, আওনুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে কারিআহ্

এই সূরার ৮টি কিংবা ১১টি অথবা ১০টি আয়াত সমস্ত মোফাস্সিরীনের মতে মক্কায় নাযেল হয়েছে। ইবনে আব্বাসও একথাই বলেন।

وَهِيَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু করছি)

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ
يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

বাংলা উচ্চারণ

১। আলকা-রিআহ্। ২। মালকা-রিআহ্। ৩। অমা-আদ্র-কা মাল্কা-রিআহ্। ৪। ইয়াওমা ইয়াকূনুন্ না-সু কালফারা-শিল মাব্সূস। ৫। অতাকূনুল জিবা-লু কাল্ এহ্নিল মান্ফূশ। ৬। ফাআম্মা-মান্ সাকুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ। ৭। ফাহ্ওয়া ফী য়ীশাতির রা-বিয়াহ্। ৮। অ আম্মা-মান্ খাফ্ফাত মাওয়া-যীনুহূ ফাউম্মুহূ হা- ভিয়াহ্। ৯। ওমা- আদ্র- কা মা- হিয়াহ্। ১০। না-রুন্ হা-মিয়াহ্।

তরজমা

১। ঠকঠককারিণী! ২। ঠকঠককারিণী কি? ৩। তুমি কি জান ঠকঠককারিণী কি জিনিষ? ৪। (শোন, তা হল সেই দিন) যেদিন সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় (দিশেহারা) হবে। ৫। এবং পাহাড়গুলো ধুনিত রঙিন পশমের ন্যায় (চূর্ণ বিচূর্ণ) হোয়ে যাবে। ৬। অতঃপর তখন যার পাল্লা ভারী হবে। ৭। সে পছন্দনীয় জীবনে থাকবে। ৮। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে তার মা হাভিয়া (দোযখ) হবে। ৯। তুমি কি জান, তা কি জিনিষ? ১০। (তা হল) জ্বলন্ত আগুন।

তফসীর

কারিআহ কিয়ামতের বা প্রলয় দিবসের একটি নাম। যেমন, হা-ক্কাহ, তা-ম্মাহ, সা-খ্খাহ, গা-শিয়াহ প্রভৃতি। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতকে ভয়ংকর এবং তার অবস্থাকে খুবই কঠিন বর্ণনা করতঃ বলছেন, তুমি কি জান কারিআহ কি জিনিষ? তারপর তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যায় বলছেন যে, এটা সেইদিন যেদিন ছুটোছুটি ও দৌড়াদৌড়ি, দিশেহারা ও পাগলপারা এবং সংকটময় পরিস্থিতির জন্য সমস্ত মানুষ ছন্নছাড়া পতঙ্গপালের ন্যায় হোয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন:— كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (তারা যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল)। আর পাহাড়গুলো ধুনিত পশমের ন্যায় গুড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। মোজাহেদ, একরেমা, সায়ীদ ইবনে জোবায়র, হাসান কাতাদাহ্, আতা খোরাসানী, যাহ্হাক ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন, এহ্ন্ এর অর্থ পশম। তারপর আল্লাহ্ তাআলা ঐ দিনের লোকদের পরিণাম সম্পর্কে বলছেন, যার পাপের চেয়ে পুন্যের পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে এবং যার নেকীর চেয়ে গোনাহ্র পাল্লা ভারী হবে সে দোযখে পড়বে। উম্ম এর অর্থ দেমাগ বা মস্তিস্ক। অর্থাৎ সে মাথা গুঁজে জাহান্নামের আগুনে পড়বে। ইবনে আব্বাস, একরেমা, আবু সালেহ, কাতাদাহ, এইরূপই বলছেন—অর্থাৎ ইয়াহ্বী ফিন না-রি আলা-রাসিহী। অথবা উম্মুহুর ভাবার্থ হাভিয়া তার মা, যার কাছে সে ফিরে আসবে। সুতরাং জাহান্নামই যেন তার আশ্রয় ও ফেরার জায়গায় পরিণত হবে। একটি কিরাআত এই আছে অমাওয়া-হুমুন না-র। অর্থাৎ নরকই তাদের ঠিকানা। কাতাদাহ বলেন, এই হাবিয়া হল আগুন, এটাই তার থাকবার জায়গা। সেজন্য আল্লাহ্ বলেছেন যে, হাভিয়া জ্বলন্ত আগুন। আশ্আস্ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, কোন মোমেন যখন মারা যায় তখন তার রূহকে মোমেনদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা বলে, নিজের ভাইকে একটু আরাম দাও। সে দুন্য়্যায় দুঃখ কষ্টে ছিল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করে যে, অমুকের অবস্থা কি? সে বলে যে, সে তো মারা গেছে। সে তোমাদের নিকট আসেনি? তারা বলে, তাকে তার মা হাভিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (ইবনে জারীর)। ইবনে মারাদেঅয়হে এই হাদীসটিকে আনাস ইবনে মালেক থেকে মরফূভাবে আরো

http://islaminonesite.wordpress.com

বিশদরূপে বর্ণনা করেছেন। আমি এই হাদীসটি "সিফাতুন না-র" নামক কেতাবে উল্লেখ করেছি। আ-জারানাল্লা হু মিনহা বিমান্নিহী অকারামিহী।

হা-মিয়াহ এর অর্থ প্রচণ্ড গরম, তীব্র জ্বলনশীল ও খুবই যন্ত্রণাদায়ক। আবু হোরায়রার হাদীসে নবী (সঃ) বলেন, আদম সন্তান যে আগুন জ্বালায় তা জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের ১ ভাগ। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ঐ আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, ঐ আগুন এই আগুনের চেয়েও ৬৯ গুণ বেশী (বোখারী ও মুসলিম)। ইমাম আহমাদও এই রেওয়ায়াতটি মরফুভাবে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে ইমাম মুসলিমের শর্তও বিদ্যমান। ইয়াহইয়া ইবনে জা'দাহ বলেন, তোমাদের এই আগুন দোযখের ৭০ ভাগ আগুনের একটা অংশ এবং একে দুবার সমুদ্রে ধোওয়া হয়েছে। যদি একে ধোওয়া না হত তাহলে এর দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন রকম উপকার পেত না (মুসনাদে আহমাদ,) এই রেওয়ায়াতটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী, কিন্তু তাঁরা একে বর্ণনা করেননি। আবু হোরায়রার মরফু শব্দ এই যে, এই আগুন জাহান্নামের ১০০ ভাগের ১ ভাগ। ইমাম আহমাদ এটাকে মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাঁর অন্য শব্দ এই যে, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের তুলনায় কেমন? ঐ আগুন তোমাদের এই আগুনের ধোঁয়ার চেয়ে ৭০ গুণ কালো (তাবারানী)। তৃতীয় শব্দ এই যে, ঐ আগুনকে এক হাযার বছর জ্বাল দেওয়া হয়, ফলে তা লাল হয়ে যায়। তারপর আবার তাকে এক হাযার বছর জ্বাল দেওয়া হয়, ফলে তা সাদা হয়ে যায়। এরপর পুনরায় তাকে এক হাযার বছর জ্বাল দেওয়া হয়, ফলে তা কালো হয়ে যায়। এখন তা ঘুটঘুটে কালো ও বধিরে পরিণত (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)। এই বক্তব্যই আনাস ও ওমার রাযিয়াল্লা-হো আনহুমার হাদীসেও মরফুভাবে এসেছে। তার চতুর্থ শব্দ এই যে, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম যার আযাব হবে তার পায়ে দুটো খড়ম বা জুতো পরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তার মাথার মগজ টগবগ কোরে ফুটবে (আহমাদ)। বোখারী ও মুসলিমে আছে যে, নবী (সঃ) বলেন, জাহান্নামের আগুন একদা তার প্রভুর কাছে অভিযোগ করে হে পরওয়ারদেগার! আমার কিছু অংশ কিছু অংশকে খেয়ে নিয়েছে। তখন আল্লাহ তাকে ২ বার শ্বাস নেবার অনুমতি দিলেন— (১) শীতকালে (২) গ্রীষ্মকালে। সুতরাং শীতকালে তোমরা যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব কর এবং গরমকালে যে প্রচণ্ড গরম অনুভব কর তা ওরই ফল। বোখারী ও মুসলিমে এও আছে যে, যখন খুবই গরম পড়ে তখন তোমরা ঠাণ্ডা কোরে অর্থাৎ একটু দেরী কোরে যোহরের নামায পড়ো। কারণ, ঐ প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের প্রচণ্ড গরমের তাপ।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, কা-রিআহ্‌ কিয়ামতের নাম। কারণ, সে মানুষের দিলের মধ্যে পেরেশানী দ্বারা ঠকঠক কোরে আঘাত হানে এবং আল্লাহ্‌র দুশমনকে আযাবের ভয় দেখায়। ফারা-শ সেই পতঙ্গ যা চেরাগের ওপরে ঝাঁপ

দিয়ে নিজের জান দেয়। আবু ওবায়দা প্রমুখ একথা বলেন। ফার্রা বলেন, মশা ও পঙ্গপাল প্রভৃতিকে ফারাশ বলে। মাব্‌সুস এর অর্থ বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ। মানুষকে ফারাশের সাথে উপমা দেওয়ার মধ্যে কয়েক রকম রূপক আছে (১) রেগে যাওয়া (২) বিক্ষিপ্ত হওয়া (৩) একের উপরে আরেকজনের সওয়ার হওয়া (৪) সংখ্যায় অধিক হওয়া (৫) দুর্বল ও হীন হওয়া (৬) সব দিক থেকে ডাকনেওয়ালার ডাকে সাড়া দেওয়া (৭) আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। তারপর বলা হয়েছে যে, পাহাড়গুলো ধুনিত রংবেরং পশমের মত চুরমার হয়ে যাবে। এহ্‌ন্ বিভিন্ন প্রকার রঙে রাঙানো রঙিন পশমকে বলে।

মাওয়া-যীন মওযুন এর বহুবচন; যার ভাবার্থ আমল, যাকে হিসাবের পাল্লায় ওজন করা হবে। ফার্রা প্রমুখ একথা বলেন। কেউ বলেন, মাওয়াযীন মীযানের বহুবচন। মীযান হল সেই যন্ত্র যাতে আমলনামা ওজন করা হবে। অথবা মাওয়াযীনের ভাবার্থ দলীল ও প্রমাণাদি। যাহোক যার নেক আমল ও সৎকাজ ভারী প্রমাণিত হবে সে পবিত্র ও পছন্দনীয় জীবন পাবে। রাযিয়াতুন এমন একটি শব্দ যার মধ্যে জান্নাতের সমস্ত ন্যামত এসে যায়। আর যার বদ আমল ও অসৎকাজ নেক আমলের চেয়ে বেশী হবে, কিংবা নেক আমল মোটেই থাকবে না তার বাসস্থান জাহান্নাম হবে। জাহান্নামের নাম "মা" রাখা হয়েছে। কারণ, বাচ্চা ছেলে যেমন নিজের মায়ের কাছে আসে সেইরূপ জাহান্নামীরা জাহান্নামের কাছে আসবে। হাভিয়া জাহান্নামের ৭ম স্তরের নাম। এই স্তরটা সবচেয়ে শেষ তবক। ঐ তবকের নাম হাভিয়া এইজন্য যে, ওর গভীরতা শেষ হওয়ার পরও জাহান্নামীরা ওর ভেতরে গড়াতে থাকবে। মানাভী বলেন, যার পুন্য পাপের চেয়ে বেশী হবে সে জান্নাতে (স্বর্গে) যাবে এবং যার নেকী ও বদী সমান সমান হবে তার হিসাব সহজে নেওয়া হবে। আর যার গোনাহ নেকীর চেয়ে বেশী হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে। কিংবা তার শাফাআত (মুক্তির জন্য সুপারিশ) করা হবে। এখানে এই আয়াতে নেকী ও বদী বা পুণ্য ও পাপ সমান সমান হবার কথা বলা হয়নি।

পরিশেষে ভয় দেখানো ও পিলে চমকানোর জন্য বলা হয়েছে—তুমি কি জান হাভিয়া কি জিনিষ? তা হল এমন এক আগুন যার গরমের প্রখরতা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে এবং তীব্রতার দিক দিয়ে যা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আল্লাহ তাঁর রহমে ও দয়ায় আমাদেরকে ঐ আগুন থেকে বাঁচান—আমিন!!

সংযোজন

এই সূরাতে ৮টি আয়াত, ৩৬টি শব্দ এবং ১৫০টি হরফ আছে (ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৬০ পৃষ্ঠা)। আরবীতে কারাআ শব্দের অর্থ দরজা বা কোন জিনিষে ঠকঠক কোরে আঘাত করা। এই সূরার বক্তব্য মানুষের দিলে এবং কানে আঘাত হানে বলে সূরাটির নাম কা-রিআহ রাখা হয়েছে (মাহ্‌ আলা-মিল মোফাসসিরীন,

http://islaminonesite.wordpress.com

৩০ খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)। এখানে ভাবার্থে কারিআর অর্থ কিয়ামতের মহাবিপদ। সেদিন ঐ বিপদের কারণে মানুষ পঙ্গপালের ন্যায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এবং ধুনিত রঙীন তুলোর ন্যায় পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ হোয়ে উড়তে থাকবে। এমত অকল্পনীয় পরিস্থিতিতে কেবল সেই ব্যক্তি আরামে থাকবে যার সৎকাজের পাল্লা ভারী হবে। এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরকালে মানুষ ও জিনের ভালমন্দ আমল ওজন করা হবে। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করলে বোঝা যায় যে, আমলের ওজন দুবার হবে। একবারের ওজনে মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। তখন মোমেনের পাল্লা ভারী এবং কাফেরের পাল্লা হাল্কা হবে। তারপর মোমেনদের মধ্যে উত্তম আমল এবং অনুত্তম আমলের পার্থক্য করার জন্য দ্বিতীয়বার ওজন হবে। এই সূরা দ্বারা প্রথম ওজনের কথা বোঝা যায়। যাতে প্রত্যেক মোমেনের পাল্লা ঈমানের কারণে ভারী হবে তার আমল যেমনই হোক না কেন এবং কাফেরের পাল্লা ঈমান না থাকার কারণে হাল্কা হবে যদিও সে কোন নেক আমলও করে থাকে (মাআ-রিফুল কুরআন, ৮ম, খণ্ড, ৮০৭ পৃষ্ঠা)।

ওজন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে সবার সামনে আমার উম্মতের একজন লোককে আনাবেন। অতঃপর তার সামনে ৯৯টা খাতা খুলে জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি এগুলো অস্বীকার কর কি? এগুলো লেখার ব্যাপারে ফেরেশ্‌তা তোমার উপরে কোন যুলম করেছে কি? সে বলবে, না, হে প্রভু! তারপর তিনি বলবেন, এ ব্যাপারে তোমার কাছে কোন ওজর আছে কি? সে বলবে, না, হে পরওয়ারদেগার! অতঃপর আল্লাহ বলবেন, হাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজকে তোমার উপরে কোন রকম যুলম হবে না। অতঃপর একটি চিরকুট বের করা হবে, যাতে লেখা থাকবে—আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ অআন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অরসূলুহু। অতঃপর তিনি বলবেন, এটাকে ওজন করাও। তখন বান্দা বলবে, প্রভুগো! ঐসব বিরাট বিরাট খাতার সামনে এই চিরকুটটি কি হবে? আল্লাহ বলবেন, তোমার উপরে যুলম হবে না। অতঃপর একটি পাল্লায় খাতাগুলো এবং অপর পাল্লায় চিরকুটটি রাখা হবে। ফলে খাতাগুলোর পাল্লাটা হাল্কা হবে এবং চিরকুটের পাল্লাটা ভারী হোয়ে পড়বে। কারণ, আল্লাহ্‌র নামের সাথে কোন জিনিষ ভারী হতে পারে না (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা কুরতুবী বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আমল ওজন হবে না। কারণ, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। এইরূপ যাদেরকে বিনা হিসাবে জাহান্নামের দিকে হাঁকানো হবে তাদের জন্যও দাঁড়িপাল্লার প্রয়োজন হবে না। (তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ৩৩১ পৃষ্ঠা)।

যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তাদের মা হবে হাভিয়া। হাভিয়া শব্দটি

هوى، يهوى শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ উপর থেকে পড়া। হাদীসে আছে যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে ৭০ বছর পড়তে থাকবে। ছোট শিশু যেমন মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়, তেমনি জাহান্নামীদের আশ্রয় স্থল হাভিয়া বলে ওকে তাদের মা বলা হয়েছে। একটি বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সূরা কা-রিআহ পড়ে তার বরকতে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিনে তার পাল্লাকে ভারী করে দেবেন (তফসীরে আবুস সউদ, আমপারা, ৫২০, ৫২১ পৃষ্ঠা)।

আরবী মা-হিয়াহ ماهيه শব্দটির আসল হল ماهى। হাভিয়ার শব্দটির সাথে ছন্দ মিল কোরে ওয়াক্‌ফ করার জন্য "হিয়ার" শেষে একটি হা-য়ে সাকৃতা বাড়ানো হয়েছে (তফসীরে বাগাভী, আমপারা, ২৮১ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে আ-দিয়া-ত

এই সূরাতে ১১টি আয়াত আছে। ইবনে মসউদ, জাবের, হাসান একরিমা ও আতা প্রমুখ মোফাসসিরীনের মতে সূরাটি মক্কী এবং ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক ও কাতাদার মতে সূরাটি মাদানী। হাসান মরফুভাবে বলেছেন যে, ইযা-যুল্‌যিলা তিল আরযো অর্ধেক কোরআন এবং সূরা আ-দিয়া-ত অর্ধেক কোরআনের সমান। এই রেওয়ায়েতটি মুরসাল (আবু ওবায়দ)। এই হাদীসটিকে ইবনে আব্বাসও মরফুভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার সাথে তিনি এতটা বাড়িয়ে বলেছেন যে, কুল হুআল্লা-হু কোরআনের ৩ ভাগের ১ ভাগ এবং কুল ইয়া-আইয়োহাল কা-ফিরূন কোরআনের ৪ ভাগের ১ ভাগ। মুহাম্মাদ ইবনে নাস্‌র এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ احْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ
لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝١٠
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

http://islaminonesite.wordpress.com

বাংলা উচ্চারণ

১। অল্‌আ-দিয়া-তি যব্‌হা। ২। ফাল্‌মুরিয়া-তি কাদ্‌হা। ৩। ফলমুগীরা-তি সুবহা। ৪। ফাআসার্‌না বিহী নাক্‌আ। ৫। ফা অসাত্‌না বিহী জাম্‌আ। ৬। ইন্নাল ইন্‌সা-না লি রববিহী লাকানুদ। ৭। অইন্নাহূ আলা-যা-লিকা লাশাহীদ। ৮। ওয়া ইন্নাহূ লিহুব্‌বিল খাইরি লাশাদীদ। ৯। আফালা ইয়ালামু এযা বুসিরা মা-ফিল কুবুর। ১০। অহুস্‌সিলা মা-ফিস্‌ সুদুর। ১১। ইন্না রব্‌বাহুম বিহিম্‌ ইয়াওমায়িযিল্‌ লাখাবীর॥

তরজমা

১। হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুতবেগে অভিযানকারী। ২। অতঃপর (ঐ দৌড়বার সময় পায়ের লাল ঠুকে) স্ফুলিঙ্গ উদগমকারী। ৩। অনন্তর অতিভোরে (দুশমনের উপরে) আচমকা হামলাকারী। ৪। তারপর (ঐ হামলার সময়) যারা ধূলা উড়ায়। ৫। অতঃপর যারা শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে যায় (এইসব গুণে গুণান্বিত জিহাদকারী) ঘোড়ার কসম! ৬। নিশ্চয়ই মানুষ তাঁর প্রভুর নেমকহারাম। ৭। এবং নিঃসন্দেহে সে নিজেই তার (এই নেমকহারামীর) সাক্ষী। ৮। এবং নিশ্চয়ই সে মালধনের প্রতি খুবই আসক্ত। ৯। তাহলে সে কি জানে না যে, কবরসমূহের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো যখন ওঠান হবে। ১০। এবং মানুষের দিলের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্ত যখন প্রকাশিত হবে। ১১। তখন নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক তাদের সেদিনকার সমস্ত বিষয়ের খবর অবগত থাকবেন!

তফসীর

ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তাআলা ঘোড়ার কসম খেয়েছেন যখন তারা আল্লাহ্‌র পথে দৌড়ায় ও হাঁপায় এবং পাথরের সাথে তাদের পায়ের লাল ঘর্ষণে আগুন বেরোয়। আর তারা ভোরের বেলায় হামলা চালায়। যেমন নবী (সঃ) অতি ভোরে দুশমনদের উপর আক্রমণ করতেন এবং আযানের শব্দের উপর কান রাখতেন। যখনই তিনি আযান শুনতে পেতেন তখনই হামলা বন্ধ করে দিতেন। আরোহীদের হামলা যখন হয় তখন ধূলো উড়ে এবং সওয়ারীরা তখন শত্রুদের সৈন্যদলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবদুল্লা ও আলী বলেন আ-দিয়া-ত এর অর্থ উট। ইবনে আব্বাস বলেন, ঘোড়া। আলী এই কথা শুনে বললেন, বদরের যুদ্ধের সময় আমাদের কাছে ঘোড়া কোথায় ছিল? তখন তো একটি ছোট্ট বাহিনী ছিল যার মধ্যে মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল, ১টি যোবায়েরের নিকট এবং অপরটি মিকদাদের নিকট। অতএব আ-দিয়া-ত এর অর্থ আরফা ও মোযদালফা থেকে মিনার দিকে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি। একথা শুনে ইবনে আব্বাস তাঁর মত প্রত্যাহার করেন। ইবরাহীম ও ওবায়দ ইবনে ওমায়র প্রমুখ একটি দল হযরত আলীর

মতে মত দেন এবং অন্য একটি দল ইবনে আব্বাসের সাথে একমত হোয়ে বলেন যে, 'আদিয়াতের' অর্থ ঘোড়া; উট নয়। ইবনে জরীরেরও এই মত। ইবনে আব্বাস ও আতা বলেন জন্তুদের মধ্যে একমাত্র ঘোড়া ও কুকুর ছাড়া আর কোন জানোয়ার হাঁপায় না। উহ্‌ উহ্‌ করাকে যবহুন বলে।

অধিকাংশ মোফাসসিরীন বলেন, আগুন বের করার ভাবার্থ পায়ের লাল ঠোকা কিংবা যুদ্ধের অবস্থা চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। একথাটি কাতাদার। ইবনে আব্বাস ও মোজাহেদ বলেন, মানুষের চক্রান্ত। কেউ বলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে রাতে নিজ ঘরে আগুন জ্বালানো।

মুগীরাতের অর্থ আল্লাহ্‌র রাহে সকাল বেলায় আক্রমণকারী বা হঠাৎ হামলাকারী। যারা আদিয়াতের অর্থ উট বলে তাদের মতে মুগীরার অর্থ সকাল বেলায় মোযদালফা থেকে মিনার দিকে যাওয়া। ধূলো উড়ার অর্থ সেই সব জায়গা যেখানে হজ্জের সময় বা যুদ্ধের সময় ধূলো ওড়ে। ইবনে আব্বাস, আতা, একরেমা, কাতাদাহ ও যাহ্‌হাকের মতে জাম্‌উন এর অর্থ দুশমনদের লস্কর। কিংবা এর অর্থ এই যে, ঐঘরে সবাই ঢুকে পড়ে। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী (সঃ) একদিন একদল আরোহী বাহিনী পাঠান। এক মাস তার খবর পাওয়া যায় নি। তখন এই সূরা নাযেল হয়। অর্থাৎ তারা আয়াতে বর্ণিত কাজে রত আছে।

মানুষকে আল্লাহ নাশোক্‌র ও অকৃতজ্ঞ বলেছেন—এটা তার কসমের উত্তর। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্‌র ন্যামত অস্বীকারকারী। কানুদ এর অর্থ কাফুর বা অকৃতজ্ঞ। এ উক্তি ইবনে আব্বাস, মোজাহেদ, ইবরাহীম নাখয়ী, আবুল জাওযা, আবুল আলিয়াহ, আবুয যোহা, সায়ীদ ইবনে জোবায়ের, মোহাম্মাদ ইবনে কায়স, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, হাসান, রবী ইবনে আনাস ও ইবনে যায়দের। হাসান বলেন, কানুদ সেই, যে ব্যক্তি বিপদ গণনা করে এবং আল্লাহ্‌র ন্যামতগুলোকে ভুলে বসে থাকে। আবু ওমামার হাদীসে বলা হয়েছে কানুদ সেই, যে একা খায় এবং নিজের চাকরকে মারপিট করে ও নিজের মেহমানকে কিছু দেয় না (ইবনে আবী হাতেম) কিন্তু এর সনদ দুর্বল। ইবনে জরীরও মওকুফভাবে এটাকে রেওয়ায়াত করেছেন।

কাতাদাহ ও সুফয়্যান বলেন, আল্লাহ মানুষের শাহীদ বা সাক্ষী। মোহাম্মাদ ইবনে কাব কোরাযী বলেন, "হু" যমীর বা 'সে' সর্বনামের বিশেষ্য পদ ইনসান। অর্থাৎ মানুষের অবস্থায়ই সাক্ষ্য দেয় যে, সে নাশোক্‌র ও কৃতঘ্ন। কারণ, তার কাজকর্ম ও কথাবার্তাই এর প্রমাণ দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন:—

(মা-কা-না লিল মুশরিকীনা আঁই ইয়ামুরু মাসা-জিদাল্লা-হে শা-হিদীনা আলা-আন-ফুসিহিম বিল কুফরি) অর্থাৎ মোশরেকদের কাজ নয় মসজিদ আবাদ করা। কুফরির কারণে তারা নিজেরাই এর সাক্ষী।

অতঃপর মানুষকে মাল ও ধনপ্রিয় বলা হয়েছে। এর দুটি অর্থ আছে। (১)

http://islaminonesite.wordpress.com

মালের প্রতি সে খুবই আসক্ত। (২) লোভী ও কৃপণ। এ দুটো অর্থই ঠিক। তারপর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং আখেরাতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির উৎসাহ দিয়ে পরিণামের প্রতি হুশিয়ারী করেছেন এবং যেসব অবস্থা আগামীতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন: মানুষ কি জানে না যে, কবরসমূহ থেকে মোর্দাদেরকে যখন বের করা হবে এবং মানুষের দিলের কথাগুলো যখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন তার দশা কি হবে? ইবনে আব্বাস বলেন, অন্তরের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টবস্তুর ও আদম সন্তানের আমলের খবর রাখবেন এবং তাদের প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী পুরোপুরি বদলা দেবেন। তিনি কারো ওপর শষ্য পরিমাণও যুলম করবেন না।

ফতহুল বায়া-নে বলা হয়েছে আ-দিয়া-ত আ-দিয়ার বহুবচন। আ-দিয়াহ তাকে বলে যে খুব দ্রুত দৌড়ায় এবং খুব জলদি চলে। এখানে এর অর্থ হল সেই ঘোড়া, যা যুদ্ধের সময় দুশমনের দিকে দৌড়ায়। যবহুন দ্রুতবেগে দৌড়ানোকে বলে। এটা চলার একটি প্রকার। কেউ বলেন, সকাল বেলায় হামলার সময় ঘোড়ার পায়ের আওয়াযকে যবহুন বলে। ফার্রা বলেন, দৌড়বার সময়ে হাঁপানোর আওয়াযকে বলে, কিংবা বুকের আওয়াযকে। তবে এটা চিঁহি চিঁহি শব্দ নয়। জমহুর (অধিকাংশ) ওলামা বলেন, আদিয়াত এর অর্থ ঘোড়া। ওবায়দ ইবনে ওমায়র, মোহাম্মাদ ইবনে কাব ও সুদ্দী বলেন, উট। ভাষাবিদরা বলেন, প্রকৃত 'যবহ' শিয়ালের মধ্যে হয়, ঘোড়ার জন্য ওটা রূপক। আলী বলেন, ঘোড়ার যবহ চিঁহি চিঁহি করা এবং উটের যবহ তিড়িংবিড়িং করা। উপরোক্ত গুণগুলো উটের তুলনায় ঘোড়ার মধ্যে বেশী বিদ্যমান। সেজন্য অধিকাংশ বিদ্বানের মতে আদিয়াতের ভাবার্থ ঘোড়া; উট নয়। গাযীদের ঘোড়ার আল্লাহ্‌র কসম খাওয়াটা ঘোড়ার ও আল্লাহ্‌র রাহে পাহারা দেবার ফযীলত প্রমাণ করে। কারণ, ঘোড়ার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার উভয়ের ফায়দা আছে। যেমন পারিশ্রমিক ও লুটের মাল (গণীমত)।

নাক্‌উন ধুলোকে বলে। এই অর্থটাই এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আওয়াযের অর্থ ঠিক নয়। মোহাম্মাদ ইবনে কাব বলেন, মিনা ও মোযদালফার মাঝখান 'নাক্‌উন'। সঠিক কথা এই যে, নাক্‌য়ের অর্থ ধুলোমাটি, যা ঘোড়ার দৌড়বার ফলে উড়ে থাকে। এই ঘোড়াগুলো শত্রুদের দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ইনসান বলতে সব মানুষ নয়, বরং কিছু মানুষ অর্থাৎ কাফের। কানুদ এর অর্থ ন্যামতের (আল্লাহ্‌র অবদানের) অকৃতজ্ঞ। এই অর্থ এখানে অধিক সংগত। অধিকাংশ আলেম বলে, ইন্নাহু আলা যা-লেকার মধ্যে 'হু' যমীর বা সে সর্বনামের বিশেষ্য পদ হল আল্লাহ। হাসান প্রমুখ বলেন, আল্লাহ নয়, বরং ইনসান। একথাটাই বেশী প্রাধান্যযোগ্য জমহুরের কথার চেয়ে। তারপর আল্লাহ বলেন যে, মালধন তলাশ করা ও তা হাসেল করার ব্যাপারে মানুষ খুবই আসক্ত। মালের পেছনে তার প্রাণও চলে

যায়। এখানে খায়র এর অর্থ মাল। যেমন অন্যত্রে আল্লাহ বলেন, ইন তারাকা খায়রানিল অসিয়্যাতু—অর্থাৎ যদি সে কোন মাল ছেড়ে যায়। কেউ বলেন, কৃপণতা। কিন্তু প্রথমটাই বেশী ঠিক। ইবনে যায়দ বলেন, আল্লাহ মালের নাম 'খায়র' রেখেছেন। পক্ষান্তরে সে হল শার বা খারাপ। এর কারণ এই যে, মানুষ মালকে ভাল মনে করে।

মানুষ কি জানে না যে, কবরসমূহ থেকে কবরবাসীকে যখন তোলা হবে এবং মানুষের দিলের মধ্যে যে ভালমন্দ রহস্য আছে তা ফাঁস হোয়ে যাবে তখন সেদিন তার প্রতিপালক ওসব বিষয়ের খবর রাখবেন। কোন বিষয়ই সেদিন লুকানো থাকবে না। সবারই বদলা আল্লাহ দিয়ে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন : أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ (উলা-য়িকাল্লাযীনা ইয়ালামুল্লা-হু মা-ফী কুলুবিহিম) অর্থাৎ এরা তারাই যাদের দিলের খবর আল্লাহ জানেন। ইমাম রাযী বলেন, এই আয়াতটি এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত অনুপরমাণুরও জ্ঞানী। কারণ, তিনি সমস্ত জিনিষের অন্তর্নিহিত অবস্থার সাথে নিজের জ্ঞানকে ঐ দিনে নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং ইলমে জুযয়ী বা ছোটখাটো জিনিষের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানের অস্বীকারকারী কাফের হবে। আমি বলছি, আল্লাহ্‌র ইল্‌মে জুয়্‌য়ীর জ্ঞানী হওয়া কোরআনের বহু আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এটাই আহলে সুন্নাতের সমস্ত সালাফ (পূর্ববর্তী ওলামা) ও খালাফের (পরবর্তী বিদ্বানদের) আকীদা। যে কেউ একথা বিশ্বাস করবে এবং বলবে যে, আল্লাহ তাআলা কেবল কুল্লিয়াতের (কোন বস্তুর সমগ্রের) জ্ঞানী এবং জুয়্‌য়ীয়াত বা কোন বস্তুর প্রত্যেক অংশের জ্ঞানী নয় সে কাফের এবং তার জান ও মাল নষ্ট করা হালাল।

সংযোজন

এই সূরাতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ এবং ১৬৩টি বর্ণ আছে (তফসীর ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার প্রথম ৫টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা জেহাদকারীদের ঘোড়ার কসম খেয়ে ৬ষ্ঠ আয়াতে বলেন যে, মানুষ তার প্রভুর নেমকহারাম। কারণ, মানুষ তার পোষা ঘোড়াকে সামান্য ঘাসপানি খেতে দেয়। তার বিনিময়ে ঐ ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে তার মনিবের এশারায় নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান কোরে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও কখনো সে তার মনিবকে জিতিয়ে দেয়। কখনো সে নিজে আঘাতে জর্জরিত হোয়েও মনিবকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনে ইত্যাদি ঝুকি নেওয়া কাজ করে। কিন্তু ঐ ঘোড়ার মোকাবেলায় মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষকে আল্লাহ তাআলা সবরকম সম্পদ দেওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ তার প্রভু আল্লাহ্‌র সম্পদের শুকরিয়া আদায় না কোরে নেমকহারামের পরিচয় দেয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

ঘোড়ার কসম খাওয়ার কারণ এই যে, ঘোড়ার মধ্যে কতিপয় এমন গুণ আছে যা অন্য জন্তুর মধ্যে নেই। যেমন হামলা করা, পিছু হটা, মনিবের ইঙ্গিত মত চলা এবং পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া গাজীদের ঘোড়ার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই ফায়দা আছে। এই কসম খাওয়ার মধ্যে একথার প্রতিও এশারা রয়েছে যে, মানুষ যেন জেহাদের জন্য ঘোড়া পোষে (তফসীরে কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)। ঘোড়া পোষা সম্পর্কে নবী (সঃ) বলেন :- اَلْبَرَكَةُ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ অর্থাৎ ঘোড়ার কপালে বরকত নিহিত আছে (বুখারী, মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় আছে :— الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الاجر و الغنيمة অর্থাৎ ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তা হল পুণ্য এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য (মুসলিম, মিশকাত, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)।

৮ম আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, মানুষ মালধনের প্রতি খুবই আসক্ত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মালের আসক্তি নিন্দনীয় কাজ। একথা ঠিক যে, মাল মানুষের প্রত্যেক প্রয়োজনেরই ভিত্তি। তাই প্রয়োজন মত মালধন উপার্জন করা শরীআত অনুযায়ী বৈধ। কিন্তু মালের প্রতি এত আসক্তি বৈধ নয়, যার ফলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় এবং হারাম ও হালালের পার্থক্য উঠে যায়। রোগী যেমন ওষুধ খায় এবং অপারেশান করায়, কিন্তু তার অন্তরে ওষুধের ও অপারেশনের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। তেমনি মানুষ প্রয়োজন মত মাল কামাই করতে পারে, কিন্তু তার মোহে উন্মত্ত হতে পারবে না। এ ব্যাপারে মওলানা রুমী কি সুন্দর কথা বলেছেন آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থাৎ পানি যখন নৌকার নীচে থাকে তখন তা নৌকার সহায়ক হয়। কিন্তু এই পানি যখন নৌকার ভেতরে ঢুকে পড়ে তখন নৌকাকে ডুবিয়ে দেয়। এইরূপ মাল যতক্ষণ মনের নৌকার আশেপাশে থাকে ততক্ষণ উপকার করে। কিন্তু যখন সে মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন তা ধ্বংস করে (মাআ-রিফুল কোরআ-ন, ৮ম খণ্ড, ৮০৫ পৃষ্ঠা)।

শেষ তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিনে মানুষ যখন কবর থেকে উঠবে এবং তাদের মনের রহস্যগুলো যখন ফাঁস হোয়ে পড়বে তখন এইসব কাজের কর্তা আল্লাহর সামনে সে কি জওয়াব দেবে? তাই মানুষ যেন এই দুনিয়াতে মালের প্রতি আসক্ত না হয় এবং স্বীয় প্রভুর নেমকহারামী না করে। বরং সে যেন প্রয়োজনীয় মাল উপার্জন করে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে।

সূরায়ে যাল্‌যালাহ্

এই সূরাতে ৮টি বা ৯টি আয়াত আছে। ইবনে আব্বাস ও কাতাদার মতে সূরাটি মাদানী এবং ইবনে মাসউদ, আতা ও জাবেরের মতে মক্কী। ইবনে ওমার

বলেন, একদা এক বুড়ো লোক এসে বললো: হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দাও। তিনি বললেন, আপনি আলিফ-লাম-রা-ওয়ালা তিনটি সূরা পড়ুন। লোকটি বললো, আমার বয়স অনেক হয়েছে এবং দিল শক্ত হয়ে গেছে, আর যবানও মোটা হয়ে গেছে (অতএব আমি অত বড় বড় সূরা পড়তে পারবো না)। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আপনি হা-মীম-ওয়ালা ৩টি সূরা পড়ুন। লোকটি আবার ঐ কথাই বললো, যা আগে বলেছিল। এবার নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আপনি ৩টি মোসাববিহাত (যে সূরার শুরুতে সাব্বাহা বা ইয়োসাব্বেহা আছে) সূরা পড়ুন। লোকটি এবারও আগের মত জওয়াব দিল এবং বললো, আমাকে সবদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন একটি সূরা শিখিয়ে দাও। তখন নবীজী তাকে "ইযা-যুলযিলাতিল আরযু" পুরো সূরাটি শিখিয়ে দিলেন। সূরাটি শেখার পর লোকটি বললো, সেই আল্লাহর কসম! যিনি তোমাকে সত্য নবী কোরে পাঠিয়েছেন—আমি এর চেয়ে বেশী আর কিছুই কোরবো না। এই কথাটি শুনে নবীজী বললেন, আফ্‌লাহার রুঅয়াজিলু, আফ্‌লাহার রুঅয়াজিলু—লোকটি সফল হল, লোকটি নাজাত পেল (মোসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, মোহাম্মাদ ইবনে নাস্‌র, তাবারানী, ইবনো মারদোআয়হে, বায়হাকী ও হাকেম)। ইমাম হাকিম এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আনাসের হাদীসে নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই সূরাটি পড়ে, তার ঐ পড়াটা অর্ধেক কোরআনের সমান হয় এবং যে "কুল হুআল্লা-হু আহাদ" পড়ে তার ঐ পড়াটা কোরআনের ৩ ভাগের ১ ভাগের সমান হয়। আর যে "কুল ইয়া ইয়া-আইয়ুহাল কা-ফিরূন" পড়ে তার ঐ পড়াটা কোরআনের ৪ ভাগের ১ ভাগের সমান হয় (তিরমিযী, বায়হাকী ও ইবনো মারদোআয়হে)। এই বক্তব্যটি তিরমিযী, ইবনুয্ যারীর, মোহাম্মাদোবনো নাস্‌র, বায়হাকী ও হাকেমে বর্ণিত আনাস থেকে মরফুভাবে রেওয়ায়াতকৃত হাদীসেও এসেছে। ইমাম হাকেম এই হাদীসটিকে সহীহ এবং তিরমিযী একে গরীব বলেছেন। এই সূরাটি কোরআনের ৪ ভাগের ১ ভাগের সমান হওয়ার কথা অনেক হাদীসে আছে।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ ثَمَانِيْ اٰيَاتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে পড়া শুরু করছি)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ
الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٤ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝٥
يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

http://islaminonesite.wordpress.com

বাংলা উচ্চারণ

১। ইযা-যুলযিলাতিল আরযু যিলযা-লাহা। ২। অআখ্-রাজাতিল আরযু আস্-কা-লাহা। ৩। অকা-লাল ইন্সা-নু মা-লাহা। ৪। ইয়াওমায়িযিন্ তুহাদ্দিসু আখ্বা-রাহা। ৫। বিআন্না রব্বাকা আওহা-লাহা। ৬। ইয়াওমায়িযিই ইয়াস্দুরুন্ না-সু আশতা-তা। ৭। লিইয়ুরাও আ'মা-লাহুম। ৮। ফমাঁই ইয়ামাল মিস্কা-লা যার্রাতিন খায়রাঁই ইয়ারাহ। ৯। অমাঁই ইয়ামাল মিস্কা-লা যার্রাতিন শাররাঁই ইয়ারাহ।

তরজমা

১। যমীন যখন ভূমিকম্পের মত কাঁপতে থাকবে। ২। এবং (ঐ ভূমিকম্পের ফলে) যমীন যখন তার ভেতরকার বোঝাগুলোকে বের কোরে ফেলে দেবে। ৩। এবং (ঐ সব তাজ্জব ব্যাপার দেখে) মানুষ যখন বলবে যে, এর কি হল? ৪। সেদিন সে তার সমস্ত খবর বলতে থাকবে। ৫। কারণ, তোমার প্রভু তাকে ঐ সংবাদ পরিবেশনের হুকুম দেবেন। ৬। সেদিন মানুষ দলে দলে ফিরতে থাকবে। ৭। যাতে কোরে তাদেরকে তাদের কৃত কর্মগুলো দেখানো যায়। ৮। সুতরাং যে ব্যক্তি (নিজ জীবনে) একটি অনুপরমানুর মত কোন ভাল কাজ করবে সে-ও সেটা দেখবে। ৯। এবং যে ব্যক্তি একটি অনুপরমানুর মত কোন অন্যায় কাজ করবে সে-ও সেটা দেখবে।

তফসীর

ইবনে আব্বাস বলেন, যমীন নীচে থেকে কাঁপবে এবং তার ভেতরে যেসব মরা লোক আছে তাদের লাশগুলোকে সে বের কোরে ফেলে দেবে। অনেক সালাফের মত এটাই। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্রে বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

(ইয়া-আইয়্যুহান্না-সুত্তাকু রব্বাকুম ইন্না যাল্যালাতাস্ সা-আতি শাইয়ুন আযীম) অর্থাৎ মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর। কারণ, কিয়ামতের কম্পন এক ভয়ানক জিনিষ। অন্যত্রে আছে— অযিযাল্ আরযু মুদ্দাত অআল্কাত মা-ফীহা অতাখাল্লাত—অর্থাৎ যমীনকে যখন প্রশস্ত করা হবে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোকে যখন সে বের কোরে ফেলে দেবে ও একাকী হয়ে যাবে। আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদীসে আছে যে, যমীন তার কলিজার টুকরাকে সোনা চাঁদির থামের মত আকারে বের কোরে ফেলে দেবে। সে সময় এক হত্যাকারী এসে বলবে যে, এরই জন্য আমি অমুককে হত্যা করেছি। রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী একজন আসবে এবং বলবে যে, এরই কারণে আমি রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। চোর এসে বলবে যে, এরই জন্য আমার হাত কাটা গেছে। তারপর সবাই

সেখান থেকে চলে যাবে এবং কেউই কিছু নিয়ে যাবে না। বরং মানুষ তখন যমীনের কীর্তি দেখে বলবে যে, এর কি হল? এ তো ধীর স্থির ও অটল ছিল। তাহলে এখন সে নড়ে চড়ে কেন? মানুষ জানে না যে, আল্লাহ্র হুকুম এসেছে, যার ফলে যমীনের ঐ দশা হয়েছে। সে তখন আগেকার ও পরের সমস্ত মরা লোকদের লাশকে নিজের পেট থেকে বের কোরে ফেলে দেবে। মানুষ তখন বলবে যে, এর কি হল? সেদিন সমস্ত আসমান ও যমীন পাল্টে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্ প্রকাশিত হবেন। মানুষ যমীনের ওপরে যা কিছু করেছে যমীন সে সবকে ফাঁস করে দেবে। আবু হোরায়রার হাদীসে বলা হয়েছে— তুমি কি জান যে, যমীনের খবর ফাঁস করা কি জিনিষ? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল জানেন তা কি জিনিষ? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যমীন সাক্ষী দেবে যে, প্রত্যেক বান্দাহ ও বান্দী যমীনের ওপরে কি কি আমল করেছে। সে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে। এটাই হল তার খবর দেওয়া (মোসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব)।

রবীআহ হদ থেকে মরফুভাবে বর্ণনা করেন যে, তোমরা যমীন থেকে বেঁচে থেকো। কারণ, সে তোমাদের মা। এমন কোন ভাল বা মন্দ কাজ করনেওয়ালা দুনয়্যাতে নেই যে, যার খবর যমীন রাখে না। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ যমীনকে বলবেন, বল, তখন সে বলবে। কুরতুবী বলেন, আল্লাহ্ হুকুম দেবেন, ফেটে যাও, তখন সে ফেটে যাবে। মানুষ হিসাবনিকাশের জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ফিরবে। কেউ সৌভাগ্যবান হবে এবং কেউ দুর্ভাগ্যবান হবে। কাউকে জান্নাতের হুকুম হবে এবং কাউকে জাহান্নামের হুকুম। ইবনে জারীর বলেন, ভিন্ন ভিন্ন দলে তারা বের হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা একত্রিতও হবে না। সুদ্দী বলেন, ফের্কা ফের্কা হোয়ে তারা আসবে যাতে তারা নিজেদের আমলগুলো দেখতে পায় এবং ভাল ও মন্দের বদলা পায়। প্রত্যেক যার্রা যার্রার হিসাব হবে। বোখারীতে খায়লের (ঘোড়ার) বায়ানে লম্বা হাদীস এসেছে যাতে উল্লেখ আছে যে, নবী (সঃ) কে হোমোর বা গাধা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা কিছু নাযেল করেননি, তবে এই সর্বগুনী আয়াত— ফমাঁই ইয়ামাল মিস্কা-লা যার্রা..... শাররাঁই ইয়ারাহ। একদা সাঅসাআহ ইবনে মো-আবিআহ নবীজীর কাছে আসেন। রসূলুল্লাহ তখন তার কাছে এই আয়াত পড়েন। সে তখন বলেন, হাসবী লা-উবা-লী আন্ লা-আসমাআ গায়রা হা-যা— অর্থাৎ আমার জন্য এই আয়াতটি যথেষ্ট। এটা ছাড়া আর কোন কিছু শোনার আমি পরোয়া করি না (আহমাদ ও নাসায়ী)।

আদী ইবনে হাতেমের হাদীসে নবী (সঃ) বলেন, اتقوا النار ولو بشق تمرة ইত্তাকুন্না-রা অলাও বি-শিক্কে তামারাতিন) অর্থাৎ খেজুরের

http://islaminonesite.wordpress.com

আধখানা টুকরো দিয়েও তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো (বোখারী)। একথাও সহীহ হদীসে এসেছে যে, তুমি কোন নেকীকে তুচ্ছ মনে কোর না, যদিও তুমি তোমার বালতি দিয়ে কোন পানি ভরার পাত্রে পানি ঢেলে দাও কিংবা নিজের কোন ভায়ের সাথে হাসি মুখে মেশো। সহীহ হদীসে আছে, নবী (সঃ) বলেন, কোন মেয়ে নিজের পড়শী কোন মেয়েকে যেন হেয় না করে, যদিও তাকে বকরীর একটি খুরও দিতে হয়। অন্য হদীসে নবী বলেন, সায়েলকে বকরীর একটি জ্বলা বা শুকনো খুর দিয়েও ফেরায়ো (খালি হাতে ফেরাওনি)। তিনি (সঃ) বলেন, হে আয়েশা। আগুন থেকে বাঁচো, যদিও আধখানা খেজুর দিয়ে পার। কারণ, ভুখার জন্য ঐ আধখানা খেজুরও পেট ভরার উপায় হয় (আহমাদ)। একদা আয়েশা আঙ্গুরের একটি দানা সদকা করে বলেন— কাম্ ফী-হা মিম্ মিসকা-লি যাররাতিন অর্থাৎ এর মধ্যে বহু যার্রা রয়েছে। একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশাকে বলেন, নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গোনাহ থেকেও বাঁচিয়ে রেখো। কারণ, ওর জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তলবকারী আছে (আহমাদ, নাসায়ী ও ইবনে মা-জাহ)। আনাস বলেন, একদা হযরত আবূবাক্‌র রসূলুল্লাহ্‌র সাথে খাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এই আয়াত নাযেল হয়। তখন তিনি তাঁর হাত তুলে নেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যার্রা যার্রা সমান অন্যায়েরও সাজা পাব কি? নবী (সঃ) বললেন, তুমি যেসব মকরূহ (অপছন্দনীয়) জিনিষ দুন্‌য়ায় দেখছো সেগুলো যার্রা যার্রা অন্যায়ের সমান। আর আল্লাহ্ তাআলা তোমার জন্য যার্রা যার্রা নেকীকে জমা করে রেখেছেন যা তোমাকে তিনি দান করবেন (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)। ইবনে আম্‌র বলেন, যখন ইযা-যুলযিলাতিল আরযু নাযেল হয় তখন আবূবাক্‌র বসেছিলেন। তিনি কাঁদতে থাকেন। নবীজী বলেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বলেন, এই সূরাটি আমাকে কাঁদিয়েছে (ইবনে জারীর)। আবু সায়ীদ খুদরী বলেন, যখন "ফমাঁই ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন" আয়াতটি নাযেল হয় তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি নিজের আমল দেখব কি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, বড় বড় পাপও কি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, ছোট ছোটও কি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, আমার মায়ের জন্য আফসোস! তিনি বললেন, তোমার জন্য সুসংবাদ হে আবূ সায়ীদ! কারণ, একটি নেকী ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ হয়। তারপর যার জন্য আল্লাহ্ চান ওকে আরো অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। কিন্তু গোনাহ একটিই হয়, সে আর বাড়ে না, বরং অনেক সময় আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। তোমাদের মধ্যে কেউই তার আমলের বদৌলতে নাজাত পাবে না। আমি বললাম, আপনিও কি তাই? তিনি বললেন:— ولا انا الا ان .... برحمته (আলা-আনা ইল্লা আঁই ইয়াতাগাম্মাদানিয়াল্লা-হু মিনহু বিরহমাতিহী)— আমিও না, তবে আল্লাহ্ তাঁর খাস রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেবেন (ইবনে আবী হাতেম।

এর সনদে ইবনে লহীয়াহ আছে)।

সায়ীদ ইবনে জোবায়ের এই আয়াতের তফসীরে একথাও বলেছেন যে, যখন এই আয়াতে করীমাহ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ .... وَأَسِيرًا নাযেল হয় তখন মুসলমানরা এই ধারণা করে যে, সামান্য জিনিষের জন্য আমরা কোন নেকী পাই না। সুতরাং যখন কোন মিসকীন তাদের দরজায় আসতো তখন তারা একটি খেজুর বা এক টুকরা রুটি দেওয়া কম মনে করতো এবং তাকে ফেরত দিত আর বলতো যে, এটা দেওয়ার যোগ্য নয়। আমরা সেই সদাকার জন্য পুরস্কার পাই যেটাকে দিই এবং খুব ভালবাসি। আর লোকেরা এও মনে করতো যে, সামান্য গোনাহ্‌র ব্যাপারে আমাদের ধরপাকড় হবে না। যেমন একবার মিথ্যা বলা, গীবত করা, দেখা বা এই জাতীয় কাজ করা। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে সামান্য ভাল কাজের উৎসাহ দেন যা বেশী হতে পারে। এবং তুচ্ছ গোনাহ্‌র ব্যাপারে তিনি তাদেরকে ভয় দেখান যার ঐ সামান্যও অনেক হতে পারে। তারপর এই আয়াত নাযেল করেন। যার্রার অর্থ একটি ছোট্ট পিঁপড়ের ওজনের সমান।

প্রত্যেক ভাল ও মন্দ লোকের জন্য তার একটি অন্যায় লেখা হয় এবং একটি নেকীর বদলে ১০টি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যখন কেয়ামতের দিন আসবে তখন আল্লাহ্ তাআলা মোমেনদের নেকীগুলোকে আবার কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন। তারপর যার গোনার চেয়ে নেকী একটি পিঁপড়ের সমানও বেশী হবে সে জান্নাতে যাবে (ইবনে আবী হাতেম)। ইবনে মসউদের হদীসে বলা হয়েছে:— তোমরা ছোট্ট ছোট্ট গোনা থেকে দূরে থেকো। কারণ, ওগুলো জমা হয়ে একজন লোককে ধ্বংস করে দেয়। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি উদাহরণ পেশ করে বলেন, যেমন একটি দল জঙ্গলে গিয়ে হাযির হল এবং কিছু খাবার জিনিষ রাঁধতে চাইল। অতঃপর একজন গিয়ে একটি কাঠ আনলো। আর একজন গিয়ে আর একটি কাঠ আনলো। এভাবে কাঠের একটি স্তুপ জমা হয়ে গেল। তারপর তারা আগুন জ্বালালো এবং যা রাঁধবার তা রেঁধে ফেললো (মোসনাদে আহমাদ)। অর্থাৎ এভাবে ছোট ছোট গোনাহ্ একত্রিত হোয়ে বড় গোনাহ্‌র মত লোককে ধ্বংস করে দেয়।

ফতহুল বয়া-নে বলা হয়েছে যে, প্রচণ্ড কম্পনকে 'যিলযাল' বলে। এই আয়াতে কম্পন বলতে কিয়ামতের সময় যমীনের কম্পন বোঝায়। কারণ, সে সময় ইসরাফীলের শিঙ্গারের প্রচণ্ড আওয়ায শুনে যমীন নড়ে উঠে কাঁপতে থাকবে এবং যমীনের ওপরে যেসব জিনিষ থাকবে সেসব ভেঙ্গেচুরে চুরমার হোয়ে যাবে। মোজাহেদ বলেন, এটা প্রথম ফুঁক হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (ইয়াওমা তারজুফুর র-জিফাহ্ * তাত্‌বায়ুহার র-দিফাহ) অর্থাৎ যেদিন কম্পনকারীনি কাঁপবে এবং তার পরবর্তী জিনিষ তার পরে পরেই হবে)। তফসীরে খা-যিনে বলা হয়েছে যে, এই ভূমিকম্পের

http://islaminonesite.wordpress.com

ব্যাপারে দুটি উক্তি আছে। অধিকাংশের উক্তি এই যে, এই ভূমিকম্প দুনিয়াতে হবে এবং এটা কিয়ামতের একটি আলামত। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই কম্পন কিয়ামতের দিনে হবে। দ্বিতীয় উক্তির সমর্থক এই আয়াতটি— অআখ্‌রাজাতিল আরযু আস্‌কা-লাহা (অর্থাৎ যমীন তার বোঝাগুলোকে বের করে ফেলে দেবে)। কারণ, এই বের করে ফেলে দেওয়া দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এরূপ যমীনের সাক্ষী দেওয়া দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এবং হাশরের ময়দান থেকে লোকেদের ফেরা দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। যমীনের ভেতরে যেসব মৃত লাশ্‌ ও লুক্কায়িত ধন আছে যমীন তা উগরে দেবে। আসকা-ল সিক্‌লুন এর বহু বচন। আবু ওবায়দা ও আখফাশ বলেন, মৃত লাশগুলো যতক্ষণ যমীনের পেটে থাকবে ততক্ষণ সে যমীনের জন্য বোঝা হবে এবং যখন সে যমীনের ওপরে এসে যাবে তখন সে যমীনের ওপরকার বোঝা হবে। মোজাহেদ বলেন, আসকালের ভাবার্থ মৃত লাশসমূহ। দ্বিতীয় ফুঁকের সময় যমীন তাকে উগরে দেবে। ইবনে আব্বাস বলেন, আসকাল মৃত লাশ ও গুপ্তধন। মানুষ তখন বলবে যে, এর কি হল? ইনসান এর ভাবার্থ কাফের। যমীনের ওপরে যেসব ভাল মন্দ কাজ হয়েছিল যমীন সেগুলোকে ফাঁস করে দেবে নিজের অবস্থা দেখিয়ে অথবা নিজ মুখে বয়ান করে। তবে মুখে বিবৃত করা মতটাই বেশী উত্তম। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা তখন তাকে বলার শক্তি দান করবেন।

মানুষ তার এই বিবরণ শুনে অথবা তার ভেতরকার গুপ্ত সম্পদ উগরানো দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে। কেউ বলেন, যমীন একথা বলবে যে, কিয়ামত এসে গেছে এবং দুন্‌য়ার আয়ু শেষ হয়ে গেছে। কিংবা সে সৃষ্টি জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বলে দেবে। এই মতটাই ঠিক। কারণ, হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসের ভাবার্থ তা-ই। যমীনের এই সংবাদ দান আল্লাহ্‌র অহীর মারফতে হবে। সেদিন মানুষ কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠের দিকে বিক্ষিপ্ত হোয়ে আসবে। অথবা হিসাব নিকাশের কাজ চুকিয়ে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে যাবে। কিংবা আশতা-ত এর ভাবার্থ এই যে, কেউ ভয় ও ভাবনাহীন হবে আবার কেউ চিন্তা ও দুঃখমলিন হবে। আর কেউ জান্নাতবাসী হোয়ে হাসি মুখ হবে এবং কেউ জাহান্নামবাসী হোয়ে কালোমুখ হবে। কেউ ডানদিকে ঘোরাফেরা করবে আর কেউ বামদিকে। এর কারণ হল তাদের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন এবং আমলও রকমারী। প্রত্যেকেই তার আমল দেখবে। যে যার্রা সমান নেকী বা পাপ করেছে সে সেটাকে দেখবে। যে ব্যক্তি তার আমলনামায় নেকী দেখবে সে খুশী হবে আর যে অন্যায় দেখবে সে দুঃখী হবে। إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াযলিমু মিসকা-লা যাররাতিন) অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ কারোর ওপরে যার্রা বরাবর যুল্‌ম করেন না। ভাষাবিদরা বলেন, মানুষ যমীনে হাত মারলে তার হাতে যে ধূলিকনা লেগে যায় তাকেই যার্রা বলে। কিংবা সূর্যের কিরণে

যে কনা দেখা যায় তাইই যার্রা। কিন্তু প্রথম উক্তিটাই উত্তম। কাফেররা যদি যার্রা ভাল কাজ করে তাহলে সে তার বদলা এই দুনয়্যাতে তার মালধন, নিজের স্বাস্থ্য ও ছেলেপুলের মধ্যেই পেয়ে যায়। অতঃপর যখন সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় তখন আল্লাহ্‌র কাছে তার কোন নেকীই থাকে না। পক্ষান্তরে মোমেন যদি দুনিয়াতে কোন অন্যায় করে তাহলে সে তার সাজা এই দুনিয়াতেই তার মালধন, ছেলেপুলে ও নিজের মধ্যেই পেয়ে যায়। অতঃপর যখন সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় তখন আল্লাহ্‌র কাছে তার কোন অন্যায় থাকে না। ইবনে মসউদ বলেন, এই আয়াতটি কোরআনের মধ্যে সব চেয়ে পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এই আয়াতটির ব্যাপকতা সম্পর্কে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত। কাব পাদ্রী বলেন, নবীর (সঃ) ওপরে এমন দুটি আয়াত নাযেল হয়েছে যা তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও অন্যান্য আসমানী সহীফার সমস্ত বিষয় বস্তুকে সন্নিবিষ্ট করে নিয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেন, যে-কোন মোমেন বা কাফের যে ভাল বা মন্দ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাকে তার সেই আমল দেখাবেন। তিনি মোমেনের অন্যায়গুলো মাফ করে দিয়ে তাকে তার নেকীর বদলা দেবেন। এবং কাফেরের নেকীগুলো ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায়ের বদলে তাকে আযাব দেবেন।

সংযোজন

এই সূরাতে ৮টি আয়াত, ৫৩টি শব্দ এবং ১৪৯টি অক্ষর আছে। সেইসব কাফেরদের পরকাল-অবিশ্বাসের প্রতিবাদে এই সূরাটি নাযেল হয়েছে, যারা বলতো যে,কিয়ামত কবে হবে? বিভিন্ন তফসীরে পাওয়া যায় যে, ঐ প্রশ্নের পর রাতটি গত না হতেই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তাই নবী করীম (সঃ) সকালের অপেক্ষা না করেই তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং লোকদেরকে সূরাটি শিখিয়ে দেন। এই সূরার শেষ আয়াতটি গোটা কোরআনের সারাংশ এবং শরীআতের সমস্ত বিধিনিষেধের নির্যাস। যা মানুষের কর্মের প্রতিফল দান প্রমাণ করে। চায় তা সৎকাজ হোক, কিংবা মন্দকাজ (ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)।

আরবের কোন এক বাকপটু বাগ্মী পণ্ডিত এই বাক্যটি তৈরী করেন:— اذا زلزلت الارض زلزالا এবং বাক্যটি নিয়ে তিনি গর্বও করতে থাকেন। অতঃপর এই সূরার প্রথম আয়াতটি যখন নাযেল হয়, যাতে "যিলযালান" এর জায়গায় "যিলযা-লাহা" বলা হয়— ফলে বাক্যটির মধ্যে এক নূতন প্রাণ সঞ্চার হয়। আয়াতটি শুনে ঐ পণ্ডিত আত্মহারা হোয়ে পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে যে, আমি আয়াতটির বাকশৈলীর উপর ঈমান আনলাম (তফসীরে হাক্কানী, আমপারা, ২১৩ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার প্রথম আয়াতে যে ভূমিকম্পের উল্লেখ আছে তা পৃথিবী-ধ্বংসের সময়কার প্রথম কম্পন, না পৃথিবী ধ্বংসের পর হাশরের ময়দানে জড় হবার

http://islaminonesite.wordpress.com

সময়কার দ্বিতীয় কম্পন? এ সম্পর্কে তফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে প্রথম কম্পন এবং কারো মতে দ্বিতীয়। তবে সূরাটির অন্যান্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, এটা দ্বিতীয় কম্পন (তফসীরে মাযহারী আমপারা, ৩২১ পৃষ্ঠা)।

৪র্থ ও ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেদিন যমীন কথা বলবে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগের আগের লোকের মাথায় ঢুকতোনা যে, যমীন আবার কেমন করে কথা বলবে। কিন্তু এখন রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, কিয়ামতের সময় যমীনের কথা বলা সম্ভব কিনা। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কিয়ামতের দিনে যমীন সেই আমল নিয়ে আসবে যা তার পিঠের উপর করা হয়েছে (বায়হাকী ও ইবনে মারদোআয়হে)। হযরত আলীর জীবনীতে পাওয়া যায় যে, যখন তিনি বায়তুল মাল বিলিবণ্টন শেষ কোরে কোষাগার খালি করে দিতেন তখন ওখানে দু-রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে যে, আমি তোমাকে ন্যায় সহকারে পূর্ণ করেছি এবং ন্যায় সহকারেই খালি করেছি।

হযরত মোকাতেল বলেন, শেষ আয়াত দুটি দুজন লোকের ব্যাপারে নাযেল হয়েছে। তন্মধ্যে একজন কোন ভিখারীকে একটি খেজুর কিংবা রুটির টুকরা প্রভৃতি দিতে নিজেকে হেয় মনে করতো এবং বলতো যে, এটা তো কোন জিনিষই নয়। বেশী বেশী দান করলে তবেই তো আমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। আর অন্যজন ছোট ছোট অন্যায়কে অন্যায় জ্ঞান করত না এবং সে বলতো যে, এটা তো অন্যায়ই নয়। বড় বড় অন্যায় করলে আযাব হবে। তাই তাদেরকে জ্ঞান দেবার জন্য আয়াত দুটি নাযেল হয়। এতে বলা হয় যে, ছোট ছোট নেকীও অনেক হতে পারে এবং মামুলী পাপও জমে জমে কবীরা গোনায় পরিণত হতে পারে। কোন পাপ পাপীর কাছে ছোট মনে হলেও কেয়ামতের দিনে তা আল্লাহ্‌র কাছে পাহাড়ের চেয়ে বড় মনে হতে পারে এবং কারো সমস্ত নেকী আল্লাহ্‌র কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে (তফসীরে বাগাভী, আমপারা, ২৭৩ পৃষ্ঠা)। এইজন্য নবী (সঃ) বলেন, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও আধখানা খেজুর দিয়ে হয়, যদি তাও না পাও তাহলে ভাল কথার দ্বারাও সন্তুষ্ট করাও। অন্য এক হাদীসে কাব থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমরা কোন ভাল জিনিষকেই তুচ্ছ মনে কোরনা। কারণ, একজন আল্লাহ্‌র রাহে একটি সূঁচ ধার দিয়ে জান্নাতে গেছে এবং একটি মেয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের ভিতে একটি শস্যকণা সাহায্য দিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে (তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা)।

শেষ আয়াত দুটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে—ভাল ও মন্দ কাজ দুনিয়ায় করবে সে কিয়ামতের দিনে তার আমলনামায় তা দেখা পাবে। এই দেখা পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে প্রত্যেক মন্দের শাস্তি পাবে এবং প্রত্যেক ভাল-র

পুরস্কার পাবে। কারণ, মোহাম্মাদ ইবনে কাব এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, কোন কাফের ভাল কাজ করলে সে দুনিয়াতেই তার প্রতিফল নিজের শরীরে, মালে ও সন্তানসন্ততির মধ্যে কিংবা পরিবারের মধ্যে পেয়ে যায়। পরিশেষে সে দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নেয় তখন আল্লাহ্‌র কাছে তার কোন ভাল আমল বাকি থাকে না। ফলে পরকালে কোন কাফের ভাল-র পুরস্কার পাবে না। তেমনি কোন মোমেন যদি দুনিয়াতে ভুল করে তাহলে সে তার শাস্তি নিজের দেহে, মালে, পরিবারে ও সন্তানসন্ততির মধ্যে পেয়ে যায়। ফলে দুনিয়া থেকে সে এমন অবস্থায় বিদায় নেয় যখন আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন অন্যায়ই থাকে না। তাই সে আযাব থেকে মুক্তি পায় (তফসীরে বাগাভী, আমপারা, ২৭২ পৃষ্ঠা)।

একদা হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জুদআ-ন প্রাক ইসলামী যুগে রক্তের সম্পর্ক দৃঢ় রাখতো, মিসকীনদের খাবার দিত, মেহমানদের সম্মান করতো, কয়েদীদের মুক্ত করাতো। এসবের জন্য পরকালে সে কোন ফায়দা পাবে কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, না। কারণ, সে মরণের সময় পর্যন্তও একথা বলেনি:— রব্বিগ ফিরলী খাতীয়াতী ইয়াওমাদ্দীন—অর্থাৎ প্রভুগো! প্রতিফল দিনে আমার অন্যায় মাফ কোরে দিও (ইবনে জরীর)।

পূণ্যবান কাফেরদের পূণ্য তাদেরকে নরক থেকে মুক্তি না দিতে পারলেও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, পূণ্যহীন কাফেরদের তুলনায় পূণ্যবান কাফেরদের শাস্তি কিছু কম হতে পারে। যেমন হাদীসে আছে যে, দান খয়রাতের কারণে হাতেম তাইয়ের শাস্তি কিছু কম হবে এবং রসূলুল্লার জন্ম-সংবাদে খুশী হোয়ে ঐ সুসংবাদবাহক দাসী সোআয়বাকে মুক্ত করার কারণে আবু লাহাবের আযাব হাল্কা করা হয়ে থাকে (তফসীর রূহুল মাআ-নী, আমপারা, ২১৩ পৃষ্ঠা)।

তাই প্রত্যেকের উচিত অনুপরমাণু সমান নেকী করা এবং যারা বরাবর অন্যায় থেকে পারতপক্ষে বিরত থাকা। আল্লাহ্ আমাদের সৎ আমল করার এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার তওফীক দিন—আমীন!

সূরায়ে লাম্ ইয়াকুন

এই সূরাটিকে সূরায়ে বাইয়িনাহ্‌ও বলে। এছাড়া সূরায়ে মোনফাক্কীন, সূরায়ে কিয়ামাহ ও সূরায়ে বারিয়্যাহও একে বলা হয়। এতে ৮টি বা ৯টি আয়াত আছে। অধিকাংশ আলেমের মতে সূরাটি মাদানী এবং কারো কারো মতে মক্কী। ইবনে আব্বাস বলেন, সূরাটি মদীনায় নাযেল হয়েছে। আয়েশা বলেন, মক্কায়। আনাস বলেন, নবী (সঃ) একদা ওবাই ইবনে কাবকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাকে সূরায়ে লাম্ ইয়াকুন পড়ে শোনাই।

http://islaminonesite.wordpress.com

ওবাই বললেন, আল্লাহ্ কি আমার নাম ধরে বলেছেন? নবী (সঃ) বললেন, হাঁ। ওবাই তখন কাঁদতে লাগলেন (বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি)। এতে ওবাইয়ের বড় ফযীলত (মাহাত্ম্য) প্রমাণিত হয়। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা রসূল (সঃ)কে হুকুম দিয়েছেন এই সূরাটি ওবাইকে পড়ে শোনাতে। আবু হাইয়্যা বদরী সাহাবী বলেন, যখন এই সূরাটি নাযেল হয় তখন জিব্রীল (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম দিয়েছেন এই সূরাটি ওবাইকে পড়াতে। তখন নবী (সঃ) ওবাইকে বললেন, জিব্রীল আমাকে এই সূরাটি তোমাকে পড়াবার হুকুম দিয়েছেন। ওবাই বললেন, অকাদ যুকিরতো সাম্মা ইয়া রাসুলাল্লা-হ অর্থাৎ সেখানে আমার উল্লেখ ছিল কি? তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ। তখন ওবাই কেঁদে ফেললেন (মোসনাদে আহমাদ, ইবনে জা-নে মুজামুস্ সাহা-বাতে এবং তাবারানী ও ইবনে মারদোআয়হে এই হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন)।

কথিত আছে যে, ওবাই খুব জলদি রসূলুল্লাহর শব্দগুলো আয়ত্ব করতে পারতেন। তাই পড়ার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে ঐ শব্দগুলো যেভাবে শুনবে ঐভাবেই যেন সে ওগুলোকে নিজেও পড়তে পারে এবং অন্যকেও শেখাতে পারে। ইসমায়ীল ইবনে আবী হাকীম মোযানীর শব্দ মরফুভাবে ও শ্রুতভাবে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা লাম্ ইয়াকুনিল্ লাযীনা কাফারূ শুনে বলেন:— হে আমার বান্দাহ! তুমি খুশি হয়ে যাও। আমার সম্মান ও মাহাত্ম্যের কসম! আমি তোমাকে জান্নাতে এমন জায়গা দেব যে, তাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে (আবু নোআয়ীম আলমারেফাহ্তে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। ইবনে কাসীর বলেন, এই হাদীসটি অতি অভিনব। ওবাই ইবনে কাব বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমার নিকট কোরআন পড়ি। তারপর তিনি এই সূরাটি পড়লেন এবং তার সাথে এও বললেন:— যদি আদম সন্তান মালের একটি পাহাড় চায় এবং তা যদি তাকে দেওয়া হয় তাহলে সে আবার দ্বিতীয়বার তাই চায় এবং তা যদি তাকে দেওয়াও হয় তাহলে সে তৃতীয়বার তাই চাইবে। অতএব মাটি ছাড়া আর কোন জিনিষ আদম সন্তানের পেট ভরাতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে মাফ করে দেন যে তওবা করে। আর আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন হল দ্বীনে হানীফ, যা মোশরেকী বা ইহুদী অথবা খৃষ্টান ধর্ম নয়। আর যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে তা কখনই অস্বীকৃত হবে না (আহমাদ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ ও উত্তম বলেছেন)।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ ثَمَانِيْ اٰيَاتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু করছি)

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا
صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ اُولٰٓئِكَ
هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ
اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ
عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝٨

বাংলা উচ্চারণ

১। লাম ইয়াকুনিল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্লিল্ কিতাবি অল্ মুশরিকীনা অল মুনফাকীনা হাত্তা-তা'তিয়া হুমুল বাইয়িনাহ্। ২। রসূলুম মিনাল্লাহি ইয়াত্লূ সুহুফাম মুতাহ্হারাহ্। ৩। ফীহা কুতুবুন কাইয়িমাহ্। ৪। অমা-তাফার্রাকাল লাযীনা উতুল কিতা-বা ইল্লা-মিম বাদি মা-জা-আত্ হুমুল বাইয়িনাহ্। ৫। অমা-উমিরূ ইল্লা লিইয়াবুদুল্লা-হা মুখ্লিসীনা লাহুদ্ দীন হুনাফা-আ ওয়া ইউকীমুস্ সলা-তা ওয়া ইউতুয্ যাকাতা অযালিকা দীনুল কাইয়িমাহ্। ৬। ইন্নাল লাযীনা কাফারূ মিন আহ্লিল কিতাবি অল মুশরিকীনা ফী না-রি জাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা উলায়িকা হুম শার্রুল বারিয়্যাহ্। ৭। ইন্নাল লাযীনা আ-মানূ ওয়াআমিলুস স-লিহা-তি উলা-য়িকা হুম খাইরুল বারিয়্যাহ্। ৮। জাযা-উহুম ইন্দা রব্বিহিম জান্না-তু আদনিন তাজ্রী মিন তাহ্তিহাল আনহা-রু খা-লিদীনা ফীহা আবাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম অরাযূ আনহু যা-লিকা লিমান খাশিয়া রব্বাহ্।

http://islaminonesite.wordpress.com

তরজমা

১। কেতাবওলা (ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি) ও মোশরেকদের (অংশীবাদীদের) মধ্যে যারা (আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার করেছে তারা ততক্ষণ পযন্ত (কুফ্‌র থেকে) আলাদা হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসেনি। ২। (সে প্রমাণ হল) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একজন রসূল এসে কতকগুলো পবিত্র পত্র তাদের সামনে পাঠ করবে। ৩। যার মধ্যে (পূর্ববর্তী আসমানী) গ্রন্থ সমূহের সারাংশ সন্নিবিষ্ট আছে। ৪। আর যাদেরকে কেতাব দেওয়া হয়েছিল তারাও তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল না আসা পর্যন্ত দলাদলি করেনি। ৫। অথচ তাদেরকে কেবলমাত্র এই হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হোয়ে আল্লাহ্‌র নির্ভেজাল ইবাদত করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দান করে। আর এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় সত্যধর্ম। ৬। কিতাবধারী ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা (আল্লাহ্‌কে) অবিশ্বাস করেছে তারা নিঃসন্দেহে নরকের আগুনে চিরকাল থাকবে। ঐসব লোকেরাই সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। ৭। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল ভাল কাজ করেছে নিঃসন্দেহে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। ৮। তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার এমন সব চিরস্থায়ী জান্নাত (বাগান) যার নীচে দিয়ে বহু নদনদী বয়ে যাচ্ছে। সেখানে তারা চিরদিনের জন্য থাকতে পাবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি তুষ্ট। এটা তার জন্য যে তার প্রভুকে ভয় করে।

তফসীর

হযরত মুহাম্মাদের পূর্বে সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা বিভ্রান্ত ছিল এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের ভ্রান্তি নিয়েই গর্বিত ছিল। এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছিল কোন এক অভিভাবকের অথবা কোন এক বাদশার কিংবা কোন এক পথপ্রদর্শকের, যার দ্বারা বিভ্রান্তরা ভ্রান্তিমুক্ত হয়।

ইবনে কাসীর বলেন, আহলে কেতাব হচ্ছে ইহুদী নাসারা এবং আরব ও অনারবের বুতপূজারীরা। কাতাদাহ বলেন, বাইয়্যিনার অর্থ কোরআন। ইবনে জরীর বলেন, কুতুবুন কাইয়্যিমাহ পবিত্র সহীফা সমূহ, যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযেল হয়েছে এবং যার মধ্যে কোন ভুলচুক নেই। কাতাদাহ বলেন, তেলাঅতে সোহোফ বলতে ভালভাবে ও উত্তমরূপে কোরআন তেলাঅত করা। ইবনে যায়দ বলেন, কাইয়্যিমার অর্থ পরিমিত ন্যায়বিচারক এবং দ্বিতীয় বাইয়্যিনার অর্থ আগেকার উম্মতদের উপর নাযেল হওয়া আসমানী কিতাবসমূহ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রমাণ আসার পর আহলে কিতাবরা ঐ কিতাবের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, ইহুদী ৭১ ফের্কা হয়ে যায় ও খ্রীষ্টানরা ৭২ ফের্কা হয় এবং এই উম্মত ৭৩ ফের্কা হয়ে যাবে। এই ৭৩ এর মধ্যে ৭২ ফের্কা জাহান্নামে যাবে, ১টি ফের্কা বেহেশতে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ জান্নাতী

ফের্কা কারা? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ما انا عليه واصحابي (মা-আনা আলায়হি অআসহা-বী) অর্থাৎ আমার সাহাবীদের তরীকা মত চলবে যারা, বেহেশতে যাবে তারা। হুনাফার ভাবার্থ শির্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠ হোয়ে তওহীদের দিকে ধাবিত হওয়া। তারপর নামায কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, এটা শারীরিক এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর যাকাত হল গরীবদের সাথে এহসান করা। এই আয়াতটি দিয়ে ইমাম যুহরী ও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ অনেক ইমাম এই দলীল পেশ করেছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৬নং থেকে শেষ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা আহলে কেতাব মোশরেক ও কাফেরদের পরিণাম বর্ণনা করে বলেছেন যে, যারা আসমানী কিতাব এবং নবী ও রসূলদের বিরোধিতা করবে তারা পরকালে চিরদিনের জন্য জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। আর তারাই হবে সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে অধম। তারপর তিনি পুন্যবান লোকদের সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, যারা নিজের দিলে ঈমান এনেছে এবং ঐ ঈমান মোতাবেক সর্বাঙ্গ দিয়ে ভাল ভাল কাজ করেছে তারা সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে উত্তম। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) ও একদল আলেম এই আয়াত দিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ ফেরেশ্‌তার চেয়েও উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ বলেছেন, উলা-য়িকা হুম খাইরুল বারিয়্যাহ। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা এই খবর দিচ্ছেন যে, আমার নিকট মোমেনদের জন্য এমন এমন বাগান রয়েছে যার মধ্যে পানির নহর অবিরত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। সর্বপরি আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। কারণ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সমস্ত ন্যামতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ন্যামত।

তারপর বলছেন যে, এই পুরস্কার তার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে এমন ভাবে যে, সে যেন তাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। আবু হোরায়রার হাদীসে এসেছে নবী (সঃ) একদা বললেন, আমি তোমাদের সর্বোত্তম সৃষ্টির খবর দেব না কি? সাহাবীরা বললেন, হাঁ, দিন। তিনি বললেন, সে সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্‌র রাহে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে এবং যখনই সে কোন সন্দেহজনক খবর পায় তৎক্ষণাৎ সে ঘোড়ায় চড়ে বসে। তারপর তিনি আবার বললেন, কিগো আমি তোমাদেরকে সর্বোত্তম সৃষ্টির খবর দেব না কি? তারা বললেন, হাঁ, দিন। তিনি বললেন, সে সেই ব্যক্তি যে একপাল বকরীর মধ্যে থাকে এবং নামায পড়ে ও যাকাত দেয়। তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিজীবের খবর দেব না? তারা বললেন, হাঁ, দিন। তিনি বললেন, সে সেই ব্যক্তি যে সওয়াল করে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অথচ তাকে কিছু দেওয়া হয় না (মোসনাদে আহমাদ)।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে, আহলে কিতাব হল ইহুদী, নাসারা ও আরবের বুতপূজারীগণ। এখানে আহলে কিতাবকে কাফের বলা হয়েছে। তার কারণ, তারা তাদের কিতাবের ওপরে ঈমান আনলেও তওহীদের সিরাতে—মুস্তাকীম বা সোজা

http://islaminonesite.wordpress.com

পথ থেকে হটে যায়। ইহুদীরা মূর্তি তৈরী করে এবং খ্রীষ্টানরা তিন খোদার পূজা শুরু করে। মা-তুরীদী দল বলে যে, এখানে "মিন" অক্ষরটি "তাব্‌য়ীয" বা কতিপয়ের জন্য। অর্থাৎ কতিপয় আহলে কিতাব কাফের, আবার কেউ মোমেনও আছে। এনফেকাক এর অর্থ আলাদা হওয়া। অর্থাৎ তারা কুফরী থেকে দূরে সরেনি এবং নিজ নিজ আমল থেকে বিরত হয়নি যতক্ষণ তাদের কাছে বাইয়েনা বা জাজ্বল্য প্রমাণ আসেনি। ইবনে কাইসান বলেন, তারা মোহাম্মদের গুণাবলী থেকে আলাদা হয়নি যতক্ষণ তিনি নবী না হন। যখন তিনি নবী হলেন তখন তারা হিংসা ও বিদ্বেষ করতে লাগলো। যেমন আল্লাহ্ বলেন, فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (ফালাম্মা জা-আহুম মা-আরাফু কাফারু বিহী) অর্থাৎ যাকে তারা চিনতো তিনি যখন এসে যান তখন তারা তাকে অস্বীকার করে। রসূলুল্লাহ যতক্ষণ নবী হননি তার আগে পর্যন্ত মক্কার সমস্ত মোশরেকরা তাঁকে আমীন বা বিশ্বস্ত বলতো। কিন্তু যখন তিনি নবী হলেন তখন তারা যা তা বলতে শুরু করে। খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে এবং ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। প্রথম মতটাই ঠিক। আল্লামা অ-হেদীও তাই বলেন। অর্থাৎ কাফেররা তাদের শির্ক ও কুফরী থেকে ততক্ষণ বিরত হবে না যতক্ষণ মোহাম্মাদ (সঃ) কোরআন এনে তাদের গোমরাহী ও মূর্খতার স্বরূপ বায়ান না করে দেবেন এবং তাদেরকে ঈমানের দাওত দেবেন। এই আয়াতটিকে কোরআনের কঠিনতম আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত বলা হয়েছে—শব্দের দিক দিয়ে এবং ব্যাখ্যার দিক দিয়েও। অনেক বড় বড় আলেম এর তফসীরে মাথা গুলিয়ে ফেলেছেন এবং তারা এমন পথে চলেছেন যদ্বারা সঠিক অর্থ করতে পারেননি।

বাইয়িনাহ বলতে স্বয়ং মোহাম্মাদ (সঃ)। কারণ, তার পরেই রসূলুম মিনাল্লা-হ এসেছে। সোহোফ এর ভাবার্থ কোরআন। ইবনে যায়দ বলেন, বাইয়িনাহ কোরআন, যেমন আল্লাহ্ বলেন أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ আওয়ালাম্ তা তীহিম বাইয়িনাতু মা-ফিস্ সুহুফিল উলা) অর্থাৎ আগেকার কিতাবগুলোতে তাদের নিকট কোন প্রমাণ পৌঁছায়নি কি? (আল কোরআন)। সোহোফ সহীফার বহুবচন। লিখিত পত্রকে সহীফা বলা হয়। মোতাহ্‌হারার অর্থ মিথ্যা ও সন্দেহ থেকে পবিত্র। হাসান বলেন, সোহোফ সেই সব আসমানী কেতাব যা লাওহে মাহ্‌ফুযে আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:—বাল হুওয়া কুরআনুম মাজীদ ফী লাওহিম মাহ্‌ফুয—অর্থাৎ মহান কোরআন সুরক্ষিত ফলকে রক্ষিত আছে। আহলে কিতাবদের মতভেদ করার কারণ সন্দেহের কারণে নয়, বরং সত্য ও জাজ্বল্য প্রমাণ আসার পর। মোফাসসিররা বলেন যে, হযরত মুহাম্মাদের নবী হবার ব্যাপারে আহলে কিতাবরা ঐক্যমত ছিল। কিন্তু যখন তিনি নবী হলেন তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে যায়। ফলে কেউ কেউ ঈমান আনে এবং বেশীর ভাগ কাফের থেকে যায়। পক্ষান্তরে তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র নির্ভেজাল এবাদত করার এবং একনিষ্ঠ হোয়ে ধর্মকর্ম করার হুকুম

দেওয়া হয়েছিল। এই আয়াতটি এর দলীল যে, এবাদতের মধ্যে নিয়্যাত ফরয। কারণ, আমলের মধ্যে এখলাস ও নিঃস্বার্থ ভাব পোষণ করা দিলের কর্ম। হানীফ সেই, যে ব্যক্তি সর্বধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে ইসলামের দিকে ঝুকেছেন। অথবা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসারীই হানীফ। কারণ, তিনি তওহীদপন্থীদের সর্দার ও সর্বোত্তম মোখলেস (স্বার্থহীন) ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণতঃ হানীফ সেই, যিনি ৫টি ধর্মের (১) ইহুদী (২) নাসারা (৩) সা-য়েবা বা তারকাপূজারী (৪) মাজুসী বা অগ্নিপূজারী (৫) মোশরেক বা অংশীবাদী প্রভৃতির নীতির প্রতি বিরূপ এবং ওদের ছোটখাটো নীতির প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হোয়ে নেক আমল করে। তাদেরকে এও হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নামায পড়, এবং যাকাত দাও। কারণ, এ দুটিই হল ধর্মের প্রধান অঙ্গ। আর এখলাস ও সঠিক আমলই হল দীনে কাইয়েম বা সুদৃঢ় ও পরিমিত ধর্ম।

আহলে কেতাব ও মোশরেকরা কিয়ামতের দিনে আগুনে যাবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টজীব। কারণ, তারা জেনেশুনে অবিশ্বাস করে। এই আয়াতে দুনয়্যাদার ও কুপ্রকৃতি আলেমদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে। তারপর ঈমানওয়ালা ও নেক আমলওয়ালা লোকদেরকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, একবার আমরা নবীজীর কাছে ছিলাম। এমন সময় হযরত আলী এলেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাঁর কসম যাঁর মুঠোয় আমার জান আছে। ইনি এবং এঁর দল কিয়ামতের দিনে সফলকাম ব্যক্তিদের মধ্যে হবেন। তারপর এই আয়াতটি নাযেল হয়। তারপর থেকে রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবীরা যখন হযরত আলীকে আসতে দেখতেন তখন বলতেন—কাদ্ জা-আ খাইরুল বারিয়্যাহ অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এসে গেছেন (ইবনে আসাকের)। ইবনে আব্বাস বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযেল হয় তখন হযরত (সঃ) আলীকে বলেন, তুমি এবং তোমার দল কেয়ামতের দিনে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে (ইবনে মায়দোয়হে)। যিয়া এটাকে স্বয়ং আলী থেকে মরফুভাবে রেওয়ায়াত করেছেন। আবু সায়ীদ বর্ণিত হাদীসে নবী (সঃ) বলেন, আলী খাইরুল বারিয়্যাহ অর্থাৎ আলী সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ (ইবনে আদী ও ইবনে আসাকের)। তারপরের আয়াতে আল্লাহ্ বলেন যে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার হল জান্নাত। তায় প্রত্যেকে একটি একটি জান্নাত পাক কিংবা বহু। যেমন আল্লাহ্ বলেন:— وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ... وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দুটি জান্নাত এবং ও দুটো ছাড়া আরোও ১টি জান্নাত সে পাবে (সূরা রহমান)। এই হিসেবে প্রত্যেকে ৪টি কোরে জান্নাত পাবে। প্রথম জান্নাতটি দুনয়্যা এবং দুনয়্যার মধ্যে যা আছে তার তুলনায় ১০ গুণ বড় হবে। যার ভাবার্থ জান্নাতে আদন। এটা মধ্যবর্তী জান্নাত। প্রত্যেক জান্নাতের নীচে পানি, মদ, মধু ও দুধের মোট ৪টি কোরে নহর বইবে। অতঃপর তারা ঐসব বাগানগুলোতে

http://islaminonesite.wordpress.com

চিরদিন থাকবে। কখনই তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে না। এই জান্নাত ছাড়াও তারা আর একটি জিনিষ পাবে, যা জান্নাতের চেয়েও উত্তম তা হল আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি তুষ্ট। জান্নাত এমন জিনিষ, যাকে কোন চোখ দেখেনি। কোন কানও তার বর্ণনা শোনেনি এবং কোন অন্তরে তার কল্পনাও সম্ভব হয়নি। তারপর আল্লাহ্ বলেন, এই পুরস্কার ও সন্তুষ্টি তার জন্য যে দুনয়্যাতে আল্লাহ্কে ভয় করতো এবং ঐ ভয়ের কারণে সে গোনাহ থেকে বিরত থাকতো। গোনাহ্তে ডুবে থেকে শুধু ভয় করলে তা ভয় নয়। কারণ, সেটা প্রকৃত ভয় নয়, বরং তা হল সাহস। কোন কোন আলেম বলেন إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহ্কে ভয় করে। আর এখানে জান্নাতের হকদার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ অর্থাৎ যে তার প্রভুকে ভয় করে সে জান্নাত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাবে। এই দুটি আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত আলেমদের হিস্যা। আমি বলি, কোরআনের আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী ওলামা তারা, যারা ইল্ম মোতাবেক আমল করে এবং উপকারী ইল্ম শেখে, অপকারী ইল্ম নয়। কারণ, স্রেফ বিদ্যায় ইবলীস সবচেয়ে অগ্রগামী। আর আমলহীন ইল্মের অবস্থা সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বলআম বাওরের ঘটনা, যা তার দুর্গতির সাক্ষী। এছাড়াও আমলহীন আলেম সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: كَمَثَلِ ... أَسْفَارًا অর্থাৎ তারা সেই গাধার মত যে শুধু মোট বয়ে বেড়ায় (সূরা জুমুআ)। অতএব যেসব আলেমরা জান্নাতের আশা করে তারা নিজেদেরকে এই আয়াতের দ্বারা পরখ করে দেখুন যে, তাঁরা ঐ পুরস্কারের যোগ্য কি না। অন্য কেউ তাকে তার অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে অবগত করাক—এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই তার নিজের ব্যাপারে খবর রাখে, যদিও সে (নিজের দোষত্রুটি ঢাকবার জন্য) অনেক ওজর আপত্তি পেশ করে থাকে (সূরা কিয়ামাহ)।

হে আল্লাহ্। তোমার এই গোনাগার বান্দা খুবই লজ্জিত। কারণ, তুমি একে ইল্ম দিয়েছ লেখাপড়া শিখিয়েছ, কোরআন ও হাদীস পড়াশোনা করবার শক্তি দিয়েছ, বইপত্র প্রণয়ন ও সংকলনের ক্ষমতাও দিয়েছ। তথাপি আমি নিজেকে আমলের খুবই কাঙাল মনে করছি। আমার কাছে কলেমায়ে শাহাদত ছাড়া নাজাতের আর কোন পুঁজি নেই। কামেয়াবীর তো কোন কথাই নেই। আমি তোমার নিকট এই ভিক চাচ্ছি যে, যেরূপ তুমি আমাকে ইল্ম দিয়েছ সেরূপ নেক আমলেরও তওফীক দাও, যাতে আমার এই এল্ম উপকারী হোয়ে যায়। আল্লা-হুম্মা রব্বানা আমীন!

সংযোজন

এই সূরাতে ৮টি আয়াত, ৯৪টি শব্দ এবং ৩৯৬টি হরফ আছে (আযীযী ৩৪৭ পৃষ্ঠা)।

হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) নবী হবার আগে সারা পৃথিবী এমন অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টতার পাঁকে ডুবেছিল যে, একজন নবী ও মহান সংস্কারক না আসলে এবং নিজের সঙ্গে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা না আনলে নিখিলবিশ্বের সংস্কার হবে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রমাণাদি পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান 'আল কোরআন' সহ রসূলরূপে ধরণীর ধূলার প্রেরণ করেন। সে সময় পৃথিবীতে দুরকম লোক ছিল। এক, যাদের মধ্যে একত্ববাদ ও নবীত্ববাদের মৌলিক ধারণা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা তাদের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে বিভ্রান্ত হোয়ে পড়েছিল। এরা হল ইহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি। দ্বিতীয় দল তারা, যারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরক ও বহুত্ববাদীতার মধ্যে ডুবেছিল এবং এরা একত্ববাদ ও নবীত্ববাদ থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তারা হল মোশরেক। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ঐ দুটি দলই চলে আসছে (তফসীরে মাজেদী, ১২০৪ পৃষ্ঠা)।

অতঃপর তিনি (সঃ) নবী হোয়ে এসে যখন সত্য সনাতন ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন তখন ঐ দুটি দলের আঁতে ঘা পড়ায় দুটি দলের বেশ কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। এই সূরার প্রথম ৪টি আয়াতে ওরই প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

২নং আয়াতের 'সোহোফ' এবং ৩নং আয়াতের 'কোতোব' শব্দ দুটি প্রমাণ করে যে, কোরআন নাযেলের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ সতর্কতার সাথে তা লিখে রাখা হোত।

৫নং আয়াতে এবাদত-উপাসনার মধ্যে নিঃস্বার্থভাব পোষণ করা এবং নামায কায়েম করা ও রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত এবাদতের নির্যাসই হল ইখলাস বা কেবল আল্লাহ্রই উদ্দেশ্য তা করা। ওলামায়ে কিরাম সমস্ত আমলকে তিনভাগে ভাগ করেছেন:— (১) আদেশাবলী (২) নিষেধাবলী (৩) বৈধ কাজসমূহ। আদেশমূলক কাজের মধ্যে এখলাস এই যে, ঐ কাজটা শুধুমাত্র আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে হওয়া চাই। ঐ কাজ যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য আর কারো উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তা লোক দেখানো রিয়া হবে, যা আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে। নিষেধমূলক কাজ কেউ যদি বিনা নিয়্যাতে ত্যাগ করে তাহলে সে তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবে, কিন্তু এই ত্যাগের জন্য সে কোন নেকী পাবে না। আর যদি সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ঐ কাজ ত্যাগ করে তাহলে সে সওয়াব পাবে। বৈধ কাজসমূহ যেমন খাওয়া দাওয়া, ঘুমানো, স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি কাজগুলো যদি কেউ বিনা নিয়্যাতে করে তাহলে সে ওর দরুণ কোন পুণ্য পাবে না। কিন্তু যদি সে ঐ কাজগুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

করে তাহলে সে পুণ্য পাবে। কারণ বৈধ কাজগুলো কখনো আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেরও কারণ, হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র এবাদতে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কিছু আহার করা এবং হারাম ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য বিবির সাথে সহবাস করা (মাআ আলা-মিল মুফাস্‌সিরীন, ৩০ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

নামায আত্মশুদ্ধির বাহন এবং যাকাত জনসেবার একটি মাধ্যম। তাই এই দুটি জিনিষই হচ্ছে সর্বযুগে সর্বধর্মের এবং সমস্ত মহাপুরুষের শিক্ষা ও আদর্শের সারনির্যাস (মওলানা আকরম খাঁ রচিত আমপারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)।

৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস এবং তাঁর হুকুম মোতাবেক ভাল ভাল কাজ করে তারা সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠজীব। এই আয়াতের ভিত্তিতে আল্লামা হাফেযুদ্দীন নাসাফী তদীয় আকায়েদ গ্রন্থে লিখেছেন যে, আদম সন্তানের বিশেষ ব্যক্তি যেমন রসূল ও নবীগণ বিশেষ ফেরেশ্‌তাগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বনীআদমের সাধারণ সদস্য যেমন আওলিয়ায়ে কিরাম ও সাধকগণ সাধরণ ফেরেশ্‌তাদের চেয়ে উত্তম, কিন্তু বিশেষ ফেরেশ্‌তা সাধারণ আদম সন্তান থেকে মর্যাদাবান। ইবনে আবী হাতেম বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার হাদীসে আছে যে, মোমেনগণ আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানিত এমন কতিপয় ফেরেশ্‌তারও চেয়ে যাঁরা তাঁর কাছে থাকেন (রূহুল মাআ-নী আমপারা, ২০৭ পৃষ্ঠা)। হাদীসটির ভাবার্থ হল বিশেষ ফেরেশ্‌তা ছাড়া অন্যান্য ফেরেশ্‌তাদের তুলনায় মোমেনগণ আল্লাহ্‌র কাছে অধিক মর্যাদাবান (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৫২ পৃষ্ঠা)।

৮ম আয়াতে জান্নাতে আদনের উল্লেখ আছে। তাই এই প্রসঙ্গে ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের গুণ বর্ণনায় কখনো 'জান্নাতে আদ্‌ন' কখনো জান্নাতে নায়ীম আবার কখনো দারুস সালাম নাম উল্লেখ করেছেন। এই নাম তিনটি ঈমানের তিনটি অঙ্গ—বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকার ও বাস্তব আমল-এর মোকাবেলায় বর্ণনা করা হয়েছে (কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বেহেশ্‌ত তারাই পাবে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। এর ভাবার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লামা আলুসী বলেন, প্রকৃত সৌভাগ্য এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের মূলই হল আল্লাহ্‌র ভয়। কারণ, যদি কারো মনে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকে তাহলে সে হারাম ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকতো না এবং তাদের জন্য ঐ দিনের প্রয়োজন হোত না যে দিনে তাদের চুলের মুঠি এবং ঠ্যাং ধরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এর মধ্যে একথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেবল মাত্র ঈমান এবং নেক আমল উচ্চতম মর্যাদা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করাতে পারে না। বরং তার জন্য দরকার আল্লাহ্‌র ভয়ের। এই ভয় তাদের মধ্যে বেশী হয় যারা বেশী জ্ঞানী হয়। আল্লাহ্ বলেন إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে তাঁর বান্দাদের মধ্যে ভয় করে কেবল জ্ঞানীরাই। এইজন্য সুফীপ্রবর হযরত জোনায়েদ বাগদাদী বলেন, যার জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র পরিচয়

প্রাপ্তি যতবেশী সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাবে ততবেশী (রূহুল মাআ-নী, আমপারা, ২০৬ পৃষ্ঠা)।

তফসীর সূরায়ে কাদ্‌র

মাহাল্লী বলেন, এই সূরাতে ৫টি আয়াত আছে। কেউ বলেন, ৬টি। অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে সূরাটি মক্কী। সা'লাবী বলেন, মাদানী। এটাই বেশী ঠিক। অ-কেদী বলেন, সর্বপ্রথম মদীনাতে এই সূরাটি নাযেল হয়। ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়র ও আয়েশা প্রমুখ বলেন, সূরাটি মক্কী। ইবনে কাসীরও তাই বলেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

বাংলা উচ্চারণ

১। ইন্না আন্‌যালনা-হু ফী লাইলাতিল কাদ্‌রি। অমা-আদ্‌রা-কা মা-লাইলাতুল কাদ্‌রি। লাইলাতুল কাদ্‌রি খাইরুম্ মিন আল্‌ফি শাহ্‌রি। তানায্‌যালুল মালা-ইকাতু অররূহু ফীহা বিইয্‌নি রব্বিহিমমিন্ কুল্লি আমরি। সালামূন হিয়া হাত্তা-মাত্‌লাইল ফাজ্‌রি।

তরজমা

১। নিশ্চয়ই আমি একে (কোরআনকে) কদরের রাতে নাযেল করেছি। ২। তুমি কি জান কদরের রাত কি জিনিষ? ৩। (শোন) কদরের রাত হাযার মাসের চেয়েও সেরা (একটি রাত)। ৪। যে রাতে ফেরেশ্‌তাগণ ও রূহ (জিবরীল আঃ) তাদের প্রভুর অনুমতি অনুযায়ী (দুন্‌য়াতে) নেমে আসেন। (সে রাতের) প্রতিটি বিষয়ে শান্তিই শান্তি। ৫। ঐ রাত উষার উদয় পর্যন্ত (অব্যাহত থাকে)।

তফসীর

সম্ভবতঃ ঐ রাতেই কোরআন নাযেল হওয়া শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে

http://islaminonesite.wordpress.com

তা নাযেল হতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা ঐ রাতে ৩টি গুণ রেখেছেন (১) ঐ রাতে যে নেকী করে সে হাযার রাতের নেকী করে (২) দুনয়ার যে সব কাজ হবে বলে আল্লাহ্ নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেগুলো ঐ রাতে নীচের নেমে আসে (৩) এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে শান্তি ও আন্তরিক তৃপ্তি নেমে আসে। সে রাতে রাতভোর এবাদত করতে খুব মজা লাগে। কোরআন দ্বারা বোঝা যায় যে, ঐ রাত রমাযান মাসে হয়। হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, রমাযানের শেষ দশকের ৫টি বেজোড় রাতে অর্থাৎ ২১ থেকে ২৯ এর মধ্যে হয়। গায়েবের খবর আল্লাহ্ জানেন।

আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে খবর দিচ্ছেন যে, কোরআন নাযেল এই রাতে হয়েছে। এই রাত খুই বরকতময় রাত। কারণ, আল্লাহ্ বলেন:— إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ অর্থাৎ আমি একে বরকতপূর্ণ রাতে নাযেল করেছি। এখানে "লায়লায়ে মোবারাকাহ" মানে শবেকদর। এই রাত রমাযানে হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন:— شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ রমাযান সেই মাস যে মাসে কোরআন নাযেল হয়েছে। ইবনে আব্বাস প্রমুখ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র কোরআনকে একবারেই "লাওহে মাহফুয" থেকে দুনয়াবী আসমানের বাইতুল ইযযাতে নাযেল করেন। তারপর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য সামান্য কোরে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপরে তা নাযেল হয়। প্রথম আয়াতটির পর শবেকদরের মর্যাদা বাড়াবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তুমি কি জান শবেকদর কি? তা হল হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। ইউসুফ ইবনে সাদ বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আলীর ছেলে হাসানের হাতে বায়আত করার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোআবিয়াকে বলল, তুমি মোমেনদের মুখ কালো করে দিয়েছ কিংবা তুমি মোমেনদের মুখে কালিমা লেপনকারী। জবাবে মোআবিয়া বললেন, আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন! তুমি আমাকে তিরস্কার কর না। কারণ, নবী (সঃ) একদা বানী উমাইয়াকে মেম্বারের পরে দেখে মন খারাপ করেন। তখন إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ (সূরা কাওসার) নাযেল হয়। কওসারের অর্থ জান্নাতের একটি নহর। এবং তার সাথে إِنَّا أَنزَلْنَاهُ (সূরা কাদ্‌রও) নাযেল হয়। হাযার মাসের ভাবার্থ বানী উমাইয়ার রাজত্বকাল। কাসেম বলেন, আমি গণনা করে তাদের যুগ হাযারই পাই। একদিন কমও নয়, একদিন বেশীও নয় (তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে অভিনব বলেছেন এবং ইমাম হাকেম ও ইবনে জরীরও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। কিন্তু এই হাদীসটির সনদে ও বিশুদ্ধতায় আপত্তি আছে। বানী উমাইয়ার মোট রাজত্বকাল ৯২ বছর। সুতরাং এটা হাযার মাসের বেশী। কারণ, হাযার মাস ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। কাসেম সাহেব ইবনে যোবায়েরের রাজত্বকাল বাদ দিয়ে ধরেছেন। এ হিসেবে তার উক্তিটি আনেকটা ঠিক। তাছাড়া সূরাটি বানী উমাইয়াদের কুৎসায় নয়, বরং এটাতো শবেকদরের মর্যাদায় নাযেল হয়েছে। এর দ্বারা হাদীসটির দূর্বলতা

ও অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়।

সূরাটি নাযেলের কারণ

মোজাহেদ বলেন, নবী (সঃ) একদা এক বানী ইসরায়ীলের কথা বলেন যে, লোকটি হাযার মাস পর্যন্ত আল্লাহর রাহে হাতিয়ার বাঁধা অবস্থায় থাকে। কথাটি শুনে মুসলমানরা বিস্মিত হয়। তখন আল্লাহ্ তাআলা এই সূরাটি নাযেল করে বলেন যে, তোমাদের এই রাতটি ঐ লোকটির হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। মোজাহেদের অন্য শব্দ এই, বানী ইসরাইলের মধ্যে একজন লোক এমন ছিল, যে সকাল পর্যন্ত সারারাত নামায পড়তো এবং দিনের বেলা সন্ধ্যা পর্যন্ত দুশমনের সাথে লড়তো। সে এইরূপ কাজ হাযার মাস ধরে করতে থাকে। হাদীসটি বলার পর আল্লাহ্ তাআলা এই সূরাটি নাযেল করে বলেন যে, এই রাতটি তার হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। আলী ইবনে ওরআহ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বানী ইসরাইলদের ৪ জন লোকের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ৮০ বছর ধরে আল্লাহ্র এবাদত করে এবং চোখের পলকভরও তাদের কেউই আল্লাহ্র নাফরমানী করেনি। তাঁরা হলেন (১) আইউব (২) যাকারিয়া (৩) ইউশা ও (৪) হিযকীল আলায়হিমুস সালাম। কথাটি শুনে নবী (সঃ)-এর সাহাবীরা আশ্চর্যান্বিত হলেন। তখন জিবরীল (আঃ) এসে বলেন, হে মোহাম্মাদ! আপনার উম্মত ঐ ৪ জন লোকের ৮০ বছর এবাদতের কথা শুনে তাজ্জব বনে গেছে। তাই আল্লাহ্ তাআলা ওর চেয়ে শ্রেয় এই সূরাটি নাযেল করেছেন এবং এও বলেছেন যে, এই রাতটি তার চেয়েও উত্তম যা শুনে আপনি ও আপনার উম্মত আশ্চর্যবোধ করছেন। ফলে নবীজীও তাঁর সাহাবীরা খুব খুশী হয়ে যান (ইবনে আবী হাতেম)।

মোজাহেদ বলেন, এই রাতের আমল কেয়াম বা নামাযে দাঁড়ানো এবং দিনের আমল সিয়াম বা রোযা রাখা। এই রাত হাযার মাসের চেয়েও শ্রেয়। অন্য উক্তি এই যে, লায়লাতুল কাদর সেই হাযার মাসের চেয়ে শ্রেয় যার মধ্যে ঐ রাত নেই। এটা কাতাদাহ, শাফেয়ী প্রমুখদের কথা। ইমাম ইবনে জরীর এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। আর এটাই ঠিক, অন্যটা নয়। হাদীসে এসেছে— رباط ليلة في سبيل الله خير من الف ليلة فيما سواه من المنازل (রিবা-তো লাইলাতিন ফী সাবীলিল্লা-হি খাইরুম মিন আলফি লাইলাতিন ফীমা সিওয়া-হু মিনাল মানা-যিলি)। অর্থাৎ আল্লাহ্র রাহে এক রাত পাহারা দেওয়া অন্য জায়গায় হাযার রাতের পাহারা দেওয়ার চেয়ে শ্রেয় (আহমাদ)। এইরূপ যে ব্যক্তি সৎ নিয়্যাতে ও ভাল পোষাকে জুমআতে হাযির হয় তার জন্য নামায, রোযা প্রভৃতির এক বছরের আমল লেখা হয়। এই জন্য আমর ইবনে কায়স বলেন, ঐ রাতে কোন আমল করা হাযার মাস আমল করার চেয়ে শ্রেয়।

আবূ হোরায়রা বর্ণিত হাদীসে আছে যে, যখন রমাযান মাস আসে তখন

http://islaminonesite.wordpress.com

নবী (স:) বলেন, তোমাদের নিকট রমাযানের এই মোবারক মাস এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর এর রোযা ফরয করেছেন। এই মাসে জান্নাতের দরজা খোলা হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে কয়েদ করা হয়! এর মধ্যে এমন একটি রাত আছে, যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় সে বড়ই অভাগা (মোসনাদে আহমাদ ও নাসায়ী)। মোটকথা এই রাতের এবাদত হাযার মাসের এবাদতের সমান। তদুপরি বোখারী ও মুসলিমে আবূ হোরাইরা থেকে মরফুভাবে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সওয়াবের আশায় শবেকদরে নামাযে দাঁড়ায় তার আগেকার গোণাহ মাফ হোয়ে যায়। প্রচুর বরকতের কারণে এই রাতে রহমতের ফেরেশ্‌তা দুনিয়াতে নেমে আসে এবং তাদের সাথে বরকত এবং রহমতও নাযেল হয়। যেমন কোরআন তেলাঅতের সময় ফেরেশ্‌তা নাযেল হয় এবং তারা যেক্‌রের জায়গাটিকে ঘিরে নেয়। এইরূপ তালেবে এলম বা বিদ্যা অর্জনকারীর জন্য ফেরেশ্‌তারা তাদের পালক বিছিয়ে দেয়। এটা তাদের তাযীম ও সম্মান।

রূহ এর ভাবার্থ জিবরীল (আ:)। এখানে খাসের (বিশেষের) উপরে আমকে (ব্যাপককে) আত্‌ফ বা সংযোজিত করা হয়েছে। কিংবা রূহ এর ভাবার্থ ফেরেশ্‌তাদের কোন একটি দল। মোজাহেদ বলেন, এই রাতটি প্রতিটি জিনিষ থেকে নিরাপদ। অর্থাৎ এই রাতে শয়তান কোন অন্যায় কাজ করতে অথবা কাউকে কোন কষ্ট দিতে পারে না। এই রাতটি তার দুস্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকে। কাতাদাহ প্রমুখ বলে, এই রাতে বিভিন্ন কাজের হুকুম এবং রেযক্ ও মওতের নির্ধারণ হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ শাবী বলেন, এই রাতে ফেরেশ্‌তারা মসজিদ ওয়ালাদের ওপর সকাল পর্যন্ত সালাম করে। আবূ হোরায়রার হাদীসে বলা হয়েছে যে, এই রাত ২৭শে বা ২৯শে রাতে হয়। এই রাতে ফেরেশ্‌তার সংখ্যা কাঁকরের সংখ্যার চেয়েও বেশী। ইবনে আবী লায়লা বলেন, মিন কুল্লে আম্‌রিন সালাম এর ভাবার্থ— এই রাতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না। অর্থাৎ সবরকম নিরাপত্তা ও শান্তি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ বলেন, সালা-মুন হিয়া এর অর্থ সম্পূর্ণ কল্যাণ। ঐ রাতে সকাল পর্যন্ত কোন অনিষ্ট হয় না। ওবাদাহ ইবনে সা-মেতের বর্ণিত এই হাদীসটি এই মতের সমর্থক। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, শবেকদর শেষ দশকে হয়। যে ব্যক্তি ঐ রাতগুলোতে এবাদত করে এটা তার জন্য যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা তার আগের ও পরের গোনাহ মাফ করে দেন। এই রাত বেজোড় হয়—২৯শে বা ২৭শে কিংবা ২৫শে অথবা ২৩শে অন্যথায় ২১শেও হয় (মোসনাদে আহমাদ)।

শবেকদরের আলামত

এই রাত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়। যেন ঐ রাতে চাঁদ উঠেছে মনে হয়।

ঐ রাতে গরমও হয় না, ঠাণ্ডাও পড়ে না এবং তারকাও ছিটকায় না। ঐ দিনের সকালে সূর্যও কিরণহীন অবস্থায় উদিত হয়, পূর্ণিমার চাঁদের মত। ঐ দিন শয়তানও তার সাথে বের হয় না। এই হাদীসটির সনদ হাসান বা উত্তম, কিন্তু এর মতন বা মূল বক্তব্যের মধ্যে গারাবাত (অভিনবত্ব) রয়েছে এবং কোন কোন শব্দে নিকারাত বা অজানা শব্দ রয়েছে। ইবনে আব্বাসের শব্দ মরফুভাবে এই যে, এই রাত স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, না গরম, না ঠাণ্ডা। ঐ দিন সকালে সূর্য দুর্বল ও লাল হোয়ে বের হয় (আবু দাউদ আত্তায়ালিসী)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ মরফুভাবে বলেন, আমি শবেকদর দেখেছি, অতঃপর তা ভুলে গেছি। এটা শেষ দশকে হয়। এই রাত জ্যোতির্ময় ও প্রশস্ত হয়, না গরম, না ঠাণ্ডা। যেন চাঁদ উঠেছে এইরূপ ভাব মনে হয়। ঐদিনে সকালের জ্যোতি বের না হওয়া পর্যন্ত শয়তান ঐ রাতে বের হয় না।

শবেকদর কখন হয়

আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, এই রাত আগের উম্মতদের মধ্যে ছিল, না এটা এই উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট? এ ব্যাপারে ২টি উক্তি আছে। মালেক বলেন, নবী (সঃ) কে তার আগের উম্মতদের বয়স দেখানো হয়। তিনি তাঁদের মোকাবেলায় নিজ উম্মতের বয়স অনেক কম দেখতে পান। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে এই রাতটি দান করেন যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। এই হাদীসটি অন্য সূত্রে মোসনাদ ভাবেও বর্ণিত হয়েছে। মালেকের এই উক্তিটি একথা প্রমাণ করে যে, এই রাতটি এই উম্মতের জন্য খাস বা সীমাবদ্ধ। সাহেবে ইন্দাহ এই মতটিকে জমহুর ওলামা (অধিকাংশ আলেম) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আল্লা-হো আলাম! আল্লামা খাত্তাবীও এই মতের ব্যাপারে এজমা (আলেমদের সর্ববাদী সম্মত ঐক্যমতের কথা) আছে বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি একথা প্রমাণ করে যে, এই রাত বিগত উম্মতদের মধ্যেও ছিল, যেমন আমাদের মধ্যে এটা আছে।

মারসাদ বলেন যে, আমি একদিন হযরত আবু যর (রাযিঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনিও কি নবী (সঃ)-কে এই রাত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেছিলেন? তিনি বললেন, আমিই তাঁকে সবচেয়ে বেশী সওয়াল করেছি এবং বলেছি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে বলুন যে, এই রাত রমাযান মাসে হয়, না অন্য মাসে। নবী বললেন, এটা রমাযান মাসে হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবীদের জীবদ্দশায় হয় এবং তাঁদের মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায়, না কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে? তিনি (সঃ) বললেন, কেয়ামত পর্যন্ত হবে। আমি বললাম, রমাযানে কখন হয়? তিনি বললেন, তুমি ওকে রমাযানের প্রথম দশকে ও শেষ দশকে খোঁজ কর। তারপর তিনি শেষ দশকের শেষ ৭ দিনের সন্ধান

http://islaminonesite.wordpress.com

দিলেন এবং বললেন, এরপর এ বিষয়ে আমাকে আর সওয়াল কোর না (আহমাদ ও নাসায়ী)। এতে দলীল রয়েছে সব উম্মাতের জন্য এবং এটা যে কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে ও প্রত্যেক বৎসরে হয় তারও প্রমাণ রয়েছে।

শিয়াদের একটি দল এই রেওয়ায়তটির — فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم ভিত্তিতে বলে যে, এই রাতটি একেবারে উঠে গেছে। কিন্তু এ মতটি ঠিক নয়। কারণ "রফা" বা উঠে যাওয়ার অর্থ রাতটি নয়, বরং ঐ রাত সংঘটিত হবার "বিশেষ সময়টি" উঠে গেছে। সুতরাং আগের হাদীসটি দিয়ে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এই রাত রমাযান মাসেই সীমাবদ্ধ, অন্যান্য মাসগুলোতে নয়। ইবনে মসউদ ও কুফার আলেমরা বলেন যে, এই রাত সারা বছরে একবার হয় এবং সব মাসে সমানভাবে হয়। ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনানে এই শিরোনামা দিয়েছেন: باب بيان ان ليلة القدر في كل رمضان অর্থাৎ শবেকদর প্রত্যেক রমাযানে হবার বর্ণনা। তাছাড়া হযরত ইবনে ওমরও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল আর আমি শুনছিলাম। তিনি বললেন, এটা প্রত্যেক রমাযানে হয়। এর সনদ ঠিক আছে এবং এর বর্ণনাকারীরা সবাই সিকাহ বা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রতি রমাযানে এই রাতের আশা করা যায়। এই বর্ণনাটিকে ইমাম গাযযালী রেওয়ায়াত করেছেন এবং রাফেয়ী এটাকে অতি অভিনব বলেছেন। কেউ বলেন, এটা রমাযানের ১লা রাতে হয়। আবু রাযীন হতে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেন, ১৭ই রমযানে শবেকদর হয়। এই মতের সমর্থনে ইবনে মসউদ থেকে একটি হাদীস মরফু ও মওকুফভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ীরও একটি উক্তি এইরূপ আছে। হাসান বলেন, এটা বদরের রাত। সেদিন বৃহস্পতিবার এবং ১৭ই রমাযানের রাত ছিল। পরদিন সকালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ দিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ইয়াওমাল ফোরকান। আলী ও ইবনে মসউদ বলেন, ২১শের রাত। আবু সায়ীদ খুদরী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, শবেকদর রমাযানের শেষ দশকে হয়। অন্য শব্দ এই যে, পরদিন সকালে ২১ তারিখ হয় (বোখারী ও মুসলিম)। শাফেয়ী বলেন, এই হাদীসটি সবচেয়ে সহীহ রেওয়ায়াত। কেউ বলেন, ২৩শের রাত। এই মতটি মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে ওনায়েস থেকে বর্ণিত এবং আগের হাদীসটির সাথে খুব নিকট সম্পর্কিত। আবু সায়ীদ থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে কেউ বলেন, শবেকদর ২৪শের রাতে হয়। এই বর্ণনাটি আবু সায়ীদ থেকে মরফুভাবে বর্ণিত। এর রাবীগণ সবাই বিশ্বস্ত।

রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) মোআয্‌যিন হযরত বেলাল বলেন, শেষ দশকের প্রথম ৭ দিনে শবেকদর হয়। এই মওকুফ হাদীসটি বোখারীতে আছে। ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস, জাবের, হাসান, কাতাদাহ ও ইবনে অহাব প্রমুখও বলেন যে, ২৪শের

রাতে শবেকদর হয়। অ-সেলাহ ইবনে আসকা হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, কোরআন ২৪শে রমাযানে নাযেল হয়। কেউ বলেন ২৫শে তারীখে। এই উক্তিটি ইবনে আব্বাস থেকে মরফুভাবে বোখারীতে এসেছে। এর তফসীর বেজোড় রাত বলে করা হয়েছে। এটাই বেশী প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। কিন্তু কেউ কেউ জোড়ও বলেছেন। যেমন মুসলিম শরীফে আবু সায়ীদ থেকে রেওয়ায়াত আছে। কেউ বলেন, ২৭শের রাত। এটা উবাই ইবনে কাব থেকে মরফুভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। উবাই এ ব্যাপারে কসম খেয়ে বলেন যে, এর পরদিন সকালে সূর্য কিরণহীন অবস্থায় উদিত হয়। এই মতের সমর্থনে মোআবিয়াহ, ইবনে ওমার, ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকে মরফুভাবে রেওয়ায়াত আছে এবং সাহাবায়ে কেরামের একটি দলও বলেন যে, শবেকদর ২৭শের রাতে হয়। ইমাম আহমাদের মতও তাই। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইমাম আবু হানীফাও এই মত পোষণ করেন। কেউ কেউ কোরআন থেকেও এই তারীখটি এভাবে বের করেছেন যে, সূরার শব্দ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ২৭ তারীখে নাযেল হয়েছে। কারণ, এই সূরার শব্দই ২৭টি। আল্লাহো আলাম! (আল্লাহ্‌ই বেশী জানেন)।

একদিন হযরত ওমর (রাযিঃ) সাহাবীদের জড় করে বললেন, শবেকদর কোন্ তারীখে হয়? সবাই বললেন, শেষ দশকে হয়। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি ওমরকে বললাম, এটা শেষ দশকের ৭ তারীখে হয়। ওমর বললেন, তুমি কি করে এটা জানলে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ৭টি আসমান তৈরী করেছেন, ৭টি যমীন বানিয়েছেন, ৭টি দিন করেছেন, মানুষকে ৭টি জিনিষ দিয়ে তৈরী করেছেন, সে ৭ দিয়ে খায় এবং ৭ দিয়ে সেজদা করে। বায়তুল্লার তওয়াফও ৭ বার এবং কাঁকর মারাও ৭ বার। এরূপ আরো জিনিষও আছে। ওমর বললেন, তুমি যা বুঝেছ আমি তা বুঝিনি। কাতাদাহ বলেন, ৭টা জিনিষ খাওয়ার অর্থ হল— فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ..... وَعِنَبًا অর্থাৎ আমি যমীনে আনাজ ও আঙ্গুর ..... প্রভৃতি উৎপন্ন করেছি— (আল কোরআন)। এর সনদ উত্তম, কিন্তু তিনজন রাবী অতি অভিনব।

কেউ বলেন, ২৯শের রাতে শবেকদর হয়। এর উল্লেখ উবাদাহ ইবনে সামেত বর্ণিত মরফু হাদীসে বেজোড় রাতের বর্ণনার মধ্যে এসেছে (মোসনাদে আহমাদ)। আবু হোরায়রার হাদীসেও মরফুভাবে ২৯শে রাতের উল্লেখ আছে (আহমাদ)। কেউ বলেন, শেষ রাত। একথাটি আবু বাক্‌রাহ বর্ণিত মরফু হাদীসে এসেছে (তিরমিযী ও নাসায়ী)। তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান (উত্তম) ও সহীহ (বিশুদ্ধ)। আবু হোরায়রার হাদীসেও মরফুভাবে এসেছে ইন্নাহা-আখিরু লাইলাতিন অর্থাৎ এটা শেষ রাত।

এই সমস্ত রেওয়ায়াত সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জওয়াবে এগুলো নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, যখন কেউ এরূপ

http://islaminonesite.wordpress.com

বলতো যে, লায়লাতুল কাদ্‌রকে আমরা অমুক রাতে খুঁজবো? তিনি বলতেন, ঠিক আছে। লায়লাতুল কাদ্‌র তো একটী বিশেষ রাত যা পরিবর্তিত হয় না—ইমাম তিরমিযী এটাকে ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ কিলাব্বা বলেন, এই রাতটি শেষ দশকের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। ইমাম মালেক, সওরী, আহ্‌মাদ, ইবনে রাহ্‌অয়হে, আবূ সওর, মোযানী ইবনে খোযায়মাহ প্রমুখ এই মতটাকে গ্রহণ করেছেন এবং কাযী ইয়ায এই মতটিকেই শাফেয়ী থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর দলীল পাওয়া যায় ইবনে ওমার বর্ণিত এই হাদীসটিতে—নবী (সঃ) বলেন, আমি তোমাদের স্বপ্নগুলোকে দেখছি যে, শেষ সাতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। অতএব যে কেউ এই রাতের খোঁজ করবে সে যেন শেষ সাতের মধ্যে করে (বোখারী ও মুসলিম)। শবেকদরের দিন রমযান ছাড়া অন্য মাসে না হওয়ার ইমাম শাফেয়ীর দলীল হল ওবাদাহ ইবনে সামেতের এই হাদীসটি :—

عسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة الحديث رواه البخاري

প্রমাণটি হল এই যে, শবেকদরের দিন যদি কতিপয় দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট হোত তাহলে প্রতি বছরের নির্দিষ্ট দিনটি নবী (সঃ) জানতে পারতেন না। এক বছর তিনি (সঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে সাহাবীদেরকে নির্দিষ্ট দিনটি বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু অন্তর্নিহিত বুদ্ধি বলে যে, এই রাতটি যেন রহস্যাবৃত থাকে যাতে কোরে লোকেরা ঐ রাতটির খোঁজে মাসভোর এবাদত করে এবং মাসের শেষ দশকে আরো বেশী চেষ্টা করে। সেই জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ দশকে এতেকাফ করতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি (সঃ) এইরূপ করতে থাকেন। তাঁর পরে তাঁর বিবিরাও এতেকাফ করতে থাকেন (বোখারী ও মুসলিম)। উক্ত দুই হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) রমাযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। হযরত আয়েশা বলেন, যখন শেষ দশক আসতো তখন নবী (সঃ) রাতকে জ্যান্ত করতেন, ঘরের সবাইকে জাগাতেন এবং খুব আঁটসাট কোরে কোমর বাঁধতেন। মুসলিম শরীফের শব্দ এই যে, শেষ দশকে তিনি যত মেহনত করতেন অন্য দশকে তত করতেন না। আয়েশার হাদীসে এসেছে যে, যখন রমাযানের এক দশক বাকি থাকতো তখন রসূলুল্লাহ উঠে পড়ে এবাদত করতেন এবং বিবিদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন (আহ্‌মাদ)। ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, শেষ দশকের সব রাতগুলোই সমান মর্যাদা সম্পন্ন। কারো দাম কম ও কারো বেশী তা নয় (শরহে রাফেয়ী)।

শবেকদরের দোআ

এই জিনিষটি পছন্দনীয় যে, সব সময় বিশেষ করে রমাযান মাসে এবং তার মধ্যে শেষ দশকে এবং ওর বেজোড় রাতে খুব বেশী কোরে দোআ করা উচিত। বিশেষ কোরে এই দোআটি :—

اللهم انك عفو ...... عني আল্লা হুম্মা ইন্নাকা আফুওউন তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া ফাফো আন্নী (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা ভালবাস। এতএব আমাকে ক্ষমা কর)। আয়েশার হাদিসে এসেছে যে, আমি একদিন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যদি শবেকদর পাই তাহলে কি দোআ করব? তিনি বললেন:— আল্লা হুম্মা .... ফাফো আন্নী (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হাকেম ও ইবনে মাজাহ)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান (উত্তম) সহীহ (বিশুদ্ধ)। এবং ইমাম হাকেম বলেন যে, হাদীসটি বোখরী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। ইবনে আবী হাতেম এখানে শবেকদর সম্পর্কে একটি লম্বা চওড়া এবং আজব ও অভিনব রেওয়ায়াত কাব পাত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরও ওটাকে পুরোপুরি লিখেছেন কিন্তু রেওয়ায়তটি মরফূ নয়। সেজন্য আমি ঐ হাদীসটি এখানে বর্ণনা করিনি।

ফতহুল বায়ানের স্পষ্ট বিশ্লেষণ এই যে, "ইন্না আনযালনা-হো" এর মধ্যে "হূ" যমীর বা সর্বনামের বিশেষ্য কোরআন। আল্লাহ্ তাআলা শবেকদরের দিনে কোরআনকে "লওহে মাহফুয" থেকে দুনিয়াবী আসমানে নাযেল করেন। তারপর প্রয়োজন মত একটু একটু কোরে তা নাযেল হতে থাকে। কোরআন নাযেলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২৩ বছর সময় লাগে। অন্য আয়াতে এরূপ বলা হয়েছে :—

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ এখানে লায়লাতে মোবারাকার অর্থ শবেকদর। আর একটি আয়াতে আছে:— شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (অর্থাৎ রমাযান সেই মাস যার মধ্যে কোরআন নাযেল হয়েছে)। এই শবেকদর ঐ রমাযানের মধ্যে ছিল। মোজাহেদ বলেন, এই রাতটি হুকুমের রাত। একে কদর এই জন্য বলে যে, আল্লাহ্ তাআলা এই রাতে আগামী বছরের সমস্ত কাজের তকদীর বা ভাগ্যলিপি তৈরী করেন। যেমন মৃত্যু, রুযী ইত্যাদি। কিংবা এই রাতটি খুবই কদর বা মর্যাদাবান সেজন্য একে কদরের রাত বলে। অথবা এই রাতের এবাদতের কদর খুব বেশী হয় এবং খুব অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। তাই একে শবেকদর বলে। খলীল বলেন, এই রাতে অসংখ্য ফেরেশতা নাযেল হওয়ার কারণে যমীন সংকীর্ণ হয়ে যায়। এই রাতের ফযীলতে এবং এই রাতের নির্দিষ্ট হওয়া সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে। এ ব্যাপারে ৪০ এরও অধিক উক্তি আছে।

আল্লাহ্ বলেন, হে রসূল! তুমি জান কি এই রাত কি জিনিষ? এটা যেন মানুষের বুদ্ধির অতীত জিনিষ যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ রাত হাযার মাসের চেয়েও শ্রেয়, যা ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। অধিকাংশ মোফাসসির বলেন, এই রাতের আমল সেই হাযার মাসের আমলের চেয়ে শ্রেয় যার মধ্যে শবেকদর নেই। ফার্রা ও যাজ্জাজও এই মত পোষণ করেন। কারো মতে হাযার মাসের ভাবার্থ যুগ যুগ। কারণ, আরবরা হাযারের উল্লেখ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যা বোঝাবার জন্য করে থাকে। কিংবা আগের যুগে যে ব্যক্তি হাযার

http://islaminonesite.wordpress.com

মাস এবাদত করতো তাকে আবেদ বলা হোত। তাই আল্লাহ্ তাআলা এই দীর্ঘ কালের বদলে এই রাতটি দান করেন। এছাড়াও আরো অনেক উক্তি আছে যার বর্ণনায় কোন লাভ নেই। হযরত আনাস বলেন, শবেকদরে সদাকাহ দেওয়া, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া প্রভৃতি হাযার মাসের চেয়ে শ্রেয়। এই রাত শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে, এতে রূহ (অর্থাৎ জিব্রীল আঃ) ও অন্যান্য ফেরেশ্‌তা নাযেল হয়। তাদের এই অবতরণ আল্লাহ্‌র হুকুমে হয়। যেসব কাজ বছর ভোর হবে এরা তার বন্দোবস্ত করেন। এই রাত পুরোপুরি শান্তিই শান্তি এবং কল্যাণই কল্যাণ। এর মধ্যে অনিষ্টের কোন উল্লেখই নেই। কোন মোমেন ও মোমেনার উপরে শয়তানের কোন প্রভাব হয় না। যে মোমেন ব্যক্তির পাশ দিয়ে ফেরেশ্‌তা যায় তাকে তারা বলে:— আসসালা-মু আলাইকা আইয়ুহাল মুমিন! কিংবা কতিপয় ফেরেশ্‌তা অন্য কিছু ফেরেশ্‌তার উপরে সালাম করে। আতা বলেন, আউলিয়া ও ফর্মাবর্দার বান্দার উপরে আল্লাহ্‌র সালাম হয়। ইবনে আব্বাস বলেন, এই রাতে উদ্ধত শয়তান বন্দী হয় এবং জিন শয়তানের গলায় তওক দেওয়া হয়। আসমানের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক তওবাকারীর প্রতি আগ্রহ দেখান। এই অবস্থা সূর্যাস্ত থেকে ফজরের উদয় পর্যন্ত সমানভাবে বিদ্যমান থাকে।

সংযোজন

এই সূরাতে ৫টি আয়াত, ৩০টি শব্দ এবং ১১২টি বর্ণ আছে (তফসীরে আযীযী, আমপারা, ৩৪০ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্ তাআলা নিজের ব্যাপারে কখনো 'ইন্নী' অর্থাৎ নিশ্চয় 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি যমীনে আমার প্রতিনিধি তৈরী করব (সূরা বাকারাহ ৩০ আয়াত)। আবার কখনো তিনি ইন্না'— নিশ্চয় আমরা শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন এই সূরার প্রথম আয়াত এবং সূরা কাওসারের প্রথম আয়াত ইত্যাদি। তাই জেনে নেওয়া ভাল যে, 'ইন্না' শব্দটি কখনো বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এবং কখনো সম্মানসূচক একবচনেও ব্যবহৃত হয়। ইসলামী বিশ্বাসে আল্লাহ্ যেহেতু একজন সেজন্য এখানে 'ইন্না' শব্দটি সম্মানসূচক একবচন, সংখ্যাসূচক বহুবচন নয়। (তফসীরে কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)। এই কারণেই বাংলা তর্জমায় ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে ইন্না-র অর্থ 'নিশ্চয় আমি' করা হয়েছে। শাব্দিক অর্থ 'নিশ্চয় আমরা' করা হয়নি। এই আয়াতটিতে সেইসব লোকেদের প্রতিবাদ রয়েছে যারা মনে করে যে, কোরআন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর তৈরীকৃত বাণী। তাই আল্লাহ্ তাআলা প্রথমেই বলে দিচ্ছেন যে, এই কোরআন আমিই নাযেল করেছি, অন্য কেউ নয়।

এই সূরার ১ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে শবেকদরের

রাতে এবং সূরা দোখানের ২য় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন নাযেল হয়েছে মোবারক রাতে। উক্ত দুটি রাত একই রাত, না ভিন্ন ভিন্ন দুটি রাত? অধিকাংশ আলেমের মতে দুটি রাত একই রাত, যা কোরআনের অন্য আয়াত এবং হাদীস দ্বারা রমাযান মাসের শেষ দশকের কোন এক বিজোড় রাত বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, মোবারক রাতটি ১৫ই শাবানের রাত। যা আমাদের দেশে শবেবরাত নামে প্রসিদ্ধ। এই মতটি সম্পর্কে আল্লামা আলূসী হানাফী বলেন, এই মতটি গরীব ও অত্যন্ত অভিনব এবং শা-য্য ও নিঃসঙ্গ। তুহফাতুল মুহতাজে তাই আছে। তাছাড়া আয়াতটি এই মতকে প্রতিবাদ করে (তফসীর রূহুল মাআ-নী আমপারা, ১৯০ পৃষ্ঠা)। ইমাম নবভী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ভাষ্যে "বা-বু সওমিত্ তাতাওওঅ-তে বলেন যে, ইকরিমার মতটি ভুল। তিনি হয়তো শবেবরাত সংক্রান্ত কতিপয় (দুর্বল) হাদীস দেখে ঐ মত পোষণ করেছেন। সুতরাং সূরা দোখানের মোবারক রাত শবেবরাত নয়। বরং তা হল শবেকদরেরই অন্য নাম। হাফেয ইবনে হাজার আস্‌কালানী বলেন, শবেকদরের রাতে একবারে গোটা কোরআন "লওহে মাহফূয" থেকে দুনিয়াবী আসমানে অবস্থিত বায়তুল ইযযাতে নাযেল করা হয়। তারপর প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু করে প্রায় ২৩ বছর ধরে এই পৃথিবীতে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপরে তা অবতীর্ণ হয় (ফতহুল বারী)।

কোরআন নাযেলের মোট সময় ২২ বৎসর, ২ মাস ২২ দিন। এর মধ্যে মক্কী অংশ কোরআনের ৩০ ভাগের ১৯ ভাগ এবং মদনী অংশ ৩০ ভাগের ১১ ভাগ (তারীখে ফেক্‌হে ইসলামী, ৩ ও ৬ পৃষ্ঠা)।

আরাবী কাদ্‌র শব্দের অর্থ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মর্যাদা ও সম্মান প্রভৃতি এবং কিছু বিদ্যানের মতে ভাগ্যনির্ধারণ। ভাগ্যনির্ধারণ রাত্রি বললে আয়াতটির ব্যাখ্যায় কতিপয় জটিলতা দেখা দেয়। তাই ঐ মতের সমর্থকরা ওর সমন্বয় এভাবে করেন। আসমান ও যমীন সৃষ্টির বহু আগে রোযে-আযলে আল্লাহ্ তাআলা ভাগ্যলিপি তৈরী করেন। অতঃপর শাবানের ১৫ই রাতে লওহে মাহফূযে লেখার জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে তা জানানো হয়। পরিশেষে রমাযান মাসে কদরের রাতে ঐ ভাগ্যলিপি লিখিত আকারে ইনচার্জ ফেরেশ্‌তাদের সোপর্দ করা হয়। যেমন রুযী, গাছপালা, বৃষ্টি প্রভৃতির লিপি মীকাঈল (আঃ)-কে এবং যুদ্ধ, ঝড়তুফান, হাওয়া-বাতাস, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ও ধ্বস নামানো প্রভৃতির লিপি জিবরীল (আঃ)-কে এবং আমলের লিপি ইসরাফীল (আঃ)-কে এবং বিপদ-লিপি আযরায়ীল (আঃ)-কে দেওয়া হয় (রূহুল মাআনী, আমপারা, ১৯২ পৃষ্ঠা)।

যে ব্যক্তি শবেকদরের রাতে তিনবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পড়ে প্রথমবার পড়ার জন্য তার গোনা মাফ করা হয়, দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তৃতীয় বারের জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো

http://islaminonesite.wordpress.com

হয় (কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)।

শেষ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, শবেকদর ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর ফলে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কমবেশী ১১/১২ ঘণ্টা যদি শবেকদরের মেয়াদ হয় তাহলে মক্কা-মদীনায় যখন রাত হয় তখন আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে দিন হয়। ফলে মক্কার সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সাথে যাদের সময়ের খুব বেশী ফারাক হয় তারা তাহলে শবেকদর পায় না। এর জওয়াব এই যে, আরবীতে "লায়ল" শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিন ও রাত উভয়েরই সময়ের জন্য বলা হয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যে, যাদের একের অপরের মধ্যে ২৪ ঘণ্টারও বেশী পার্থক্য আছে। যা আছে তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আছে। সেজন্য কাবা শরীফকে মাঝখানে রেখে ২৪ ঘণ্টার সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশই শবেকদর থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। জগদবিখ্যাত মনীষী হাফেয ইবনুল কাইয়েমের ছাত্র ইবনে রজব হাম্বালী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, শবেকদর সূর্যাস্ত হতে আরম্ভ কোরে পরের দিন পর্যন্ত থাকে (লাতায়িফুল মাআ-রিফ দ্রষ্টব্য)। মিসরের বিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা রশীদ রেযা বিভিন্ন রেওয়ায়াত ও উক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, লাইলাতুল কাদরের মেয়াদ ২৪ ঘণ্টা (তফসীর আলমানা-র)।

তফসীর সূরায়ে ইক্‌রা

একে সূরায়ে আলাক এবং সূরায়ে কলমও বলে। এতে ১৯টি বা ২০টি আয়াত আছে, যা সবারই মতে মক্কায় নাযেল হয়েছে। এর নাযেলের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কোরআনের এই সূরাটি সর্বপ্রথম নাযেল হয়। ইবনে আব্বাস, আবূ মূসা আশাআরী ও আয়িশা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এই মতের সমর্থক। হিরা গুহার ব্যাপারে বোখারী ও মুসলিম যে বিরাট হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেটাই এর দলীল। তাতে আছে: فجاءه الحق وهو في غار حراء فقال له اقرأ الحديث

অর্থাৎ হক বা সত্য এসে পড়ে তখন তিনি (সঃ) হিরা গুহায় ছিলেন। অতঃপর ফেরেশ্‌তা তাঁকে বললো, পড়ুন ..... । এ ব্যাপারে অনেক হাদীস এবং সাহাবীদের আ-সা-রও আছে। জমহুর (অধিকাংশ) ওলামা বলেন, সর্বপ্রথম এই সূরাটি নাযেল হয়। তারপর সূরা নূন অলকালাম, তারপর সূরা মুয্যাম্মিল এরপর মোদ্দাসসির। তফসীর খাযিনে নাযেল হওয়া অনুসারে সূরাগুলোর বিন্যাস দেওয়া হয়েছে এইভাবে যে, এটা মক্কী এবং এটা মাদানী। কাযী আবূবাক্‌র ইবনুত তাইয়িব বলেন, সূরাগুলোর যে বিন্যাস বর্ত্তমানে রয়েছে তা সাহাবায়ে কিরামের গবেষণার ফলে তৈরী হয়েছে। মক্কী তাঁর তফসীরে একথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এও বলেন যে, আয়াতগুলোর তারতীব বা বিন্যাস এবং সূরার প্রথমে

বিসমিল্লাহ রাখা নবী (সঃ) এর তরফ থেকেই সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু সূরা তওবার প্রথমে বিসমিল্লার হুকুম হয়নি। তাই সেখানে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি। এই উক্তিটি বেশী সঠিক। একদল পণ্ডিত বলেন যে, সূরাগুলোর ক্রমপর্যায়করণ তওফীকী বা আল্লাহ্-প্রদত্ত। হযরত উবাই, আলী ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের মোসহাফগুলোতে যে মতভেদ ছিল তা জিবরীল (আঃ) এর নিকটে রসূলুল্লাহ্‌র পূর্ণ কোরআন পেশ করার আগে ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত সূরাগুলো পরস্পর সাজান। মালেক বলেন, কোরআনের সংকলন সেইভাবেই হয়েছে যেভাবে নবী (সঃ) তা শুনতেন।

ইবনুল আমবারী বলেন, সমগ্র কোরআন প্রথমে দুনিয়াবী আসমানে নাযেল হয়। তারপর ২৩ বছরে কিছু কিছু কোরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ হয়। কখনো কোন ঘটনাকে উপলক্ষ কোরে সূরা নাযেল হোত এবং কখনো সওয়ালের জওয়াব অনুযায়ী আয়াত অবতীর্ণ হোত। জিবরীল (আঃ) সূরা ও আয়াতের জায়গা বাতলে দিতেন। আয়াত ও হরফ সমূহের বিন্যাসের মত সূরাগুলোর বিন্যাসও নবীজীর তরফ থেকে হয়েছে। সুতরাং এখন যদি কেউ কোন সূরাকে আগে-পিছে করেন তাহলে সে আয়াতগুলোর বিন্যাসকে নষ্টকারী এবং কোরআনের শব্দ ও হরফগুলোকে বিকৃতকারীতে পরিণত হবে। সূরা আনআম যদিও সূরায়ে বাকারার আগে নাযেল হয়েছে, তথাপি কোরআনের বিন্যাসে সূরায়ে আনআমকে পরে এবং সূরায়ে বাকারাহ্‌কে আগে রাখা হয়েছে। জিবরীল (আঃ) প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে নবীজীকে বলে দিতেন। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে বলতেন, এই সূরাটাকে অমুক জায়গায় রাখো।

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هِيَ تِسْعَ عَشَرَةَ اٰيَةً

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧
اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨ اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا
صَلّٰى ۝١٠ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢

http://islaminonesite.wordpress.com

أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾
كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ
خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا
لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

তরজমা

১। পড় তোমার সেই প্রতিপালকের নাম নিয়ে যিনি পয়দা করেছেন (সমস্ত সৃষ্টি জগতকে)। ২। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড হতে। ৩। পড়, তোমার প্রভু সেই মহিমাময়, ৪। যিনি কলম দ্বারা লেখনী শিক্ষা দিয়াছেন। ৫। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়াছেন যা সে জানতো না। ৬। না, না, (শিক্ষিত হলেও কি হবে) নিশ্চয় মানুষ (প্রায়ই) সীমালংঘন করেই থাকে। ৭। যখন সে নিজেকে বেপরোয়া দেখে। ৮। (কিন্তু জেনে রেখো যে, প্রত্যেককে) নিশ্চয় তোমার প্রভুর পানেই ফিরে আসতে হবে। ৯। তুমি দেখেছ তাকে—যে বারণ করে। ১০। (আল্লাহ্‌র) কোন বিশেষ বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে। ১১। তুমি কি লক্ষ্য করেছ (যে, ঐ নিষেধ সত্ত্বেও) সে (বান্দা নিজে) যদি সঠিক পথে চলে। ১২। এবং (অন্যকেও) তাক্‌ওয়ার বা সাবধান হওয়ার হুকুম করে? ১৩। তুমি কি (এটাও) ভেবে দেখেছ যে, সে (নিষেধকারী) যদি (রসূলকে) মিথ্যা জানে এবং (তাঁর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৪। তাহলে সে কি একথা জানে না যে, আল্লাহ্‌ (তাকে) দেখছেন? ১৫। (ব্যাপারটা) কখনই এরূপ নয়। (বরং আল্লাহ্‌ সবই দেখছেন। তাই তিনি বলেন) অবশ্য যদি সে (নিষেধকারী তাঁর নিষেধাজ্ঞা হতে) বিরত না হয় তাহলে আমি অবশ্য অবশ্য তার মাথার সামনের চুল ধরে হেঁচড়াব। ১৬। সেই মিথ্যাবাদী মহাপাপীর সামনের চুল ধরে! ১৭। সুতরাং সে (নিজের সাহায্যের জন্যে) তার মজলিসের লোকদের ডাকুক। ১৮। আমিও (জাহান্নামের) সিপাহীসান্ত্রীদের ডাকব। ১৯। না, না, কখনই তুমি তার কথা মেনো না। বরং (আল্লাহ্‌র দরবারে) সেজদা কর এবং (ঐ সেজদার মাধ্যমে তাঁর) নৈকট্য লাভ করতে থাক।

তফসীর

জিবরীল (আ:) সর্বপ্রথম যখন অহী আনেন তখন এই ৫টি আয়াতই আনেন।

নবী (স:) তার আগে কখনই লেখাপড়া জানতেন না। ইবনে কাসীর বলেন, আয়েশার হাদীসে এসেছে যে, রসূলুল্লাহ্‌র উপর অহীর (ঐশীবানীর) সূচনা ঘুমের মধ্যে সত্যস্বপ্নের দ্বারা হয়। তিনি যে স্বপ্ন রাতে দেখতেন তার বাস্তব রূপ পরদিন সকাল বেলায় দেখতে পেতেন। তারপর তিনি কিছুটা নিঃসঙ্গ-প্রিয় হোয়ে ওঠেন। ফলে তিনি হিরা গুহায় গিয়ে এবাদত করতে থাকেন। পরপর কয়েক রাত তিনি সেখানে কাটাতেন এবং সঙ্গে কোরে খাবার জিনিষ নিয়ে যেতেন। পুনরায় খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। আবার খাবার নিয়ে চলে যেতেন। এভাবে কিছুদিন করার পর তাঁর কাছে অহী এল তখন তিনি হিরাগুহায় ছিলেন।

ফেরেশ্‌তা এসে বললো: পড়ুন। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। এবার ফেরেশ্‌তা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে খুব জোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। তারপর বললো, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়াশুনা জানি না। আবার ফেরেশ্‌তা তাঁকে আলিঙ্গন কোরে জোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। ফলে তিনি খুবই ক্লান্ত হোয়ে পড়লেন। এবার ফেরেশ্‌তা বললো: ইকরা বিসমি রব্‌বিকাল্লাযী খালাক ..... মা-লাম ইয়ালাম। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স:) কাঁপতে কাঁপতে খাদীজার কাছে এসে পৌঁছুলেন এবং তাঁকে বললেন, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাই করলেন। তাঁর ভয় দূরীভূত হল। তারপর তিনি খাদীজাকে বললেন, এ আমার কি হল? অতঃপর তিনি তাঁকে সব বৃত্তান্ত বললেন। আরো বললেন যে, আমার প্রাণের আশংকা হচ্ছে। খাদীজা বললেন, না। আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। বরং এটা আপনার জন্য খোশখবর। আল্লাহ্‌ তাআলা কখনো আপনাকে লজ্জিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, লোকদের বোঝা তুলে দেন, মেহমানদের খেদমত করেন এবং সত্যের জন্য সাহায্য করেন।

তারপর খাদীজা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অরাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগে খৃষ্টান হোয়ে গিয়ে আরবী লিখতেন এবং হিব্রু ভাষায় বাইবেল লিখতেন। তিনি খুবই বুড়ো হোয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাঁকে বললেন, হে ভাই আমার! তোমার ভাইপোর কিছু কথা শোন। অরাকা বললেন, বাবা ভাইপো! কি দেখেছ তুমি? নবীজী যা দেখেছিলেন তা বললেন। কথাগুলো শুনে অরাকা বললেন, এটা সেই ফেরেশ্‌তা যে মূসা (আ:) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। হায়! আমি যদি জোয়ান হতাম! তোমার জাতি যখন তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে ততদিন আমি যদি বেঁচে থাকতাম! নবী (স:) বললেন, কি আমার কওম আমাকে তেড়ে দেবে? তিনি বললেন, হাঁ। শুধু তুমি কেন? তোমার আগে যে কেউ ঐ বাণী নিয়ে এসেছে তার জাতি তার দুশমনে পরিণত হয়েছে। যদি তোমার ঐ যুগটা আমি পাই তাহলে খুব জোরে কোমর বেঁধে আঁটসাট কোরে আমি তোমার সাহায্য

http://islaminonesite.wordpress.com

করব।

অতঃপর কিছুদিন গত না হতেই অরাকা মারা গেলেন এবং অহীও কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকলো। ফলে নবী (সঃ) খুব চিন্তিত হোয়ে পড়লেন এবং তাঁর মনে এরূপ হতে লাগলো যে, আমি যেন পাহাড়ে উঠে লাফ মারি। এভাবে যখন তিনি কোন পাহাড়ে চড়ে লাফ দেবার চেষ্টা করতেন তখন জিবরীল (আঃ) তাঁকে দেখা দিয়ে বলতেন, হে মুহাম্মদ! (সঃ) তুমি সত্যই রসূল! একথা শুনে তিনি থেমে যেতেন, তাঁর মন শান্ত হোত, তখন তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন। এরূপে অহী যখন আবার কখনো আসতে খুব দেরী হোত তখন তিনি ঐরূপ করতে চাইতেন! ফলে যখন তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুতেন তখনই জিবরীল (আঃ) তাঁকে দেখা দিতেন এবং ঐ কথা বলতেন (মুসনাদে আহমাদ)। এই হাদীসটি ইমাম যুহ্‌রী মারফত বোখারী ও মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। মতন, সনদ ও অর্থের দিক দিয়ে এই হাদীসটির বিশদ ব্যাখ্যা আমি বোখারী শরীফের ভাষ্যের (আওনুল বারীর) প্রথম খণ্ডে দিয়েছি। যিনি দেখতে চান ওখানে দেখে নিন।

সর্বপ্রথম কোরআন যে নাযেল হয় তা এই ৫টি পবিত্র ও বরকতপূর্ণ আয়াতই অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বপ্রথম রহমত যা তিনি তাঁর বান্দার উপর করেন এবং এটাই সর্বপ্রথম ন্যামত (বিশেষ দান) যা তিনি তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছেন। এই আয়াতগুলোতে মানুষের জন্মের প্রতি ইশারা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাকে মাত্র এক ফোঁটা জমাট খুন থেকে পয়দা করা হয়েছে এবং তার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাকে তা শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না। ইল্‌ম দ্বারা তিনি তাকে সম্মান দান করেছেন। এই জ্ঞান সেই সম্মান যার কারণে মানবজগতের পিতা আদম (আঃ) ফেরেশ্‌তাদের উপরে মর্যাদা পান। এই জ্ঞান কখনো মনে মনে হয়, কখনো মুখে মুখে হয়, আবার কখনো হাতে কলমে হয়। সেইজন্য বলা হয়েছে—পড়, তোমার প্রভু অতি মহান যিনি কলম দ্বারা লেখা শিখিয়েছেন। যা মানুষ জানতো না তিনি তা বাতলে দিয়েছেন। সাহাবীদের আসারে আছে যে, ইল্‌মকে লেখনী দ্বারা লিপিবদ্ধ কর। এও আছে যে, যে ব্যক্তি তার ইল্‌ম মোতাবেক আমল করে আল্লাহ্‌ তাকে অজ্ঞাত ইলমের অধিকারী করেন।

কাফের আবু জাহ্‌ল রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নামায পড়তে দেখলে চেড়াতেন। যদি সে সৎপথে থাকতো তা হলে সে লোককে ভাল কাজ শেখাতো। ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা এই আয়াতে আমাদেরকে এই খবর দিচ্ছেন যে, মানুষ যখনই নিজেকে ধনী ও পরমুখাপেক্ষীহীন মনে করে তখন সে প্রায়ই দুষ্ট প্রকৃতির এবং আত্মগর্বী ও উদ্ধত হয়। তারপর তাদেরকে ভয় দেখিয়ে এবং নসীহত কোরে আল্লাহ্‌ বলছেন যে, এই ইতরামি ও শেরকোশী কোরে লাভ কি? পরিশেষে মানুষকে তো আল্লাহ্‌র নিকটে আসতেই হবে। তখন তিনি তাদের সমস্ত মাল

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, সেগুলো তারা কোত্থেকে পেয়েছিল এবং কিভাবে খরচ করেছিল। আওনের হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ বলেন, দুজন লোভী এমন আছে যাদের পেট ভরে না। একজন জ্ঞানী এবং অপরজন দুনিয়া সন্ধানী। কিন্তু এরা দুজন একই প্রকৃতির নয়। কারণ, জ্ঞানী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে দিন দিন উন্নতি করতে থাকে এবং দুনিয়াওয়ালা সেরকোশী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশে ধীরে ধীরে চরমে উঠতে থাকে (ইবনে আবী হাতেম)। অতঃপর আবদুল্লাহ এই আয়াত পড়েন :—

إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

ইন্নাল ইনসা-না লাইয়াত্‌গা আর রআ-হুস্‌তাগ্‌না (নিঃসন্দেহে মানুষ তখনই উদ্ধত হয় যখন সে নিজেকে বেপরোয়া মনে করে)। এবং জ্ঞানীদের ব্যাপারে একথা বলেন :—ইন্নামা ইয়াখ্‌শাল্লা-হা মিন ইবাদিহিল ওলা-মা-উ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে)। এই বক্তব্যটি মরফুভাবেও বর্ণিত হয়েছে এভাবে—একদা আবু জাহ্‌ল রসূলুল্লাহকে (সঃ) কাবা ঘরের নিকটে নামায পড়ার কারণে বকাঝকা করে। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে প্রথমে খুব ভাল কোরে নসীহত করে বলেন, যাকে তুমি সোজা পথে চলতে বাধা দিচ্ছ সে নিজের পথে থাক বা না থাক, তাকে বাধা দিয়ে তোমার লাভ কি? তাকে তো আল্লাহ্‌ দেখছেন, তার কথা শুনছেন এবং তিনি তাকে তার কর্মফলের বদলা দেবেন। তারপর আল্লাহ্‌ এই হুমকী দিয়েছেন যে, যদি ঐ বাধাদানকারী তার হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে বিরত না হয় তাহলে আমি তাকে মুখ থেঁৎড়ে টেনে আনবো। না-সিয়ার ভাবার্থ আবু জাহলের কপালের সামনের চুল। আল্লাহ্‌ তাকে কথার মিথ্যুক এবং কাজের পাপী বলেছেন। তারপর বলেন যে, সে তার সাহায্যের জন্য তার গোত্র ও আত্মীয় স্বজনদের ডাকুক এবং আমি আযাবের ফেরেশ্‌তাকে ডাকছি। যাতে সে বুঝতে পারে যে, তার দল জয়ী হয়, না আমার দল।

বোখারী শরীফে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা আবু জাহ্‌ল বলেছিলেন যে, যদি আমি মুহাম্মদকে কাবার নিকট নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব। একথা নবী (স:) শুনে বললেন: যদি সে এই রূপ করে তাহলে ফেরেশ্‌তা তাকে ধরে ফেলবে (তিরমিযী, নাসায়ী)। ইবনে জরীরেও এরূপ বর্ণনা আছে। তাঁর অন্য শব্দ এই যে, নবী (স:) একদা মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়ছিলেন। পাশ দিয়ে আবু জাহ্‌ল ইবনে হিশাম যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে এই জায়গায় নামায পড়তে মানা করে ছিলাম না? তখন নবী (স:) তাকে কড়া কথা বলেন এবং ধমক দেন। অতঃপর আবু জাহ্‌ল বলে, তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ কেন? আল্লাহ্‌র কসম! এই উপত্যকায় সবচেয়ে বড় মজলিস আমারই। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা এই আয়াত নাযেল করেন: ফলইয়াদ্‌ও না-দিয়াহ* সানাদউয্‌ যাবা-নিয়াহ। ইবনে আব্বাস বলেন, যদি সে তার মজলিসের লোকগুলোকে ডাকতো তাহলে তক্ষুনি আযাবের ফেরেশ্‌তা তাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

ধরে ফেলতো (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জরীর)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। তাঁর তৃতীয় শব্দ এই যে, যদি সে এইরূপ করতো তাহলে ফেরেশ্‌তা তাকে সবারই সামনে ধরে ফেলতো এবং ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যুর আকাংখা করতো তাহলে তৎক্ষনাৎ তারা মরে যেত এবং তাদের বসবার জায়গায় আগুন দেখতো। আর মুবাহিলাকারীরা যদি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো তাহলে তারা ফিরে গিয়ে মালধনও পেত না এবং ছেলে পুলেও পেত না (মুসনাদে আহমাদ)। তাঁর চতুর্থ শব্দ এই যে, একদা আবূ জাহ্‌ল বলেছিল, যদি মুহাম্মদ (স:) কাবার নিকটে নামায পড়ে তাহলে আমি তাঁকে জান থেকে মেরে ফেলব। অতঃপর নবী (স:) এলেন এবং নামায পড়লেন। কোন একজন লোক আবূ জাহ্‌লকে বললো, কই মুহাম্মদকে তুমি কিছু বললে না? তোমাকে কে বাধা দিল? সে বললো, আমি নিজের ও তার মধ্যে একদল লশ্‌করের পাহারা দেখতে পেলাম। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আবূ জাহ্‌ল এক পা নড়তো তাহলে ফেরেশ্‌তারা তাকে গ্রেফতার করতো এবং লোকেরাও এই মজার ব্যাপারটা দেখতে পেত (আহমাদ)। আবূ হোরায়রার শব্দ এই যে, একবার আবূ জাহ্‌ল বললো, কিগো মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে নিজের মুখকে মাটিতে রগড়ায়? লোকেরা বললো, হাঁ। অতঃপর আবূ জাহ্‌ল বললো, লাত ও ওয্‌যার কসম! যদি আবার আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে আমি তার ঘাড় মটকে দেব এবং তার মুখ মাটিতে থেঁতলে দেব। অতঃপর আবূ জাহ্‌ল ঘুরে এল এবং নবী (স:)-কে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার ঘাড়ে পা দিয়ে মাড়াতে চাইল। কিন্তু তা না করে সে নিজেই পিছু হটে এল এবং দু হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে লাগল। লোকেরা বললো, তোমার কি হল? সে বললো, আমার এবং তাঁর মাঝখানে একটি আগুনের গর্ত রয়েছে আর কিছু পলকও রয়েছে। নবী (স:) বলেন, যদি সে আমার নিকটে আসতো তাহলে ফেরেশ্‌তা তার এক একটি অঙ্গ ছিঁড়ে ফেলতো। তখন আল্লাহ্‌ এই সূরাটি নাযেল করেন (ইবনে জারীর, আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেম)।

তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা নবী (স:)-কে বলেন, তুমি ইবাদত ছেড়ে দেবার ব্যাপারে তার অনুসরণ কোর না। বরং যেখানেই তোমার মন চায় সেখানেই তুমি নামায পড় এবং তার পরোয়া কোর না। আল্লাহ্‌ই তোমার রক্ষক। তিনি তোমাকে লোকের হাত থেকে হিফাযতে রাখবেন। তুমি সেজদা কর এবং আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হও। আবূ হোরায়রার হাদীসে মরফূভাবে বর্ণিত হয়েছে: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয় সেজদার অবস্থায়। সুতরাং তোমরা সেজদার অবস্থায় বেশী কোরে দোআ কর (মুসলিম)। হাদীসে আছে যে, নবী (স:) ইযাস্‌ সামা-উন শাক্কাত ও ইকরা বিস্‌মি সূরাতে সেজদা করতেন।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে—পড় তোমার কাছে যা অহী করা হয়েছে। কিংবা তোমার উপরে যা নাযেল হয়েছে। অথবা তোমাকে যার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তোমার প্রভুর নাম নিয়ে পড়। আল্লামা সুয়ূতী ইতকানে লিখেছেন যে, কোরআনের প্রথম সূরা এই 'ইক্‌রা'। এটা যেন ভূমিকা স্বরূপ সূরা ফাতেহার মত। এটাই সর্বপ্রথম নাযেল হয়। এতে পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করার আদেশ রয়েছে। এতে ইলমে আহ্‌কাম বা বিধিনিষেধ জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ণনাও এতে রয়েছে। এতে উসূলে দ্বীন বা ধর্মের বুনিয়াদী নীতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এতে ইল্‌ম শেখার হুকুম রয়েছে। এজন্য এর নাম "কোরআনের শিরোনামা" রাখা সঙ্গত। কারণ, বইয়ের শিরোনাম বইয়ের সমস্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হয়ে থাকে।

আবুস্‌ সউদ বলেন, এখানে রব্বের গুণ খালেক বা সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। কারণ, মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম ন্যামত তাকে পয়দা করা। এর ওপরেই বাকি সমস্ত ন্যামতই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবনে কালবী বলেন, এর মধ্যে একথার ইশারা রয়েছে যে, যিনি মানুষকে পয়দা করার কুদরত রাখেন তিনিই মানুষকে আয়ু ও বিশেষ মর্যাদা দান করেন। তিনি মানুষকে পড়া শেখানোরও শক্তি রাখেন। তিনি আদম সন্তানকে একটি রক্তপিণ্ড থেকে পয়দা করেন। নবী (সঃ) বলেছিলেন যে, আমি পড়তে জানি না। অর্থাৎ তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁর এই নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা প্রথমে ইক্‌রা বা পড় বলার পর আবার বললেন:— ইক্‌রা অরব্বুকাল আকরাম। কালবী বলেন, তোমার রব্ব খুবই ধৈর্যশীল। কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের মূর্খতার কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে তাড়াতাড়ি করেন না। কেউ বলেন, প্রথম "পড়" হুকুম নবীজীর জন্য এবং ২য় "পড়"টা তাঁর উম্মতের তবলীগের জন্য। কিন্তু প্রথমটাই বেশী ঠিক।

আকরাম শব্দটি মোবালাগাহ বা আধিক্যব্যঞ্জক শব্দ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র করম বা দান সব রকম করমের চেয়ে বেশী। কারণ, তাঁর ন্যামত অগণিত। যাজ্জাজ বলেন, আল্লাহ্‌ মানুষকে কলম দিয়ে লেখনী শিখিয়েছেন। সুতরাং এখন সে সমস্ত লিখিত জিনিষ বুঝতে পারে। কাতাদাহ বলেন, কলম আল্লাহ্‌র একটি বড় দান। যদি এটা না থাকতো তাহলে দ্বীন কায়েম থাকতো না এবং জীবন যাপনও সুখের হোত না। এটাই আল্লাহ্‌র বিরাট দানের প্রমাণ যে, তিনি তার বান্দাদেরকে তা শিখিয়েছেন যা সে জানতো না। তাদেরকে তিনি মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে টেনে এনেছেন এবং লেখনী-জ্ঞানের মাহাত্ম্য জ্ঞাত করিয়েছেন। লেখনীর উপকার অগণিত। সব রকম বিদ্যার সংকলন, সব রকম জ্ঞানের লিপিবদ্ধ হওন, আগেকার মণীষীদের রচনাবলী ও সংবাদাদির সংরক্ষণ এবং আসমানী কেতাব সমূহের সংরক্ষণ প্রভৃতি এই লেখনীর বদৌলতেই হয়েছে। যদি এটা না থাকতো

http://islaminonesite.wordpress.com

তাহলে দুনিয়ার সমস্ত বিষয়াদি কায়েম থাকতো না। আল্লাহ্‌র সুক্ষজ্ঞান ও চুলচেরা বিচার ব্যবস্থার কোন প্রমাণ যদি না-ই থাকতো তথাপি এই কলম ও লেখনী যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হোত। কলম বলা হয় কর্তন করাকে সেজন্য কাটা ও ছাঁটার কারণে কলমকে কলম বলে। সর্ব প্রথম যিনি লেখেন তিনি ইদরীস (আঃ)। অথবা আদম (আঃ)। আল্লাহ্‌ তাআলা এই কলম দিয়ে তাঁকে সমস্ত খুঁটিনাটি ও সমগ্র বিষয়াদি শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে ইন্‌সান বলতে আদম (আঃ)। যেমন কোরআনে আছে: وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا আল্লাহ্‌ তাআলা আদমকে সব জিনিষের নাম শিখিয়েছেন। অথবা ইনসান বলতে আল্লাহ্‌র রসূল। কিন্তু অধিক সঙ্গত মত এই যে, এই ইনসান শব্দটি বিশেষ অর্থে না নিয়ে ব্যাপক অর্থে নেওয়া উচিত। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানবজাতিকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

كَلَّآ কাল্লা শব্দটি ডাঁটের জন্য কিংবা হাক্কা অর্থ প্রকাশের জন্য। এর ভাবার্থ এই যে, মানুষ যখনই নিজেকে বেপরোয়া মনে করে তখনই সে সীমা লংঘন করতে থাকে এবং নিজের পরওয়ার দেগারের সামনে ডিং মারতে থাকে। তার এই বেপরোয়া মনোভাব তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও মালধনের অহংকারের কারণে হয়। মুকাতিল বলেন, আবু জাহ্‌ল যখন দৌলত পেত তখন সে জামা কাপড়, খানাপিনা ও শারাব-কাবাবে খুব বাড়াবাড়ি করতো। এটাই তার সেরকোশী ও ঔদ্ধত্য। কালবীও একথা বলেন।

ইমাম রাযী বলেন, এই সূরাটির প্রথম অংশ বিদ্যার সুনামের প্রমাণ এবং শেষাংশ মালধনের দুর্নামের দলীল। এই সূরাটি দ্বীন ও ইল্‌মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির এবং দুন্‌য়া ও মালের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির ব্যাপারে যথেষ্ট। রুজ্‌আ এর অর্থ মারজা বা জায়গা। এর মধ্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশের পরিণামের প্রতি হুমকি আছে। কারণ, আল্লাহ্‌ এর পরিণাম ক্ষতি, দারিদ্র্য ও মৃত্যু করে থাকেন। মুফাস্‌সিরদের মতে না-হী আনিস সালা-ত বা নামাযে বাধাদানকারী ব্যক্তি আবু জাহ্‌ল। একদা নবী (সঃ) নামায পড়ছিলেন তখন আবু জাহ্‌ল তাঁর পিঠের ওপরে উটের নাড়ীভুড়ি চাপিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌ বলেন, হযরত হেদায়াত বা সঠিক পথে আছেন এবং তাক্‌ওয়ার হুকুম দেন। তাক্‌ওয়ার ভাবার্থ খাঁটি একত্ববাদ ও সৎকাজ। যদ্বারা মানুষ আগুন থেকে বাঁচতে পারে। আবু জাহ্‌ল তাঁকে মিথ্যা মনে করে এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে এটা জানে না যে, আল্লাহ্‌ তার কথাবার্তা ও কাজ-কর্মকে দেখছেন। সুতরাং যখন তিনি দেখছেন তখন তিনি তাকে তার কথা ও কাজের বদলা নিশ্চয়ই দেবেন। এই ইস্তিফহাম বা জিজ্ঞাস্য ডাঁট ও হুমকির জন্য। তারপর আল্লাহ্‌ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, যদি সে ঐসব অন্যায় আচরণ থেকে বিরত না হয় তাহলে আমি তার মাথার চুল ধরে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে আনব।

সাফউন খুব জোরে টানাকে বলে। যাকে বাংলায় হেঁচড়ান বলে। এই হেঁচড়ান আগুনের দিকে হবে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন: يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ (অর্থাৎ তাদের মাথার চুল ও পা ধরে হেঁচড়ান হবে)। কিংবা সাফউনের অর্থ দুনিয়ার আযাব। বদরের দিনে মুসলমানরা কাফেরদেরকে কতলের জন্য টেনে আনে এবং তাদেরকে হত্যা কোরে গর্তে ফেলে দেয়। না-সিয়াহ বলে কপালকে। আল্লাহ্‌ বলেন, এখন তারা তাদের সাহায্যকারীদেরকে ডাকুক এবং আমিও আমার জাহান্নামের দারোগা পাষানহৃদয় ফেরেশ্‌তাদেরকে ডাকছি। হে রসূল! তুমি কখনই তার কথা শুনবে না। বরং আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদা কর এবং ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্যলাভের চেষ্টা কর। অথবা হে আবু জাহ্‌ল! তুমি আগুনের নিকটবর্তী হও। কিন্তু প্রথমটাই বেশী ঠিক। সেজদার ভাবার্থ নামায কিংবা কোরআন তেলাঅতের সেজদা। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াত পড়ে সেজদা করেছিলেন।

সংযোজন

এই সূরাতে সিরিয়ান-বিদ্বানদের মতে ১৮টি আয়াত, ইরাকীদের মতে ১৯টি এবং হিজাযীদের মতে ২০টি আয়াত আছে। এতে শব্দ আছে ৯২টি এবং অক্ষর ২৮০টি (আল্লামা মাজদুদ্দীন ফীরোযোবাদী রচিত বাসা-য়িরু যাভিত তাম্‌য়ীয ফী লাত্তা-য়িফিল কিতা-বিল আযীয ১ম খণ্ড, ৫২৯ পৃষ্ঠা)।

এই সূরা দুটি অংশে বিভক্ত। ১ম অংশ শুরু থেকে ৫টি আয়াত পর্যন্ত এবং ২য় অংশ ৬ষ্ঠ থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। প্রথম পাঁচটি আয়াত সম্পর্কে প্রায় সমস্ত বিদ্বানই একমত যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর হিরাগুহায় ধ্যানরত অবস্থায় এই পাঁচটি আয়াত দ্বারা তাঁর উপরে কোরআন নাযেলের ধারা শুরু হয়। এর কিছুদিন পর এই সূরার দ্বিতীয় অংশ তখন নাযেল হয় যখন আবু জাহ্‌ল রসূলুল্লাহ (সঃ)কে কাবা শরীফে নামায পড়তে বাধা দেয়।

কোরআনের কোন্‌ অংশ সর্বপ্রথম নাযেল হয় এ সম্পর্কে চারটি মত পাওয়া যায়। (১) সূরা ইকরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (২) সূরায়ে মুদ্দাস্‌সির (৩) সূরায়ে ফা-তিহা (৪) বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম। এর মধ্যে সমন্বয় করা হয় এভাবে যে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সূরা ইকরার প্রথম পাঁচটি আয়াত, গোটা সূরা নয়। তারপর প্রায় তিন বছর অহী বন্ধ থাকে। এই বন্ধের পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সূরায়ে মুদ্দাস্‌সির। গোটা সূরা হিসেবে সর্বপ্রথম নাযেল সূরায়ে ফা-তিহা এবং একটি গোটা আয়াত হিসেবে নাযেল হয় বিসমিল্লা হির রহমা-নির রহীম (ইতকা-ন, ১ম খণ্ড, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা)।

হিরাগুহায় রসূলুল্লাহ (সঃ) কতদিন ছিলেন এ ব্যাপারে বোখারী, মুসলিম ও সীরাতে ইবনে ইসহা-কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সেখানে এক মাস অর্থাৎ গোটা রমাযান মাসে ছিলেন। আল্লামা যুরকানী বলেন, এর চেয়ে বেশী দিনের সঠিক

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্ণনা পাওয়া যায় না। মিসওয়া-র ইবনে মুসআব বলেন চল্লিশ দিন। ইমাম হাকিম প্রমুখ বলেন, মিসওয়ার পরিত্যক্ত রাবী। সেজন্য তাঁর বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। ঐ ধ্যানে তিনি ইবাদত কিভাবে করতেন— সে সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তিনি নূহ, ইবরাহীম ও ঈসা (আঃ) এর শরীআত মোতাবেক ইবাদত করতেন। কিন্তু এই মতটা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বলে সাধারণ জ্ঞানও ঐ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। সঠিক কথা এই যে, ঐ গুহায় তিনি সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন ছিলেন (তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ৩০১ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুহায়লী বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় অহীর মাঝখানে অহী বন্ধের সময় ছিল আড়াই বছর। ইমাম আহমাদের তারীখে শাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নবী হন চল্লিশ বছর বয়সে (ঐ, ৩০২ পৃষ্ঠা)।

কোরআন নাযেলের সর্বপ্রথমে নামায, রোযা যাকাত ও হজ্জের হুকুম না এসে 'ইকরা' শব্দটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়ায় একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মে শিক্ষার গুরুত্ব কত। পেটে বিদ্যা না থাকলে একজন লোক নিজেকে চিনতে পারে না এবং স্বীয় গুরুত্বও উপলব্ধি করতে পারে না। তাই নবী (সঃ) এর উপর অহী নাযেলের সূচনায় শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা পর পর ২ বার বললেন, 'একরা ..... একরা'। অর্থাৎ হে কোরআন পাঠক! তুমি যদি সত্যিকার মানুষ হতে চাও তাহলে লেখাপড়া কর এবং এই পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজ প্রভুকে চিনবার ও জানবার চেষ্টা কর।

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার তালীম দিয়ে এই সূরাটি আরম্ভ করা হয়েছে এবং নামায ও এবাদতের নির্দেশ দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে যাতে পুঁথিগত বিদ্যা এবং বাস্তব আমলের মধ্যে সামঞ্জস্য হোয়ে যায় (মাঅ্ আলা-মিল মোফাসসিরীন, ৩০ পারা, ১০৭ পৃষ্ঠা)। শিক্ষাই সেই গুণ, যদ্বারা আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-কে ফেরেশ্‌তাদের উপর সম্মান দিয়েছিলেন (ঐ, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার ২য় আয়াতে মানুষ সৃষ্টির বর্ণনার পর পরের তিনটি আয়াতে তাকে তালীম দেবার বর্ণনা আছে। কারণ, শিক্ষাই সেই গুণ যদ্বারা মানুষ অন্যান্য সৃষ্টিজগত থেকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য প্রাণীজগত থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়। শিক্ষার সাধারণ উপায় দুটি: (১) মৌখিক (২) কলম ও রেখা দিয়ে লৈখিক। ১ম আয়াতটির 'ইকরা' শব্দ দ্বারা মৌখিক শিক্ষা প্রমাণিত হলেও যেখানে তালীম দেবার বর্ণনা আছে সেই ৪র্থ আয়াতে কলমী ও লেখনী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সহী হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ان اول ما خلق الله القلم অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে বলেন, লেখ। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা সে লিখে দেয় (তিরমিযী, মেশকাত, ২১ পৃষ্ঠা)। ঐ লিখিত কেতাবটি আল্লাহ্‌র কাছে আরশের উপরে আছে (বোখারী,

মুসলিম)। তফসীরের বিখ্যাত পণ্ডিত হযরত মোজাহেদ (রহঃ) আবু আম্‌র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে মাত্র ৪টি জিনিষ নিজের কুদরতী-হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং বাকি জিনিষগুলোর ব্যাপারে বলেন, 'কুন' অর্থাৎ হোয়ে যাও। ফলে তা অস্তিত্বে এসে যায়। ঐ ৪টি বস্তু এই: (১) কলম (২) আরশ (৩) জান্নাতে আদ্‌ন (৪) হযরত আদম আলায়হিস সালাম (মাআ-রিফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৮৫ পৃষ্ঠা)।

কাব বলেন, সর্বপ্রথম লেখেন হযরত আদম (আঃ) এবং যাহহাক বলেন, সর্বপ্রথম লেখেন হযরত ইদরীস (আঃ)। আল্লামা আলুসী বলেন, ঐ কথার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৪র্থ ও ৫ম আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ লেখনীর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ, লেখনীর দ্বারা বিরাট উপকার হয় এবং মহাসম্মান পাওয়া যায় (রূহুল মাআ-নী, আমপারা, ১৮১ পৃষ্ঠা)। ইংরাজীর সেক্সপীয়ার, জার্মানীর গ্যেটে, রাশিয়ার টলষ্টয়, ইটালির ভার্জিল, গ্রীকের হোমার, বাংলার রবিঠাকুর, আরাবীর ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ সহ অগণিত মনীষী আজ লেখনীর কারণে মরেও অমর এবং মহাসম্মানের পাত্র। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম সমাজ এ ব্যাপারে খুবই অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলার আলেম সমাজ বাংলা ভাষায় লেখনী চালনার ব্যাপারে তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি এবং এখনও তাঁদের অধিকাংশের মধ্যে লেখনী চালনার চৈতন্যের উদয় হয়নি।

একদা সোলায়মান (আঃ) ইফরীত জিনকে জিজ্ঞেস করেন, কথা কি জিনিষ? তিনি বলেন, তা বায়ু, যা অস্থায়ী। তাহলে একে আয়ত্বে রাখবার উপায় কি? বললেন, লেখনী। কারণ, কলম হল শিকারী। সে সবরকম বিদ্যাকে লেখনীর মাধ্যমে শিকার করতে পারে। সে লোককে হাসাতে ও কাঁদাতে পারে। তার ইঙ্গিতে মানুষ কখনো ঝুকে যায়, আবার কখনো সেজদায় রত হয়। কলম জিহ্বার প্রতিনিধি হতে পারে। কিন্তু রসনা রচনার প্রতিনিধি হতে পারে না। (কবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)। হিটলারের Mein kompof বইটি মাত্র ১৩ বছরে ৫০ লাখ বিক্রি হোয়ে এক একটি শব্দের বিনিময়ে ১২৫ জন জার্মানীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠা ৪ (চার) হাযার ৭ জনের এবং প্রত্যেক অধ্যায় ১২ লাখ লোকের প্রাণ বিসর্জন দেয় (The Books that changed the World এর উর্দু অনুবাদ, ১৮৪-২০০ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার ৬ষ্ঠ আয়াতে এই উম্মতের ফিরআওন আবু জাহল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: لَيَطْغٰى —লাম তাকীদ সহকারে মোযারার সীগা Present Tense)। কিন্তু মূসার ফিরআওন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ —তগা শব্দটি Past Tense এবং তাকীদহীন। উক্ত দুই আয়াতের বাকশৈলী দ্বারা বোঝা যায় যে, মূসার ফিরআওনের চেয়ে মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিরআওন খুবই মারাত্মক ও বেশী ক্ষতিকারক। তাই আবু জাহ্‌লের মরণ খবর শুনে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন : فرعونى اشد من فرعون موسى অর্থাৎ আমার ফিরআওন মূসার ফিরআওনের চেয়ে মারাত্মক। কারণ মূসার ফিরআওন প্রথম দিকে মূসার প্রতি ইহসান করেছিল এবং মরণের সময় বলেছিল آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করলাম যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই যার উপরে বানী ইসরাইলগণ ঈমান এনেছে— (সূরা ইউনুস ৯০ আয়াত)। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল রসূলুল্লাহ্‌র শৈশব থেকে তাঁর (সঃ) প্রতি হিংসা করতো এবং মরণকালেও বলেছিল : بلغوا عنى محمدا انى اموت ولا احد ابغض الى منه তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে একথা পৌঁছে দিও যে, আমি মরছি, এমতাবস্থায়ও তাঁর চেয়ে রাগের পাত্র আমার কাছে আর কেউ নেই (কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৩৫ ও ৪৪১ পৃষ্ঠা)।

ঐরূপ সে নিজের মরণকালে এও বলে, لو غير اكار قتلنى হায়! কোন চষীভূত যদি আমাকে কতল না করতো (তাহলে কি ভালই না হোত)! তাকে খুন করার সময় তার বুকের উপর যখন ইবনে মসউদ চড়ে বসেন তখন সে বলে, يا راعى الغنم لقد ارتقيت مرتقى هে বকরীর রাখাল! তুমি খুব কঠিন সিঁড়িতে চড়েছো এবং هل اعظم من رجل قتلتموه যাকে তুমি খুন করছো তার চেয়ে আর কোন সম্মানী ব্যক্তিকে তুমি খুন করেছো কি? উক্ত সমস্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, আবূ জাহ্‌লের দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য মূসার ফিরআওনের চেয়েও কত সাংঘাতিক ছিল। তাই তার জন্য 'লাম' তাকীদ সহ Present Tense ব্যবহৃত হয়েছে (তফসীর ফতহুল আযীয, আমপারা ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম আয়াত পর্যন্ত মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আবূ জাহ্‌লের মত যারা সীমালংঘন করে থাকে তারা জেনে নিক যে, এই দুনিয়ায় তারা যতই লম্ফঝম্প করুক না কেন একদিন না একদিন তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে আসতেই হবে এবং তাদের ঔদ্ধত্যের জওয়াবদিহী করতে হবে তখন তাদের কি হবে? অতএব মানুষ যেন খুব বাড়াবাড়ি না করে বরং সে যেন সাধ্যমত সংযত হোয়ে তার প্রভুর নির্দেশ মত চলে।

৯ম থেকে ১৬শ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, আবূ জাহ্‌লের মত যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নামায পড়তে বাধা দেয় এবং পরহেযগারী জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে তাকে পরকালে তার মাথার চুলের মুঠি ধরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে এবং আল্লাহ্‌ চাইলে ইহকালেও ঐ শাস্তি তিনি দিতে পারেন যেমন আবূ জাহ্‌লকে দিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, সূরা রহমান যখন নাযেল হয় তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এই সূরাটি কোরায়েশ নেতাদের সামনে কে পড়বে? তখন ইবনে মসউদ দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, আমি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাঁর দূর্বল শরীর এবং ছোট দেহের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে পড়ার অনুমতি দিলেন না। এভাবে তিনি (সঃ)

তিনবার জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনবারই ইবনে মসউদ বলেন, আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। এবার ইবনে মসউদ তাদের কাছে গেলেন তখন তারা কাবার আশেপাশে ছিল। তিনি পড়া শুরু করলেন। ওদিকে আবূ জাহ্‌ল উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁকে চড় মারতে লাগলো, তাঁর কান ছেঁদা করলো এবং তাঁকে রক্তে রক্তাক্ত কোরে দিল। তিনি ফিরে এলেন। তখন তাঁর দুচোখ বেয়ে পানি ঝরছিল। অতঃপর জিবরীল (আঃ) হাসতে হাসতে অবতীর্ণ হলেন। ইবনে মসউদের ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন। অতঃপর নবী (সঃ) ইবনে মসউদকে বললেন, অচিরে তুমি এর প্রতিফল জানতে পারবে। পরিশেষে যখন বদর যুদ্ধের দিন এল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, নিহতদের মধ্যে আবূ জাহ্‌লকে খোঁজ। অতঃপর ইবনে মসউদ তাকে যমীনে পদদলিত হোয়ে পড়ে থাকতে দেখা পেলেন। ফলে তিনি তার বুকের উপরে চড়ে বসলেন। সে চোখ খুলে ইবনে মসউদকে চিনতে পেরে বললো, হে রাখাল-ছেলে! তুমি কঠিন সিঁড়িতে চড়েছো। তখন ইবনে মসউদ বললেন, ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না। অতঃপর তিনি তার মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। তখন ঐ মালউন বললো, তোমার নয়, বরং আমারই তলোয়ার দিয়ে কাটো। তিনি তা কাটলেন, কিন্তু তা তুলতে পারলেন না, তাই তার কানটা ছেঁদা করলেন এবং তাতে একটা সুতো দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে রসূলুল্লাহ (সঃ) কাছে নিয়ে এলেন। অতঃপর জিবরীল (আঃ) হাসতে হাসতে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কানের বদলে কান এবং মাথাটা ফাও। আবূ জাহ্‌ল মাথার চুলে খুব বেশী চিরুনী দিত এবং খুবই খোশবু মাখতো সেজন্য ১৫নং আয়াতে "না-সিয়াহ" বা কপালের চুলের উল্লেখ করা হয়েছে (রূহুল মাআ-নী. আমপারা, ১৮৭ পৃষ্ঠা)।

১৬নং আয়াতে খা-তিয়াহ (خاطئة) শব্দ এসেছে। আরবীতে খা-তি এবং মুখ্‌তী দুটি শব্দ আছে। দুটির মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্যও আছে। মোফাসসিরগণ বলেন, খা-তীর অর্থ ইচ্ছাকৃত পাপী। যার প্রতিফল আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি এবং মুখ্‌তীর অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভুলকারী। যে আল্লাহর ক্ষমাও পেতে পারে। খাতী সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন, من غسلين لا يأكله الا الخاطئون অর্থাৎ কেবলমাত্র ইচ্ছাকৃত-পাপীগণই জাহান্নামীদের পচাগলা শরীর থেকে প্রবাহিত পুঁজ খাবে (সূরা আলহা-ক্কাহ, ৩৬-৩৭ আয়াত)। মুখ্‌তী সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا অর্থাৎ প্রভু গো! যদি কোন ভুল কোরে ফেলি কিংবা অনিচ্ছাকৃত পাপে লিপ্ত হোয়ে পড়ি তাহলে আমাদেরকে ধরপাকড় কোর না (সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াত)। ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)।

১৭ ও ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আবূ জাহ্‌লের মত কেউ যদি তার লোকবল ও ধনবলের আস্ফালন করে তাহলে সে যেন জেনে নেয় যে, জাহান্নামের সিপাহীসান্ত্রী তার দর্পচূর্ণ কোরে দেবে। যেমন আবূ জাহ্‌লের দন্ত মাটিতে মিশে

http://islaminonesite.wordpress.com

গিয়েছিল। হাদীসে আছে যে, এই সূরার ৬নং আয়াত থেকে শেষ আয়াতগুলো নাযেল হবার পর আবূ জাহ্‌ল লোকমুখে যখন তা জানতে পারে তখন সে রসূলুল্লাহর কাছে এসে অমানুষিক বেআদবী করে এবং বলে, রে মূর্খ! তুমি জান কি যে, তুমি কাকে ভয় দেখাচ্ছ? আমি যদি চাই তাহলে এখনই এই ধূলপাড় ময়দানটিকে অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী দিয়ে ভরে দিতে পারি। তার ঐ দম্ভের জওয়াবে আল্লাহ্‌ তাআলা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ কোরে বলেন, সে তার আসর-বন্ধু ও সাঙ্গপাঙ্গদের ডাকুক তাহলে আমিও আমার জাহান্নামের সিপাহীসান্ত্রীদের ডাক দেব। আয়াতগুলো নাযেলের বেশ কিছুদিন পর বদর যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম আবূ জাহ্‌লের মাথার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে এক দুর্গন্ধময় কুয়ায় ফেলে দেন। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র সৈন্য ফেরেশ্‌তারাও তাকে আযাবে গেরেফতার করে নেয় (ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)।

যেসব ফেরেশ্‌তা কাফেরদের ধরে জাহান্নামে ফেলবে সেই যাবা-নিয়ার সংখ্যা সূরা মুদ্দাসসিরের ৩০নং আয়াতে বলা হয়েছে عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ অর্থাৎ ১৯টি ফেরেশ্‌তা জাহান্নামের দরজায় মোতায়েন থাকবে। মোজাহেদ বলেন, জাহান্নামের ঐ দারোগাদের পা-গুলো যমীনে এবং মাথাগুলো আসমানে থাকবে। ওরা কাফেরদের জাহান্নামে ফেলবে বলে ওদের নাম যাবা-নিয়াহ বা নিক্ষেপকারী রাখা হয়েছে। ওদের সর্দারের নাম মালেক। বাকি আঠারাজন ওর অধিনস্থ। ওদের চোখগুলো বিদ্যুতের মত চমকানো, দাঁতগুলো নীলগায়ের শিংয়ের মত বাঁকানো এবং চুলগুলো যমীন পর্যন্ত লুটানো আর মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে। ওদের একটি কাঁধ থেকে অপর কাঁধ পর্যন্ত এক বছরের পথ এবং হাতের তালুতে ৭০ হাযার মানুষ আঁটতে পারে (ঐ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা, কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা তফসীরে বাগাভী, ৯ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)।

আবূ জাহ্‌ল রসূলুল্লাহ (স:)-কে নামায পড়তে মানা করেছিল। বিশেষ কোরে তাঁর (স:) সেজদা করাতে ওর শরীরে আগুন জ্বলতো। তাই ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তুমি তার কথায় কান দিওনা, বরং সেজদা কর এবং খুব বেশী কোরে সেজদা ও দোআ কোরে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ কর।

১০ নং আয়াতের صلى এবং ১৯ নং আয়াতের واسجد শব্দ দুটি প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মদ (স:)-কে অহী নাযেলের মাধ্যমে নবী করার পর নামাযের নিয়ম কানুনও শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐ নামায কিভাবে পড়তে হবে তার বর্ণনা কোরআনে নেই। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কোরআনের অহী ছাড়াও অন্য অহী দ্বারাও তাঁকে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হোত। যাকে অহীয়ে গায়র মাতলু বা হাদীস বলা হয়। যেমন রসূলুল্লাহ (স:) বলেন: الا انى اوتيت القرآن ومثله معه অর্থাৎ তোমরা জেনে নাও যে, আমাকে কোরআন এবং তার মত একটা জিনিষ দেওয়া হয়েছে (আবু দাউদ, দারেমী, ইবনে মাজা, মেশকাত,

২৯ পৃষ্ঠ)।

কতিপয় বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সূরা একরার পাঁচটি আয়াত শেখানোর পর ঐ ফেরেশ্‌তাই নিজের পা যমীনে মারেন। সেখান থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হয়। (ফতহুল আযীয, ৩২১ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী বলেন, মি'রাজের আগে রসূলুল্লাহ (স:) এবং তাঁর সাহাবীরা নামায পড়তেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, পাঁচ অক্ত নামাযের আগে কোন নামায ফরয ছিল কিনা? কারো মতে তখন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের আগে দু অক্ত নামায ফরয ছিল (ফতহুল বারী)।

শেষ আয়াতে সেজদা করার এবং সেজদার মধ্যে দোআ কোরে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসে প্রমাণ আছে যে, নফল নামাযের সেজদাতে সেজদার দোআ ছাড়া অন্যান্য দোআও পড়া যায়। কোন কোন হাদীসে ঐ দোআর বিশেষ শব্দও পাওয়া যায়। সুতরাং নফল নামাযের সেজদাতে হাদীসে বর্ণিত দোআয়ে মা-সূরা পড়াই উত্তম। ফরয নামাযের সেজদাতে ঐরূপ দোআ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়না। কারণ, ফরয নামায হাল্কা হওয়াই বাঞ্ছনীয় (মাআ-রিফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, ৭৮৯ পৃষ্ঠা)।

সূরায়ে তীন

এই সূরাতে ৮টি আয়াত আছে। জমহুর (অধিকাংশ) ওলামার মতে সূরাটি মক্কী। ইবনে আব্বাসের ১টি উক্তিতে সূরাটি মাদানী এবং অন্য উক্তিতে মক্কী। ইবনে যোবায়েরও তাই বলেন। বারা ইবনে আ-যেব সাহাবী বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স:) সফরে ছিলেন। তখন এশার নামাযের এক রাকআতে তিনি সূরায়ে অত্‌তীন পড়েন। আমি নবী (স:)-এর চেয়ে বেশী মিষ্টি সুর ও মধুর পড়া আর কারো শুনিনি (বোখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থাবলী)। তাঁর অন্য বর্ণনা এই যে, একদা আমি নবী (স:)-এর সাথে নামায পড়ি। তিনি মগরিবের নামাযে অত্‌তীন পড়েন (খাতাবী বাগদাদী)। যুরআহ ইবনে খলীফা বলেন, আমরা ইয়ামামা থেকে রসূলুল্লাহ্‌র কাছে গেলাম। তিনি আমাদের নিকট ইসলাম পেশ করলেন। আমরা মুসলমান হোয়ে গেলাম। অতঃপর যখন তিনি ফজরের নামায পড়লেন তখন অত্‌তীন ও ইয়া-আনযালনা-হু সূরা পড়লেন (ইবনুস সাকান। শীরাযী এটাকে আলকাবে রেওয়ায়ত করেছেন)।

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهِيَ ثَمَانِيْ اٰيَاتٍ

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

http://islaminonesite.wordpress.com

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ
سٰفِلِيْنَ ۝٥ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ
بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

তরজমা

১। তীন ও যয়তুনের কসম। ২। এবং সিনাই পর্বতের কসম। ৩। আর এই নিরাপদ নগরের (মক্কার) কসম! ৪। নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর ছাঁচে পয়দা করেছি। ৫। তারপর (তার চরিত্র অনুযায়ী) তাকে আমি নীচ থেকে নীচতম স্তরে রসাতলে ফিরিয়ে দিই। ৬। কিন্তু তাদের নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজও করছে তাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।৬ ৭। অতএব কোন্ জিনিষ তোমাকে পরকালের প্রতিফল প্রাপ্তি সম্পর্কে মিথ্যুক বলে? ৮। (কৃতকর্ম্ম অনুযায়ী বিচার করার ব্যাপারে) আল্লাহ্ সব বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন কি?

তফসীর

'এই শহর' বলতে মক্কা বলা হয়েছে। তীন ও যয়তুন বায়তুল মুকাদ্দাসের আশেপাশে দুটি পাহাড়ের ওপরে দুটি বাগান। ওটা খুবই বরকতের জায়গা। তূরে সীনীন সেই পাহাড় যেখানে মূসার (আঃ) সাথে আল্লাহ্র কথা হয়েছিল। এই ৪টি জায়গা খুবই বরকত ও কল্যাণের জায়গা। অতঃপর বলা হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশ্তাদের মর্যাদা দিয়েছেন। তারপর যখন সে আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তখন তিনি তাকে জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট করে দেন।

ইবনে কাসীর বলেন, তীন এর অর্থ বহু। কেউ বলেন তীন দামেশ্কের একটি মসজিদ। কেউ বলেন আঞ্জীর। কেউ বলেন, সেই পাহাড় যা ওর নিকটবর্তী। কুরতবী বলেন 'আসহাবে কাহ্ফের মসজিদ। ইবনে আব্বাস বলেন, জুদী পাহাড়ের উপর হযরত নূহ (আঃ) এর মসজিদ। মোজাহেদ বলেন, এটা আঞ্জীরের গাছ। কাব পাদ্রী, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ প্রমুখ বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। মোজাহেদ ও ইকরেমা বলেন, যয়তুন সেই ফল যা তোমরা নিঙড়ে থাক। কাব পাদ্রী বলেন, তূর সেই পাহাড় যার উপরে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)

এর সাথে কথা বলেছিলেন।

আলবালাদুল আমীন মক্কা শরীফ। ইবনে আব্বাস, মোজাহেদ, একরেমা, হাসান, ইবরাহীম নাখ্য়ী, ইবনে যায়দ ও কাব পাদ্রী প্রমুখও তাই বলেন। এতে কারোও মতভেদ নেই। কোন কোন ইমাম বলেন, এই তিনটি জায়গা এমন জায়গা যেখানে একটি কোরে "উলুল আয্ম" বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। ঐ জায়গা তিনটি তীন, যয়তুন ও বায়তুল মুকাদ্দাস। বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত ঈসা ইবনে মারয়্যাম (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় জায়গা 'তূরে সীনীন'। এখানে আল্লাহ্ তাআলা মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) এর সাথে কথা বলেছিলেন। তৃতীয় জায়গা "বালাদে আমীন"। এখানে যে-ই আসে সে নিরাপদ থাকে। এখানে মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন। তওরাতের শেষে এই তিনটি জায়গার উল্লেখ আছে:

সিনাই পাহাড় থেকে আল্লাহ্ এলেন। অর্থাৎ ঐ পাহাড়ের ওপরে আল্লাহ্ তাআলা মূসার সাথে কথা বলেন এবং সায়ীর অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পাহাড়ে তিনি চমকে ওঠেন। অর্থাৎ ওখান থেকে তিনি ঈসা (আঃ) কে পাঠান। আর ফারান পাহাড়ে তিনি ঘোষিত হন। অর্থাৎ সেখান থেকে তিনি মুহাম্মাদ (সঃ) কে প্রেরণ করেন।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা যুগ অনুসারে একটার পর একটার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি একটি মর্যাদাশীল জিনিষের কসম খেয়েছেন। তারপর তার চেয়ে যে বেশী মর্যাদাবান তার শপথ করেছেন। পরিশেষে ঐ দুটোর চেয়েও যে বেশী সম্মানিত ও গৌরবান্বিত তার হলফ করেছেন। কসমের জওয়াব এই যে, আমি মানুষকে অতি উত্তম ছাঁচে এবং সুন্দরতম আকৃতিতে সুঠাম দেহ ও পরিমিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে পয়দা করেছি। তারপর তাকে আবার আগুনের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। একথা হল মোজাহেদ, আবুল আলিয়াহ, হাসান ও ইবনে যায়দ প্রমুখদের। মানুষ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কথা না শোনে তাহলে সৌন্দর্য ও কমণীয়তা পেয়েও তার পরিণতি হবে জাহান্নামের আগুন।

এই জন্য ঈমান ও নেক আমলকে ব্যতিক্রমের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। কেউ বলেন, আসফালা-সাফেলীন এর অর্থ অতি বুড়ো হওয়া। ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। ইকরিমা বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন সংগ্রহ করে সে অতি বুড়ো হবে না। ইবনে জরীরও এই মতের সমর্থক কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন, এর মতলব যদি এরূপই হোত তাহলে 'ইসতিসনা' বা ব্যতিক্রমের কোনই গুরুত্ব থাকে না। কারণ, বার্ধক্য এমন জিনিষ, যা অনেক লোককে পেয়ে বসে। বরং আয়াতটির মতলব তা, যা আমি একটু আগে বয়ান করেছি। যেমন আল্লাহ্ও বলেন: والعصر.....الصالحات (যুগ সাক্ষ্য দেয় যে, সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ। তবে হাঁ, ওদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল ভাল কাজ করেছে তারা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয়)।

http://islaminonesite.wordpress.com

গাইরু মামনুন এর অর্থ গাইর মাক্‌তু—অর্থাৎ যা সর্বদা থাকে এবং কখনই শেষ হয় না। অতএব হে আদম সন্তান! তোমরা পরকালের বদলা পাওয়াকে মিথ্যা মনে কর কেন? পক্ষান্তরে তোমাদেরকে তো সুপথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। তোমরা একথাও জান যে, যিনি প্রথমবার পয়দা করেছেন তিনি পরেরবারে তাকে আরো ভালভাবে ও সহজেই পয়দা করতে পারেন। তাহলে কোন্ জিনিষ তোমাকে পরকালের কথাকে মিথ্যা বলায়? মনসূর মোজাহেদকে জিজ্ঞেস করেন "কা" সর্বনামের সম্বোধিত ব্যক্তি কি রসূলুল্লাহ (সঃ)? তিনি বলেন, মাআ-যাল্লা-হ! আল্লাহ্‌র পানাহ!) নবী (সঃ) নন, বরং মানুষ। ইকরিমাও এই মতের সমর্থক।

তারপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন কি? তিনি যুল্‌ম করেন না এবং অন্যায় চাপও দেন না। তার ন্যায়বিচার এই যে, তিনি কেয়ামত কায়েম কোরে দুনিয়ার মযলুমদের বদলা পরকালে যালেমদের কাছ থেকে নেবেন। আবু হোরায়রার হাদীসে মরফুভাবে এসেছে, যখন তোমরা কেউ এই সূরাটি পড়ে শেষ করবে তখন এই জওয়াব দেবে: বালা ওয়া আনা-আল-যা-লিকা মিনাশ শা-হিদীন। অর্থাৎ হাঁ, আমি একথার একজন সাক্ষী যে, আল্লাহ্ সব বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে তীন একটি ফল, যাকে মানুষ খায়। আল্লাহ্ তাআলা এই ফলটির কসম এইজন্য খেয়েছেন যে, এই ফলটি অপছন্দের দোষ থেকে মুক্ত। এর মধ্যে একটি মহৎ শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এই ফলটিকে একটি 'লোকমা'র পরিমাণে বানিয়েছেন। ডাক্তাররা বলেন যে, এই ফলটি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী এবং অধিক আহারযোগ্য। মোফরাদাত ও মোরাক্কাবাত গ্রন্থসমূহে এর অনেক উপকারের কথা লেখা আছে। তাতে একে খাদ্য ও ওষুধ দুইই বলা হয়েছে। কারণ, এটা একটি সুস্থ খাদ্য এবং তাড়াতাড়ি হজমও হয়। পাকস্থলীতে খুব বেশীক্ষণ এটা টিকে থাকে না। দেহের পক্ষে খুব মোলায়েম। ঘামের মত বেরিয়ে যায়। এটা কফ কম করে ও রক্ত সাফ করে, পেশাবের দোষ দূর করে, শরীর মোটা করে, কলিজা প্রশস্ত করে, প্লীহার দোষ দূর করে, হারিস বন্ধ করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, চুল বড় করে, পক্ষাঘাত ভাল করে। আর ওষুধ এভাবে যে, এটা দেহের অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বের করে দেয়। এর ভেতর ও ওপর দুইই খাওয়া যায়। কলা ও খেজুরের মত নয়। কারণ, ওদের ওপরটা ছিলে ফেলে দিয়ে ভেতরটা খাওয়া হয়। যদি স্বপ্নে ইহা দেখা যায় তাহলে লোকটি অত্যাচারী নয়। যদি হাতে পাওয়া যায় তাহলে সে অনেক মালধন পাবে। যদি সে খেয়ে ফেলে তাহলে সন্তান পাবে। আদম (আঃ) যখন জান্নাত ত্যাগ করেন তখন এরই পাতা দিয়ে নিজের সতর ঢেকেছিলেন। এটা জান্নাতের ফলের মত। কারণ, এর মধ্যে আঁটি হয় না। এটা একটি সুগন্ধী ফল। যাহ্হাক বলেন, তীনের ভাবার্থ মসজিদুল হারাম। কাতাদাহ

বলেন, সেই পাহাড় যার ওপরে দামেশক আছে। যয়তুন সেই গাছ যার তেল বের করা হয় এবং অনেক ওষুধে মেশানো হয়। কিংবা মসজিদে আকসা অথবা সেই পাহাড় যার ওপরে মসজিদে আকসা অবস্থিত। ইবনে আব্বাস বলেন, ফিলিস্তিন শহর। ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেন, হায়! আমি যদি জানতাম যে, কি কারণে ঐসব ইমামরা যয়তুনের প্রকৃত আরবী আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দিয়ে দূরে দূরান্তরের তফসীরের দিকে ধাবিত হলেন! ঐসব অর্থ এমন ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত যা বুদ্ধিরও অতীত এবং রেওয়ায়াতেরও গন্ডী বহির্ভূত। এর চেয়েও বেশী আশ্চর্য উক্তি সেটা, যেটাকে ইবনে জরীর গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি রেওয়ায়াত ও দেরায়াত উভয় জ্ঞানে পারদর্শী। অর্থাৎ তাঁর মতে যয়তুন বায়তুল মুকাদ্দাস। যাররা বলেন, আমি একজন লোককে বলতে শুনেছি যে, তীন হল হালওয়ান থেকে হামদান পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকা এবং যয়তুন সিরিয়ার পাহাড়ী এলাকা। আমি বলছি, আমি একথা মানছি যে, তুমি ওকথা শুনেছো। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? শোনার দ্বারা কোন ভাষা প্রমাণিত হয় কি? আর এটা কোন শরীআতের উদ্ধৃতিও নয়।

ইমাম রাযী বলেন, একদিক দিয়ে যয়তুন একটি ফল এবং অন্যদিক দিয়ে এটা একটি ওষুধ। মানুষ এর দ্বারা চেরাগ জ্বালায়। যদি কেউ স্বপ্নে এর পাতা দেখা পায় তাহলে সে কোন মজবুত রশি বা দৃঢ় অবলম্বন ধরবে। তূর সেই পাহাড়ের নাম যার ওপরে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছিলেন। কাতাদাহ বলেন, হাবশী ভাষায় কল্যাণময় সৌন্দর্যকে 'সীনীন' বলে। মোজাহেদ বলেন, সুরয়ানী ভাষায় সীনীনের অর্থ মোবারক বা কল্যাণময়। কালবী বলেন, যে পাহাড়ে ফলদায়ক গাছ হয় তাকে সীনীন বলে। নিব্‌ত ভাষায় সীনীনকে সাইনা বলে। আখ্‌ফাশ বলেন, তূর হল পাহাড় এবং সীনীন গাছকে বলে। এর এক বচন সানাহ। আল্লাহ্ তাআলা এই গাছের কসম খেয়েছেন। কারণ, এই গাছ সিরিয়ায় হয়। আর সিরিয়া পবিত্র ভূমি। যেমন আল্লাহ্ বলেন: إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ অর্থাৎ মসজিদে আকসা পর্যন্ত যার চারদিককে আমি বরকতময় করেছি। এখানে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছিলেন। সেজন্য জায়গাটি বরকতময়।

আল্লাহ্ তাআলা মক্কার নাম "বালাদে আমীন" বা নিরাপদ শহর রেখেছেন। কারণ, এই শহরটি নিরপত্তাদানকারী। যেমন আল্লাহ্ বলেন: أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا অর্থাৎ আমি মক্কাকে সম্মানিত ও নিরাপত্তাদানকারী করেছি। ইবনে আব্বাস বলেন, মানুষ জাহেলী ও ইসলামী যুগে সেখানে নিরাপদে থাকে এবং সে নিজে অর্থাৎ মক্কাও ভূতপ্রেত থেকে নিরাপদ। কসমের জওয়াব এই যে, আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতি ও পরিমিত গঠনে পয়দা করেছি। ওয়া-হেদী বলেন, মোফাসসিররা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জীবকে মাথা হেঁট-করা পয়দা করেছেন, কিন্তু মানুষকে

http://islaminonesite.wordpress.com

মাথা উঁচু কোরে। মানুষ তার খাদ্যকে স্বীয় হাত দিয়ে খায়। সে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বাকশক্তি, ভালমন্দ নির্ণয়কারী গুণ ও সচ্চরিত্র প্রভৃতি গুণে শোভিত। সেজন্য সে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন দিক দিয়ে সদগুণে গুণান্তিত হয়।

তাক্‌বীম এর অর্থ তা'দীল বা পরিমিত। কুরতুবী বলেন, পরিমিত ও মাঝামাঝি। সাধারণ মোফাসসিরগণও একথাই বলেন। ইবনুল আরবী বলেন, আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টিই মানুষের চেয়ে সুন্দরতম নয়। কারণ, তাকে জীবন্ত, জ্ঞানী, সামর্থবান, ইচ্ছাশীল, কথক, শ্রবণকারী, পরিচালক ও রহস্যবিদরূপে পয়দা করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্‌র গুণাবলী। এর প্রমাণে কোন কোন আলেম এই হাদীসটি পেশ করেন: ان الله خلق ادم على صورته অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার গুণে পয়দা করেছেন। এর সাথে এই আয়াতটিকেও মেলানো উচিত لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ তার তুলনার মতও কোন জিনিষ নেই। وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا এবং কোন জ্ঞানও তাকে পেতে পারে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুপম সৃষ্টিলীলা ও আশ্চর্য কারিগরি এবং মানুষের তত্ত্ব জানতে চায় সে যেন ইমাম জাহিযের "কিতাবুল ইবার অল ইতিবার" এবং নিসাবুরীর কেতাব দেখে। তাঁর কেতাবটি আল্লাহ্‌র উক্তি: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি বিরাট খণ্ডে রচিত। ইহ্‌য়াউল উলূমের কেতাবুল ফিক্‌র এবং কাশফুস্ সাতরে আন অজ্‌হিয যিক্‌রে অলফিক্‌রে নামক পুস্তিকায়ও মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অভিনব কুদরতের কিছু বিবরণ আছে।

চুটকি কথিকা: একদা এক ব্যক্তি তার বিবিকে বলেছিল যে, তুমি যদি চাঁদের চেয়ে ভাল না হও তাহলে তোমাকে তালাক। কোন কোন আলেম ফত্‌ওয়া দেন যে, মেয়েটি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, তালাক হয়নি। কারণ, সে মানুষ। যার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন যে, আমি মানুষকে সব থেকে সুন্দর ছাঁচে গড়েছি। অতএব চাঁদের আকৃতি যদি মানুষের চেয়ে সুন্দরতর হত তাহলে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের শানে ওকথা বলতেন না।

তারপর আল্লাহ্ বলেন, অতঃপর আমি মানুষকে নীচ থেকে নীচের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এর অর্থ যৌবন ও শক্তির পরে বার্ধক্য ও দূর্বলতা। এমন কি সে বাচ্চা ছেলের মত অসহায় ও বেআক্কেল হয়ে যায়। ইবনে আব্বাস এবং মোফাসসিরদের একটি দল এই মত পোষণ করেন। ওয়াহেদী বলেন, সা-ফিলীন এর অর্থ দূর্বল, চিররোগী ও শিশু। অতি বৃদ্ধ ওদের মধ্যে সবচেয়ে আসফাল বা নীচতম। কারণ, তার দেহের, কানের, চোখের ও বুদ্ধির দূর্বলতার কারণে তার দ্বারা কোন কাজ হয় না এবং সেও কোন উপায় খুঁজে পায় না। মোফাসসির যাযেন একথা বলেন। মোজাহেদ, আবুল আলিয়াহ ও হাসান বলেন, এর অর্থ এই যে, আমি কাফেরদেরকে আগুনের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ, আগুনের অনেক স্তর আছে। কোন কোন আগুন অন্যের তুলনায় নীচস্তরের। কাফেররা

নীচের সব থেকে নীচস্তরে যাবে। একথা এই আয়াতের বিপরীত নয়: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (অর্থাৎ মুনাফিকরা নিশ্চয়ই আগুনের সবচেয়ে নীচস্তরে থাকবে)। এর মধ্যে থেকে সে সব লোকদেরকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল ভাল কাজ করেছে। তাদের জন্যে চিরস্থায়ী পুরস্কার ও সর্বদা স্থায়ী সম্পদ রয়েছে। গাইর মামনুন এর অর্থ গাইর মানকুস বা অফুরন্ত। মোমেন যখন অতি বুড়ো হয়ে যায় তখন সে জোয়ান বেলায় যে সব নেক কাজ করেছিল তার আমলনামায় তাই লেখা হয় এবং বার্ধক্য তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর অতি বুড়ো হওয়ার পর যে সব ভুলচুক সে করে তা তার আমলনামায় লেখা হয় না। ইবনে আব্বাস বলেন, কোরআন পাঠক অতি বুড়ো হয় না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়েন: ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات অর্থাৎ সে একেবারে অসহায় হয় না যদিও সে কতই না বুড়ো হয়ে যায়। আবূ মূসা আশআরী বর্ণিত হাদীসে আছে, মানুষ যখন অসুখে পড়ে কিংবা সফর করে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য নীরোগ ও ঘরে অবস্থানকারী লোকের মত সওয়াব লিখতে থাকেন (আহমাদ ও বোখারী প্রভৃতি)। আমি বলছি যে, ইলমে-হাদীস পড়া ও পড়ানোর বৈশিষ্ট্যও এইরূপ। কারণ, হাদীস পাঠক কোরআন পাঠকের মত। যদিও সে বার্ধক্য ও দূর্বলতায় পৌঁছে যায় তথাপি সে অতি অসহায় হয় না।

"তোমাকে কোন্ জিনিষ পরকালকে মিথ্যা বলায়"—এই আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে তার সম্বোধিত কাফের ইনসান। এখানে জিজ্ঞাসাটা সতর্ক করার জন্য। অর্থাৎ যখন তুমি এটা জেনে ফেলেছো যে, আল্লাহ্ তোমাকে "আহসানে তাকবীম বা সুন্দরতম ছাঁচে পয়দা করেছেন এবং আবার তিনি তোমাদেরকে নীচ থেকে নীচতম পর্যায়ে ফিরিয়ে দেবেন তখন পরকালের উত্থান ও বিচারকে তোমার অস্বীকারের কারণ কি? কাযী বলেন, এই সম্বোধন কোরে নবী (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, হে মুহাম্মাদ (সঃ)। ঐ সমস্ত অকাট্য দলীলাদি প্রকাশিত হবার পর তুমি এখন বিশ্বাস করে নাও যে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমার নিকট যা কিছু এসেছে সে সব হক ও সত্য। কিন্তু প্রথম মতটাই ঠিক। ফাররা বলেন, ঐ সব প্রমাণাদির পর এখন তোমাকে মিথ্যুক বলতে পারে কে? ইবনে জরীর এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সব বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন কি? কারিগরী বিদ্যা ও পরিচালনা ক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যাপারে সবরকম হুকুম জারী করায় তিনি তো সবচেয়ে সঠিক পদক্ষেপকারী, সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও সবচেয়ে বেশী সুসিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। অতএব তবুও পরকালে বদলা দেবার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহের কারণ কি? এই আয়াতে কাফেরদের জন্য চরম হুমকি রয়েছে। ইবনে আব্বাস যখন এই আয়াত পড়তেন তখন বলতেন: সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ফাবালা।

http://islaminonesite.wordpress.com

সংযোজন

এই সূরাতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি শব্দ এবং ১৫০টি বর্ণ আছে (বাসা-য়িক যাভিত তামযীয, ১ম খণ্ড, ৫২৭ পৃঃ, আযীযী, আমপারা, ৩০৮ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তীনের কসম খেয়েছেন। কিছু মোফাসসিরের মতে তীন একটি ফল, যা ভারতের পেয়ারা ও ডুমুর জাতীয় ফলের মত। এই ফলের ফযীলতে হযরত আবূ যর বলেন, একদা নবী (সঃ)-কে এক থাল্লা তীন দেওয়া হল। তাথেকে তিনি কিছু খেলেন এবং সাহাবীদেরকেও খেতে বললেন, তারপর মন্তব্য করলেন যে, আমি যদি বলি জান্নাত থেকে কোন ফল অবতীর্ণ হয়েছে তাহলে বলতাম, এই ফল। কারণ, জান্নাতের ফলে আঁটি ও বীচি হবে না। তোমরা এটা খাও। কারণ, এটা হারিস ব্যাধি দূর করে এবং নাকরাস এর ব্যাথায় ফায়দা দেয় (তফসীরে আবুস্ সউদ, ৮ম খণ্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা, তফসীরে নাসাফী, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)। এই হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা আলুসী (রহ:) বলেন, এই হাদীসের ব্যাপারে আমি কোন মোহাদ্দেসের মতামত পাইনি। তবে হারিসের ব্যাধিতে উপকারের ব্যাপারে হাদিসটি উত্তম (রূহুল মাআ-নী, আমপারা, ১৭৪ পৃষ্ঠা)। ঐ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ:) বলেন, উক্ত হাদীসটি সা'লাবী এবং আবু নোআইম তীব্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন অজ্ঞাত পরিচয় (মজহুল) সনদ সহকারে (তফসীরে মাযহারী, আমপারা, ২৯৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা শাহ আবুল আযীয মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ:) বলেন, বেহেশ্‌তে ভুলের কারণে হযরত আদমের (আ:) স্বর্গীয় পোষাক যখন খুলে পড়ে যায় এবং তিনি উলঙ্গ হোয়ে পড়েন তখন তিনি যে গাছেরই কাছে গিয়ে তার পাতা দিয়ে নিজের গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে যান সে গাছই উঁচুতে উঠে যায় এবং পাতা দেয় না। অতঃপর তিনি যখন তীন বা আঁজির গাছের কাছে যান তখন সে উঁচু হয়নি। তাই তিনি তার অনেক পাতা ছিঁড়ে নিজের গুপ্তাঙ্গ ঢাকেন (ফতহুল আযীয, আমপারা, ৩০৯ পৃষ্ঠা)।

সেইসঙ্গে এই বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, আদম (আ:) যখন আঁজির গাছের পাতা পরেন তখন তাঁকে কিছুটা জংলী মত দেখায়। ফলে কিছু হরিণ তাঁর অন্তরঙ্গ সাথী হয়। তাই তিনি তাদের ঐ আঁজির গাছের কিছু পাতা খাওয়ান। ফলে আল্লাহ্ তাআলা ওদের আকৃতিতে সৌন্দর্য এবং লাবণ্য দান করেন আর ওদের রক্ত পাল্টে মৃগনাভী-কস্তুরী বানিয়ে দেন। অতঃপর ঐ হরিণগুলো যখন তাদের বাসায় ফিরে যায় এবং অন্যান্য হরিণরা তাদের সৌন্দর্য দেখে তখন তারাও পরের দিন ওদের সাথে হযরত আদমের কাছে আসে। তিনিও তাদের তীন-পাতা খাওয়ালেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা এদেরও সৌন্দর্য্য দান করলেন, কিন্তু মৃগনাভী নয়। কারণ,

১ম দলটি বিনা লোভে আদমের কাছে এসেছিল এবং ২য় দলটি বাহ্যতঃ আদমের কাছে এলেও আভ্যন্তরিণ তাদের মনে লোভ ছিল। তাই তাদের বাহ্যিক পরিবর্তিত হয়, ভেতরটা হয়নি (কাবীর, ৮ম খণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা)।

তীনের পর আল্লাহ্ তাআলা যায়তুনের কসম খেয়েছেন। এই যায়তুনের তফসীরে কিছু তফসীরকার বলেন, যে, এটা হল যায়তুন গাছ। কোরআনে সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতে এই গাছটিকে شجرة مباركة অর্থাৎ বরকতময় গাছ বলা হয়েছে। হাদীসেও আল্লাহ্র রসূল বলেন, তোমরা যায়তুন তেল খাও এবং মাখো। কারণ, এটা বরকতময় গাছ থেকে উৎপন্ন (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মেশকাত, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)। একদা মোআয ইবনে জাবাল যায়তুনের গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি ডাল ভেঙে মেসওয়াক করেন এবং বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, বরকতময় গাছ যায়তুনের মেসওয়াক কি উত্তম মেসওয়াক! যা মুখকে পরিস্কার করে এবং দুর্গন্ধ দূর করে। আমি আরো শুনেছি, তিনি একবার বলছিলেন, এটা আমার মেসওয়াক এবং আমার আগেকার নবীদেরও মেসওয়াক (তফসীরে আবুস্ সউদ, ৮ম খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা ও রূহুল মাআনী, আমপারা, ১৭৪ পৃষ্ঠ)।

যায়তুন ফলের উপকারিতা সম্পর্কে আল্লামা শাহ আ: আযীয মোহাদ্দেস দেহলভী বলেন, যায়তুনের পাকা ফল খেলে পেট ভরে যায়, শরীর মোটা হয় এবং রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। যদি তার দানার মগজটা চর্বি এবং আটার সাথে মিশিয়ে কুষ্ঠরোগীর দেহে মলা হয় তাহলে কুষ্ঠরোগ দূর হোয়ে যায়। যায়তুনের শীরা যদি মেয়েরা যোনিতে ব্যবহার করে তাহলে জরায়ুর স্রাব বন্ধ হয়। কোন নুনপানিতে যদি যায়তুন ফল মিশিয়ে কুল্লি করা হয় তাহলে দাঁতের গোড়া মযবুত হয়। যদি বিছা কামড়ানো-জায়গায় এই ফল লাগানো হয় তাহলে উপকার পাওয়া যায়। এই তেল খাওয়া যায় এবং এর দ্বারা বাতিও জ্বালানো যায়। এর ধোঁয়া কালি থেকে মুক্ত হয়। আর কোন গাছ এতদিন বাঁচেনা যত আয়ু এই গাছ পায়। সিরিয়া রাষ্ট্রের ফিলিস্তিন শহরে গ্রীকরা এখন থেকে প্রায় দু-হাযার বছর আগে আলেকজাণ্ডারের যুগে যায়তুনের যে গাছ লাগিয়েছিল তা আজও বিদ্যমান আছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই গাছের বরকতের জন্য দোআ করছিলেন (তফসীর আযীযী, আমপারা, ৩১০-৩১১ পৃষ্ঠা)।

২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সীনীন পাহাড়ের কসম খেয়েছেন। সীনীনের শাব্দিক অর্থ শস্যশ্যামল পাহাড় এবং জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সেই পাহাড় যার উপরে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র তাজাল্লী ও দীপ্তি পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। সিরিয়ার চাষী নিবতী জাতির ভাষায় শব্দটি সীনীন। কিন্তু আরবদের বাক্‌র ও তামীম গোত্রের উচ্চারণে শব্দটি সাইনা-য়া। যেমন কোরআনে সূরা মোমেনুনের ২০ নং আয়াতে আছে شجرة تخرج من طور سيناء এবং কারো উচ্চারণে সীনাআ। যেমন

http://islaminonesite.wordpress.com

এবং সেখান থেকে তিনি যমীনে নেমে আসেন মুহূর্তেরও আগে (তাফসীরে মায়হারী ১০ম খণ্ড, ২০৮—২০৯ পৃষ্ঠা)।

মক্কার মুশরিকরা তাদেরই এককালের সঙ্গী-সাথী মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামকে পাগল বলতো। তাই এর প্রতিবাদে এই সূরার ২২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ পাগল নন। বরং তাঁর নিকট আল্লাহ্র অহী বহনকারী মহান দূতকে তার স্বমূর্তিতে তিনি আকাশের প্রকাশ্য কিনারায় দেখেছেন।

যেমন ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জিবরীলকে বলেন, আমি আপনাকে একবার আপনার আসল রূপে দেখতে চাই। তিনি বললেন, আপনি ওর ক্ষমতা রাখেন না। তিনি বললেন, হাঁ রাখি। জিবরীল বললেন, তাহলে কোথায় দেখতে চান? তিনি বললেন, ইব্তাহ নামক জায়গায়। জিবরীল বললেন, সেখানে আমার কোন সংকুলান হবে না। তিনি বললেন, তাহলে এখানে। জিবরীল বললেন, এখানেও আমার জায়গা কুলাবে না। তিনি বললেন, তাহলে আরাফাতে। জিবরীল বললেন, হাঁ, আরাফাতের হেরা পর্বতে। অতঃপর নাবী (সঃ) নির্ধারিত সময়ে সেখানে গেলেন। হঠাৎ দেখছেন যে, জিবরীল আরাফাতের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন। তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা ভরে গেছে এবং তার মাথা রয়েছে আসমানে ও পা দুটি যমীনে। তাঁকে যখনই নাবী (সঃ) দেখা পেলেন তখনই তিনি তকবীর দিলেন এবং বেহুঁশ হোয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর জিবরীল তাঁর রূপ পাল্টে নেন। তারপর তিনি নাবী (সঃ)-কে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি ভয় পাবেন না। আপনার তখন কি হবে যদি আপনি ইসরাফীলকে দেখেন। তাঁর মাথা রয়েছে আরশের নীচে এবং পা দুটি রয়েছে সাত তবক যমীনের তলদেশে। আরশ রয়েছে তাঁর কাঁধে। তিনি আল্লাহ্র ভয়ে কখনো কুঁকড়ে ছোট হয়ে যান চড়ুইয়ের মত। আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ছাড়া আর কিছুই তাঁর আরশকে তুলে রাখতে পারে না (বাগাভী ও খাযিন ৭ম খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা)।

অহীর আধার এই কুরআন যেহেতু বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়, বরং এটা হচ্ছে মহামহিম আল্লাহ্র মহান দূত জিবরীল মারফত প্রেরিত এবং আর এক মহান দূত মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রচারিত জীবন-বিধান আল কুরআন। অতএব হে কুরআন বিমুখগণ! এই সুধা ভাণ্ডারকে ছেড়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছো? এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ও নীতিমালা। অবশ্য বিশ্ববাসীর মধ্যে যারা এই কুরআন প্রদর্শিত সোজা পথে চলতে চায় কেবল তাদেরই জন্য কুরআন উপদেশ গ্রন্থে পরিণত হবে, অনাগ্রহীদের জন্য হবে না।

সূরা আবাসা

এই সূরাকে আবাসা ছাড়া সূরায়ে সাফারাহ ও সূরায়ে আ'মা বলে। এতে ৪১টি বা ৪২টি আয়াত আছে। যা সবার মতে মক্কায় নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র তাই বলেন। ইবনে কাসীর বলেন, এটা মক্কী সূরা।

বাংলা উচ্চারণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু করছি)

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ
يَزَّكّٰٓى ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥
فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ
جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠ كَلَّآ
اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣
مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦
قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝١٧ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ۝١٨
مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝١٩ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝٢٠
ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ
اَمَرَهٗ ۝٢٣ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝٢٤ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ

http://islaminonesite.wordpress.com

صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَّ
عِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَّفَاكِهَةً
وَّأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيهِ ﴿٣٧﴾
وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ
يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

১। আবাসা অতাঅল্লা। ২। আনজা-আহুল আ'মা। ৩। অমা-ইয়ুদরীকা লাআল্লাহূ ইয়াযযাক্কা। ৪। আও ইয়াযযাক্কারু ফাতানফাআহুয যিক্‌রা। ৫। আম্মা-মানিস্‌তাগ্‌না। ৬। ফাআন্তা লাহূ তাস্বদ্দা। ৭। অমা-আলাইকা আল্লা ইয়াযযাক্কা। ৮। ওয়াআম্মা মান জা-আকা ইয়াস্‌আ। ৯। অহুওয়া ইয়াখ্‌শা। ১০। ফাআন্তা আনহু তালাহ্‌হা। ১১। কাল্লা-ইন্নাহা-তাযকিরাহ্। ১২। ফামান শা-আ যাকারাহ্। ১৩। ফী সুহুফিম মুকাররামাহ্। ১৪। মারফূআতিম মুতাহ্‌হারাহ। ১৫। বিআইদী সাফারাহ্। ১৬। কিরামিম বাররাহ্। ১৭। কুতিলাল ইনসা-নু মা-আক্‌ফারাহ্। ১৮। মিন আইয়ি শাইয়িন খলাক্বাহ্। ১৯। মিন নুত্‌ফাতিন খলাক্বাহূ ফাক্বাদ্দারাহ্। ২০। সুম্মাস্ সাবীলা ইয়াস্‌সারাহ্। ২১। সুম্মা আমা-তাহূ ফাআক্বরারাহ্। ২২। সুম্মা ইযা-শা-আ আন্‌শারাহ্। ২৩। কাল্লা-লাম্মা- ইয়াক্বযি মা-আমারাহ্। ২৪। ফালয়্যান্‌যুরিল ইনসা-নু ইলা ত্বআ-মিহী। ২৫। আন্না স্বব্বাব্-নাল মা-আ স্বব্বা। ২৬। সুম্মা শাক্বাক্বনাল আরযা শাক্বা। ২৭। ফা আম্বাতনা ফীহা হাব্বা। ২৮। ওয়া ইনাবাঁও অক্বাযবা। ২৯। অযাইতুনাঁও অনাখ্‌লা। ৩০। অহাদা-য়িকা গুলবা। ৩১। অফা-কিহাতান

ওয়া আব্বা। ৩২। মাতা-আল লাকুম অলি আন আ-মিকুম। ৩৩। ফাইযা জা-আতিস্ স্ব-খ্‌খাহ্। ৩৪। ইয়াওমা য়্যাফিরুল মারউ মিন আখীহ্। ৩৫। অউম্মিহী ওয়া আবীহ্। ৩৬। অস্ব-হিবাতিহী অবানীহ্। ৩৭। লিকুল্লিম রিয়িম মিনহুম ইয়াওমাযিন শানুই য়্যুগনীহ্। ৩৮। উজুহুই ইয়াওমাযিযিন মুস্‌ফিরাহ্। ৩৯। যা-হিকাতুম মুসতাব্-শিরাহ্। ৪০। ওয়া উজুহুই ইয়াওমাযিযিন আলাইহা গবারাহ্। ৪১। তারাহাকুহা ক্বতারাহ্। ৪২। উলা-য়িকা হুমুল কাফারাতুল ফাজারাহ্।

তরজমা

১। সে (মুহাম্মাদ) ভ্রূ কুঁচকালো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। ২। কারণ, একজন অন্ধ তার নিকটে এসেছিল। ৩। অথচ (হে মুহাম্মাদ) তুমি কি জান, সে হয়তো সংশোধিত হয়ে যেত। ৪। কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো, যে উপদেশ তার উপকারও করতে পারতো। ৫। কিন্তু যে ব্যক্তি (তোমাকে) পরওয়াই করেনা। ৬। তুমি তারই পেছনে লেগে আছো। ৭। অথচ সে নিজে সংশোধিত না হলে তোমার উপরে কোন দোষই নেই। ৮। (এরই বিপরীত) যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণের জন্য তোমার কাছে দৌড়ে আসে। ৯। এবং আল্লাহ্‌কে ভয়ও করে থাকে। ১০। তুমি তারই প্রতি উদাসীনতা দেখাচ্ছো। ১১। কখনই (এরূপ কোর) না, কারণ, এটাতো নিশ্চয়ই উপদেশ। ১২। অতএব যার ইচ্ছা সে এটা গ্রহণ করবে। ১৩। এটা এমন সব পুস্তকে লিখিত যা সম্মানীয়। ১৪। উচ্চস্থানীয় ও পবিত্রতম। ১৫। সেই লিপিকারদের হাতে (সুরক্ষিত)। ১৬। যারা মহান পূত-চরিত্র। ১৭। মানুষ নিপাত যাক (কারণ) সে কতই না নেমকহারাম। ১৮। (সে কি লক্ষ্য করে না যে,) কোন্ (তুচ্ছ) জিনিষ হতে আল্লাহ্ তাকে পয়দা করেছেন। ১৯। বীর্যের একবিন্দু হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে (সর্ববিষয়ে) পরিমিত রূপ দান করেছেন। ২০। তারপর তার চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। ২১। পরে তাকে মেরে ফেলেন, অতঃপর তাকে কবরে রাখেন। ২২। পুনরায় যখন তিনি চাইবেন তখন আবার তাকে জ্যান্ত কোরে ওঠাবেন। ২৩। না না, (এসব দেখেও) সে ঐ কর্তব্য পালন করেনি যার হুকুম আল্লাহ্ তাকে দিয়েছিলেন। ২৪। অতএব মানুষের উচিত সে নিজের খাদ্যদ্রব্যের প্রতি একবার নজর দিক। ২৫। আমি (তার জন্য আকাশ থেকে) পানি ঢেলেছি ঢালার মত। ২৬। তারপর আমি যমীনকে ফেড়ে দিয়েছি ফাড়ার মত। ২৭। অতঃপর ওতে আমি উৎপন্ন করিছি শস্যাদি। ২৮। এবং আঙ্গুর ও শাকসব্জি। ২৯। আর যয়তুন ও খেজুরাদি। ৩০। এবং ঘন বাগান সারি সারি। ৩১।

http://islaminonesite.wordpress.com

আর রকমারি ফলমূল ও ঘাস-লতাদি। ৩২। (হে মানুষ!) এসব তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পশুসমূহের ভোগের জন্য (আমি উৎপন্ন করিছি)। ৩৩। পরিশেষে (দ্বিতীয় শিঙ্গার) বিকট চীৎকার যখন এসে পড়বে। ৩৪। সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে তার ভাই থেকে। ৩৫। এবং নিজ মা ও নিজ বাপ হতে। ৩৬। আর নিজ সঙ্গিনী ও নিজ সন্তানাদি হতে। ৩৭। তাদের প্রত্যেকের দশা সেদিন এমন হবে যা তাকে (অন্যদের ব্যাপারে) উদাসীন রাখবে। ৩৮। অনেক মুখ সেদিন খুশীতে চমকাবে। ৩৯। (এবং) হাসিখুশী ও সুসংবাদপ্রাপ্ত হবে। ৪০। আর বহু মুখের উপর সেদিন ধুলোবালি পড়ে থাকবে। ৪১। যাতে কালিমাও ছেয়ে যাবে। ৪২। এরাই হল (সত্যকে) অস্বীকারকারী দুরাচারী।

তফসীর

ইবনে কাসীর বলেন, বহু তাফসীরকার উল্লেখ করেছেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কুরাইশ সর্দারদের সাথে তবলীগী কাজে রত ছিলেন এবং তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য লালায়িত ছিলেন। এমন সময়ে ইবনে উম্মে-মাকতূম তাঁর কাছে আসেন। যিনি বহুদিন থেকে মুসলমান হোয়ে ছিলেন। তিনি নাবী (সঃ)-কে কয়েকটি প্রশ্ন করতে থাকেন এবং ওর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তখন নাবী (সঃ) চাচ্ছিলেন যে, সে একটু দেরী করুক। যাতে তিনি ওদের সাথে আলোচনাটা শেষ করে নেবেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, ওরা ইসলাম কবুল করুক। সেজন্য তিনি ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি একটু ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতগুলো নাযিল কোরে বলেন, তুমি কি জান, সে হয়তো সংশোধিত হোয়ে তোমার নসীহত কবূল করতঃ হারাম থেকে বাঁচতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেপরওয়া, তুমি তারই পেছনে পড়ে আছো। সে হয়তো সুপথে আসতে পারে এই আশায়। যদি সে হিদায়াত প্রাপ্ত না হয় তাহলে তাতে তোমার ক্ষতি কি? কারণ, তার দিল পাক না হওয়ার এবং তার আত্মা সংশোধিত না হওয়ার জন্য তোমাকে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। কিন্তু এই গরীব বেচারা যে মুক্তির সন্ধানে তোমার কাছে ছুটে এসেছে তুমি তার প্রতি উদাসীন। এখানে আল্লাহ্তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এই হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি যেন কারো সাথে বিশেষ ব্যবহার না দেখান। বরং তার কাছে ভদ্র ও অসভ্য, ধনী ও দরিদ্র, মনিব ও ভৃত্য, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সবাই সমান। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছা তিনি যাকে চান সুপথে চালান। কারণ তাঁর জ্ঞান কল্পনাতীত এবং তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আনাস বলেন, ইবনে উম্মে মাকতূম একদা নাবী (সঃ) এর

কাছে আসেন। তখন তিনি উমাইয়া ইবনে খাল্ফের সাথে কথা বলছিলেন। ফলে তিনি তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তখন আল্লাহ্ এই আয়াতটি পাঠান। এরপর থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে খাতির করতে থাকেন (আবূ ইয়ালা)।

আনাস বলেন, আমি কাদসিয়ার যুদ্ধের সময় ইবনে উম্মে মাকতূমকে দেখেছি। তিনি লোহার বর্ম পরে একটি কালো ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, একদা নাবী (সঃ) উত্বা ইবনে আবী রবীআহ, আবূ জাহ্ল ও আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের সাথে গোপনে আলোচনা করছিলেন এবং তিনি আন্তরিকভাবে চাচ্ছিলেন যে, ওরা ঈমান আনুক। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম নামে এক অন্ধ আসে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কথায় ব্যস্ত ছিলেন। অন্ধটি রসূলুল্লাহ্কে বলেন, অমুক আয়াতটি আমাকে শোনান এবং আল্লাহ্তাআলা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা আমাকে শেখান। তখন নাবী (সঃ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, ভ্রূ কুঁচকান এবং একসময়ে তাঁর কথায় কান না দিয়ে অন্যদের প্রতি মনোযোগ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাদের সাথে আলোচনা শেষ কোরে ঘরের দিকে ফিরতে থাকেন তখন তাঁর চোখ মুখ আঁধার হোয়ে আসে এবং মাথা ঘুরতে থাকে। ফলে আল্লাহ্ এই আয়াতটি নাযিল করেন। আয়াতটি নাযিলের পর নাবী (সঃ) তাকে খুব সম্মান করতেন ও তাঁর সাথে মন খুলে কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কোন কাজ থাকে তো বল (ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতিম, অবশ্য এই বর্ণনায় কিছু অভিনবত্ব ও আপত্তি আছে)। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যাহ্হাক এবং বহু সালাফ ও খালাফ বলেন, এই আয়াতটি ইবনে উম্মে মাকতূমের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। অধিকাংশের মতে তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ এবং কেউ বলেন আম্র। আল্লাহ্ সঠিক জানেন।

আল্লাহ্ বলেন, এই নসীহত ও তাবলীগের ব্যাপারে ভদ্র ও অভদ্র সবাই সমান। এটা একটি উপদেশ। যদি কেউ সব কাজে আল্লাহ্কে স্মরণ করতে চায় তাহলে সে যেন এই কুরআন তিলাঅত করে। কারণ, এই নসীহত মহান ও সম্মানীয় কিতাবের। গোটা কুরআনই কমতি ও বাড়তি সবরকম দোষ থেকেই মুক্ত ও পবিত্র। ইবনে আব্বাস বলেন, 'সাফারাহ' এর অর্থ ফিরিশ্তা। অহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, মুহাম্মাদ (সঃ) এর সাহাবীবর্গ। কাতাদাহ বলেন, কারীগণ অর্থাৎ উলামায়ে কিরাম। নিব্তী ভাষায় সাফারার অর্থ উলামায়ে কিরাম। ইবনে জরীর বলেন, সঠিক এই যে, সাফারার অর্থ ফিরিশ্তা। সাফারার এক বচন সা-ফিরাহ। ফিরিশ্তারা অহী নিয়ে এসে রসূলের কাছে পৌঁছে দূতের কাজ করে বলে তাদেরকে সাফীর (দূত) বলা হয়েছে। এরা কওমের মধ্যে সংশোধনের কাজ করে। সাফারতু এর অর্থ আসলাহতু। কিরাম এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদেরকে মহান ও পূতচরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাদের চরিত্র পবিত্র এবং কাজকাম উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ। এখানে একথা জানানো হয়েছে যে, যারা কুরআনের ধারক তাদের সব কাজকাম ও কথাবার্তা যেন সুনিয়ন্ত্রিত ও সঠিক পথে পরিচালিত হয়। আয়িশার হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, যেব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং ঐ বিষয়ে পারদর্শীও হয় সে সাফারায়ে কিরাম এবং বারারাহ্দের (মহান পূত চরিত্র ফিরিশ্তাদের) সাথী হবে। আর যে কেউ কুরআন পড়ে আর ঐ কুরআন পড়াটা তার উপরে কষ্ট মনে হয় সে ডবল নেকী পাবে (সিহাহ্ ও সুনান গ্রন্থাবলী)।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা মরার পর কবর থেকে ওঠার কথা অস্বীকার কারীদের বদনাম কোরে বলছেন, মানুষ বড়ই নেমকহারাম। ইবনে আব্বাস বলেন, কুতিলার অর্থ লুয়িনা বা অভিশপ্ত। আবূ মালিকও তাই বলেন। এই লা'ত ঐসব লোকদের জন্য যারা সত্যকে মিথ্যা জ্ঞানকারী। অধিক মিথ্যারোপের জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছে। ইবনে জুরায়িজ বলেন, মা-আক্ফারাহ এর অর্থ কত শক্ত তার নেমকহারামি। ইবনে জরীর বলেন, কোন্ জিনিষ তাকে কাফির বানালো এবং পরকালকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করলো।

তারপর আল্লাহ্ বলেন, আমি তাকে একটি তুচ্ছ জিনিষ থেকে পয়দা করেছি এবং আমি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। কাদ্দারা এর অর্থ রুযী, মৃত্যু, কর্ম এবং সৌভাগ্য ও দূভার্গের নিরূপণ করা। ইয়াস্সারা এর অর্থ মায়ের গর্ভ থেকে সহজে বার করা। এই উক্তি হল ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক ও সুদ্দী প্রমুখের। ইবনে জরীর এটাকে গ্রহণ করেছেন। মোজাহেদ বলেন, এটা হল আল্লার ঐ কথার মত, যাতে তিনি বলেছেন, আমি তাকে পথ বাতলে দিয়েছি। এখন চায় সে কৃতজ্ঞ হোক অথবা নেমকহারাম হোক (সূরায়ে দাহ্র)। হাসান ও ইবনে যায়দ এই মতের সমর্থক। ইবনে কাসীর বলেন, এই মতটা প্রাধান্যযোগ্য। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মেরে কবরে শুইয়ে দেন। তারপর যখন চাইবেন তখন তিনি তাকে কবর থেকে তুলবেন। আবূ সায়ীদের হাদীসে নাবী (সঃ) বলেন, মাটি মানুষের সব জিনিষকে খেয়ে ফেলে মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া। কেউ জিজ্ঞেস করলো, তা কেমন? তিনি বললেন, শর্ষের এক দানার মত। তাথেকে তোমরা তৈরী হও (ইবনে আবী হাতিম)। ইবনে কাসীর বলেন, এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমেও আছে।

তারপর আল্লাহ্ বলেন, সেই মানুষ কাফির যে একথা বলে, আমার উপরে যে হক ছিল আমি তা আদায় করে দিয়েছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং আল্লাহ্র যে হক ও কর্তব্য তার উপরে ছিল সে তা মোটেই পালন করেনি।

মুজাহিদ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই কখনো তার কর্তব্য পালন করে না। ইবনে কাসীর বলেন, পূর্বেকার মনীষীদের মন্তব্য এই আয়াতের ব্যাপারে আমি অন্য পাইনি যা উপরে বর্ণনা করা হল। আমারও মত তাই। আল্লাহ্ যখন চাইবেন তখন মানুষকে কবর থেকে তুলে দাঁড় করাবেন। অহাব ইবনে মোনাব্বাহ বলেন, ওয়ায়ের অলাইহিস সালাম বলেছেন, এক ফিরিশ্তা আমার কাছে এসে বলে যে, কবর হল যমীনের পেট এবং যমীন সৃষ্টিজগতের মা। সুতরাং আল্লাহ্ যখন তাঁর ইচ্ছামত সৃষ্টিজগত তৈরী কোরে নেবেন এবং এই কবরসমূহ যা আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিজীবের জন্য বানিয়েছেন যখন তা পূর্ণ হোয়ে যাবে তখন দুনিয়া ধ্বংস হোয়ে যাবে। আর যারা যমীনের উপরে থাকবে তারা মারা যাবে এবং যমীনের পেটের ভেতরে যা থাকবে তাকে যমীন উগরে দেবে। আর কবরে যা থাকবে সেগুলোকে কবর বের কোরে ফেলে দেবে।

মানুষ তার খাদ্যদ্রব্যের প্রতি নজর দিক—একথার মধ্যে আল্লাহ্র ইহ্সানের উল্লেখ রয়েছে এবং মরা যমীন থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মধ্যে মৃতদেহকে পুনরায় জন্ম দেবার দলীল রয়েছে, যখন মানুষের হাড়গুলো পচে সড়ে মাটি হোয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর যমীনকে চিরে ফেড়ে দিই। ফলে ঐ পানি যমীনের তলায় পৌঁছে যায় এবং আনাজ ও তরকারীর উপাদানের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর যে বীজ যমীনের ভেতরে আমানত রাখা থাকে তা অংকুরিত হয় এবং যমীনের উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। হাব্বুন এর অর্থ দানা ও বীজ। সবরকম শস্য এর মধ্যে গন্য। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ প্রমুখ বলেন, কায্বুন এর অর্থ সেই উদ্ভিদ যা জন্তুরা খায়। যায়তুন হল তরকারী। ওর তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং তা গায়ে মাখাও হয়। আর খেজুর তাজা ও শুকনো দুরকমই খাওয়া হয়। ওথেকে সিরকাহ হয়।

হাসান বলেন, হাদা-য়িক এর অর্থ বাগানসমূহ এবং গুলবান এর অর্থ ঘনঘন উত্তম খেজুর গাছ। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, হাদীকাহ হল সেই বাগান যা ঘনঘন হয় এবং যার গাছগুলো সারি দিয়ে সন্নিবিষ্ট। কিংবা ওর অর্থ ছায়াওয়ালা বৃক্ষাদি অথবা লম্বা কাণ্ডজাতীয় গাছ। ফা-কিহার অর্থ ফল। ইবনে আব্বাস বলেন, তাজা ফলকে ফা-কিহাহ্ বলে। আববুন হল ঐ জিনিষ, যা যমীন উৎপন্ন করে এবং তা জানোয়ারা খায়; মানুষ খায় না। অন্য বর্ণনায় আছে, ঘাস যা পশুদের খোরাক। ইবনে যায়দ বলেন, আব্ব হল পশুদের জন্য এবং ফা-কিহা হল আদম সন্তানের জন্য। আতা বলেন, যমীনে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকে আব্ব বলে। যাহ্হাক বলেন, ফা-কিহা ছাড়া বাকি ঐ সমস্ত জিনিষ আব্ব, যা যমীন

http://islaminonesite.wordpress.com

ভেদ কোরে পয়দা হয়। ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায়—যমীনের উৎপন্ন দ্রব্য যাকে জন্তুরা খায় এবং অন্য বর্ণনায় ঘাস ও লতাপাতা। তারপর আল্লাহ্ বলেন, এটা তোমাদের এবং তোমাদের জন্তুদের ভোগের জন্য এই জগতে কিয়ামত পর্যন্ত।

ইবনে আব্বাস বলেন, স্ব-খ্খাহ হল কিয়ামতের একটি নাম। আল্লাহ্ ঐ দিনটিকে ভয়ানক করেছেন এবং স্বীয় বান্দাদেরকে ঐ দিনের ভয় দেখিয়েছেন। ইবনে জরীর বলেন, এই দিনটি মনে হয় শিঙ্গা ফুঁক দেবার নাম। বাগাভী বলেন, স্ব-খ্খাহ কিয়ামতের দিনের বিকট চিৎকার। সেদিন শিঙ্গার আওয়াযে কানগুলো কালা হোয়ে যাবে। সেইজন্য ঐ দিনটিকে স্ব-খ্খাহ বা কান কালাকারী বলা হয়েছে।

সেদিন কিয়ামতের সংকট দেখে প্রত্যেকে তার আত্মীয় স্বজন থেকে পালাবে। ইকরিমা বলেন, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ কোরে বলবে, আমি তোমার কেমন স্বামী ছিলাম? সে বলবে, তুমি খুব ভাল স্বামী ছিলে। এবং সে তার তারীফ করবে। তখন স্বামী বলবে, আজ তুমি আমাকে একটি নেকী দিয়ে দাও, যদ্দারা আমি মুক্তি পাই এবং এই আযাব থেকে নাজাত পাই, যা তুমি দেখতে পাচ্ছো। জওয়াবে স্ত্রী বলবে, তুমি খুব সামান্য জিনিষ চেয়েছো। কিন্তু আমি তোমাকে এই তুচ্ছ জিনিষটিও দিতে পারবো না। আমারও ঐ ভয় আছে যার ভয় তোমার রয়েছে। তারপর সে তার পুত্রকে বলবে, আমি তোমার কেমন পিতা ছিলাম? ছেলেটি তার প্রশংসা করবে। ফলে সে ছেলেকে বলবে, আজকে আমার এক অণু সমান পুণ্যের প্রয়োজন। তুমি তোমার পুণ্যের মধ্য হতে তা আমাকে দাও। যাতে আমি এই আযাব থেকে মুক্তি পাই যা তুমি দেখতে পাচ্ছো। ছেলেটি বলবে, আপনি যা চেয়েছেন তা সত্যিই অতি সামান্য। কিন্তু আমি ঐ তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিষটিও আপনাকে দিতে পারবো না। কারণ, আপনি যার ভয় খাচ্ছেন, আমিও তার ভয় খাচ্ছি। এইসব কারণে আল্লাহ্ বলেছেন যে, সেদিন মানুষ তার প্রিয়পাত্রের কাছ থেকে সরে যাবে এবং সবাই নিজেকে মুক্ত করার কাজে ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারো খবর নেবে না। মা ও বাপ, ভাই ও বোন, স্ত্রী ও সন্তান সবাই যে যার তালে থাকবে।

সহীহ্ হাদীসে শাফাআতের বর্ণনায় আছে, লোকেরা যখন 'উলুল আয্ম' বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নাবীদের কাছে শাফাআত চাইবে তখন প্রত্যেকেই বলবে, নাফ্সী নাফ্সী লা-আসআলুকাল ইয়াওমা ইল্লা-নাফ্সী—অর্থাৎ আমার কি হবে। আমার কি হবে। আমি তোমার কাছে আজকে কিছুই চাইনা। কিন্তু আমার কি হবে? এমন কি ঈসাও (আঃ) এই কথা বলবেন যে, আজকের দিনে আমি নিজেরই প্রাণ ভিক্ষা করছি। যে মারয়্যাম আমার জন্ম দিয়েছে তার জন্যও আমি কিছু

করতে পারবো না। মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং অপরের প্রতি উদাসীন থাকবে। ইবনে আব্বাসের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, লোকেরা কিয়ামতের মাঠে খালি পায়ে, খালি গায়ে খাত্নাহীন অবস্থায় পায়ে হেঁটে জমায়েত হবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্র এক বিবি বললেন, তাহলে তো একে অপরের গুপ্তাঙ্গ দেখতে পাবে। নাবী (সঃ) বললেন, সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই পাগল থাকবে। কেউ কাউকে দেখবার সুযোগই পাবে না (ইবনে আবী হাতিম, নাসায়ী, তিরমিযী)। এই বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তারপর আল্লাহ্ বলেন, সেদিন কিছু মুখ উৎফুল্ল থাকবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সেখানে দু রকম দল জড় হবে। এক, তারা যারা হাসিমুখ ও সুখী হবে। তাদের মনের আনন্দ তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। এরা হল জান্নাতী বা স্বর্গবাসী। দ্বিতীয় দলটির মুখ কালো হবে। এরা হল জাহান্নামী। হাদীসে আছে যে, কাফিরদের ঘামের লাগাম দেওয়া হবে। তাদের চেহারাতে কালোভাব ফুটে উঠবে (ইবনে আবী হাতিম)। ইবনে আব্বাস বলেন,—'তারহ্কুহা ক্বাতারাহ্'-এর অর্থ কালোমুখোভাব তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে। এই সব লোকেরা মনের দিক দিয়ে কাফির এবং আমলের দিক দিয়ে ফাজির (পাপাচারী) ছিল। আল্লাহ্ বলেন, অলা-য়্যালিদু ইল্লা-ফা-জিরান কাফ্ফা-রা—অর্থাৎ তারা কেবল দুরাচারীদেরই জন্ম দেবে (সূরায়ে নূহ)।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে, সমস্ত মুফাসসিররা এ বিষয়ে একমত যে, সূরায়ে আবাসার আয়াতগুলো ইবনে উম্মে-মাকতূমের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। মাহাল্লী বলেন, ঐ আয়াত নাযিলের পর তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে আসতেন তখন রসূলুল্লাহ্ বলতেন, তাকে মারহাবা যার ব্যাপারে আমাকে আমার প্রভু ডেঁটেছেন। অতঃপর তার খাতিরে তিনি নিজের চাদরটা বিছিয়ে দিতেন। খাযিন বলেন, যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে ১৩ বার মদীনাতে স্বীয় খলীফা (প্রতিনিধি) মনোনীত করেন। ইনি মুহাজিরদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাদসিয়ার যুদ্ধে ইনি শহীদ হোয়ে মারা যান। ইমাম নবভী মুসলিম শরীফের ভাষ্যে বলেন, তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্র ছিল। উম্মে-মাকতূম আম্র এর বিবি ছিল। তাহলে ইনি আবদুল্লার মা হন। কিন্তু বুখারী শরীফে স্বয়ং ওর নাম আম্র বলা হয়েছে। তাই কাস্তালানী বলেন, ওঁর নাম হয় আবদুল্লাহ্ নতুবা আম্র। ওঁর পিতার নাম যায়িদাহ্। অল্লা-হু আ'লাম।

এখানে প্রথমে আল্লাহ্তাআলা তৃতীয় পুরুষের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতঃপর তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় পুরুষের দিকে ফিরে এসে সরাসরি সম্বোধন করেছেন। কারণ, ডাঁট দেবার জন্য মুখোমুখি হওয়াটা অধিক বাঞ্ছনীয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

তুমি কি জান যে,—সে হয়তো সংশোধিত হোত-একথার মধ্যে এই বর্ণনা আছে যে, সে মুখ ফেরাবে না, বরং লাইনে আসবে। সংশোধিত হবার ভাবার্থ পাপ থেকে মুক্ত হোয়ে সৎকাজ করা। শির্ক থেকে মুক্ত হওয়া নয়। কারণ, এর আগে সে মুসলমান হোয়ে গিয়েছিল। এইরূপ বিষয় সূরা আনআমেও আছে: 'যারা তাদের প্রভুকে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না'। সূরা কাহ্‌ফেও বলা হয়েছে: 'তাদেরকে ছেড়ে তোমার চোখ যেন পার্থিব সৌন্দর্যের খোঁজে দৌড়ে না বেড়ায়'। তোমার নসীহত শুনে সে হয়তো উপকৃত হোত। কিন্তু তুমি তারই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। আর যে ব্যক্তির অবস্থা স্বচ্ছল এবং সে ইমান আনার পরওয়াও করে না, কুরআনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তুমি তারই প্রতি চোখ লাগিয়ে বসে আছো। মেনে নিলাম, সে ঈমান আনবে না। না আনুক। তাতে তোমার দোষ কি? তোমার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেওয়া। অতএব এরূপ কাফিরদের ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। কিন্তু এই অন্ধ যে সুপথ ও হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছে। সে তোমার উপদেশও শোনে এবং আল্লাহ্‌কে কিংবা কাফিরদের নির্যাতনকে সে ভয় করে থাকে তারই প্রতি তুমি উদাসীনতা দেখাচ্ছো এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের কথায় মশগুল থাকছো? মোটকথা এ কাজটা নাবীর পক্ষে শোভনীয় ছিল না।

আল্লাহ্ বলেন, এই আয়াতগুলো তো স্রেফ উপদেশ। সুতরাং যে কেউ এটা শুনবে সেই এর হুকুম মোতাবেক চলবে এবং উপদেশ গ্রহণ কোরে তা কার্যে পরিণত করবে। আর যে ব্যক্তি এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে তাকে লাইনে আনার জন্য তোমার উপর কোন দায়দায়িত্ব নেই। এই নসীহতগুলো এমন সব পাতায় লেখা আছে যা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানীয় কিংবা 'লাওহে-মাহফুয থেকে অবতীর্ণ। সুহুফ এর অর্থ নাবীদের কিতাবসমূহ। যেমন আল্লাহ্ বলেন, এটা আগেকার সহীফাগুলোতেও ছিল। যথা ইবরাহীম ও মুসা (আলায়হিমাস সালাম) এর সহীফা।' ওর সম্মান আল্লাহ্‌র কাছে কিংবা সাত আসমানের উপরে খুবই। কিংবা ওটা সন্দেহ ও পারস্পরিক বৈপরিত্যভাব থেকে পবিত্র ও উন্নত। পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া ওকে কেউ ছুঁতে পারে না। হাসান বলেন, সব রকম ময়লা থেকে তা পবিত্র। সুদ্দী বলেন, কাফিরদের থেকে উহা সুরক্ষিত। মাহাল্লী বলেন, শয়তানের ছোঁয়া থেকে। এটা এর দলীল যে, ঐ সহীফাগুলো আসমানে ফিরিশ্‌তাদের হাতে আছে। শয়তান ওখান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। সাফারাহ হল সা-ফির এর বহুবচন। সাফির এর অর্থ কাতিব বা লিপিকার। ফিরিশ্‌তারা লাওহে-মাহফুয থেকে ওটা লিপিবদ্ধ করে। কিংবা ওর অর্থ সাফীর বা দূত। আল্লাহ্ ওদেরকে কিরাম

বলেছেন। ওরা পাপ থেকে পবিত্র। কিংবা ওরা কোন স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় তাদের থেকে দূরে সরে যায়। অথবা ওরা পরের উপকারকে নিজের উপকারের চেয়ে প্রাধান্য দেয়। কিংবা ওরা মুমিনদের জন্য ইস্তিগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। বারারাহ হল বা-র্‌ এর বহুবচন। বা-র্‌ এর অর্থ সৎশীল ও নেককার।

কাফির মানুষের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) হোক। কিরূপ দৃঢ় তার কুফ্‌রী। কারখী বলে, এটা হল তার জন্য বদদুআ। মানুষ মহাশাস্তির যোগ্য। কারণ, তার পাপটাও মহাপাপ। কিংবা কুতিলাল ইন্‌সা-নু মা-আক্‌ফারাহু-র অর্থ কোন্ বস্তু তাকে কাফির বানালো? এই জিজ্ঞাস্যটা যেন ধমক দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রথম অর্থটা অধিক সঙ্গত। ঐ মানুষটি হলো উত্‌বা ইবনে আবূ লাহাব। কুফ্‌রী করার ব্যাপারে তার বাড়াবাড়ির জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। যাজ্জাজ বলেন, তোমরা তার কুফ্‌রীর জন্য বিস্ময় প্রকাশ কর। কিংবা মানুষ বলতে মানবজাতিও হয়। এটাই অধিক সঙ্গত। প্রত্যেক কট্টর কাফির এর মধ্যে গণ্য। আর যার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে সে তো নিঃসন্দেহে এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর আল্লাহ্ তাআলা ঐ কাফির লোকটির জন্য সেই সব বিষয় উল্লেখ করেছেন যার প্রতি তার লক্ষ্য করা উচিত। যাতে সে তার কুফ্‌রী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয়। তাই আল্লাহ্ বলেন, কোন্ জিনিষ থেকে তিনি তাকে পয়দা করেছেন? এই জিজ্ঞাস্যটা তাক্‌রীর (বক্তব্যকে দৃঢ়করণের জন্য) অথবা তাহ্‌কীরের (বক্তব্যকে তুচ্ছ করনের জন্য)। কিন্তু প্রথমটা অধিক অর্থবহ। কেউ বলেন, তাক্‌রীর ও তাহ্‌কীর দুইই। শিহাবও এই দিকে গিয়েছেন।

নুত্‌ফার অর্থ বীর্য। এটা হল পূর্ণ হেয়করণ। হাসান বলেন, যে পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের হয় সে আবার অহংকার করে কি করে? তাকে এক বিন্দু নাপাক পানি থেকে আল্লাহ্ পয়দা করেছেন এবং দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতি যন্ত্র তৈরী কোরে দিয়েছেন, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করেছেন, তারপর তাকে ভাল মন্দের পথ বাতলে দিয়েছেন। সুদ্দী ও কাতাদাহ বলেন যে, মায়ের পেট থেকে বের হওয়া সহজ কোরে দিয়েছেন। কোন কোন জ্ঞানীব্যক্তি বলেন, বাচ্চার মাথাটা মায়ের গর্ভে উপরের দিকে থাকে এবং পা-টা নীচের দিকে অর্থাৎ পেটের মধ্যে সোজা থাকে। অতঃপর যখন বের হবার সময় তখন ইলহামের দ্বারা সে পাল্টে যায়। একথা ইমাম রাযী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথম মতটাই বেশী ঠিক।

মানুষ যখন মরে যায় তখন সে কবরবাসী হয়। কবরে ঢেকে দেওয়ায় তাকে এক প্রকার সম্মান দেওয়া হয়। কারণ, যমীনের উপরে তাকে যদি রেখে দেওয়া হয় তাহলে হিংস্র পশু ও পাখী তাকে খেয়ে নিত। ফার্রা একথা বলেন। তারপর

http://islaminonesite.wordpress.com

যখন তাকে পুনরায় জ্যান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হবে তখন তিনি তাকে তুলে দাঁড় করাবেন। পুনরায় তোলাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে জড়িয়ে রাখা হয়েছে—এটা এর দলীল যে, পুনরুত্থানের সময়টা অনির্দিষ্ট, যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। ওটা ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহের অবস্থা যা ওর আগে হোয়ে যায় তার সময়গুলো কোন না কোন কারণে জানা যায়। সেই জন্য অন্যান্য বিষয়গুলোকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে জড়ানো হয়নি।

তারপর আল্লাহ্ বলেন, মানুষ ফর্মাবর্দারী করেনি এবং গোনাহ থেকে বিরত হয়নি। এই মানুষের ভাবার্থ কাফির, কিংবা সাধারণভাবে সব মানুষই। হাসান বলেন, কোন মানুষই আল্লাহ্‌র হুকুম তামিল করে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কর্তব্য পালনে অলসতা করে। কেউ কুফ্‌রী করে, কেউ নাফরমানী করে। এমন লোক খুব কম, যারা বাধ্য এবং কর্তব্য পালনে রত। কোন জ্ঞানী বলেন, মানুষ অহংকার করে কিভাবে? কারণ, সে এক হেয় পানি ছিল এবং পরিশেষে এক নাপাক মড়ায় পরিণত হয়। আর ঐ দুইয়ের মাঝখানে ময়লায় পূর্ণ। সুতরাং সে তার খাবার জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করুক। কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা ঐ খাদ্যদ্রব্যকে তার জীবনধারণের উপাদানে পরিণত করেছেন এবং জীবিকার উপকরণ বানিয়েছেন। যার দ্বারা সে পরকালের সম্পদ লাভের জন্য তৈরী হতে পারে। আল্লাহ্ বলেন, খাদ্যদ্রব্য তৈরীর জন্য আমি পানি বর্ষণ করি। পানির ভেতরে যেন রিয্‌ক বা জীবিকা রেখে দেওয়া হয়েছে। তারপর যমীনকে ফেড়ে দিই, যাথেকে শস্য ও বীজ বের হয়। তারপর তাদের নিজ নিজ আকৃতি অনুযায়ী ছোট বড় চারা উৎপন্ন করি, যা আহারের কাজ দেয়। তারপর আঙ্গুর ও তরি-তরকারী পয়দা করেছি যা জন্তুদের খোরাক হয়। যয়তুন থেকে তেল বের হয়। খেজুরের সারি সারি বাগান লাগিয়েছি। আঙ্গুর, বেদানা, লেবু, খেজুর, কিশমিশ প্রভৃতি সব ফলই ফা-কিহার মধ্যে গণ্য। ফা-কিহা ঐসব জিনিষ যা মানুষ খায়। যথা আঙ্গুর জলপাই ইত্যাদি। আব্ব হল ঐসব ঘাস ও লতা, যা মানুষ খায় না ও রোয় না। এগুলো সবই ভোগের বস্তু সবরকম প্রাণীর জন্য।

ফতহুল বায়ানে বলা হয়েছে যে, স্বা-খ্‌খা-হ কিয়ামতের ভয়ংকর আওয়ায। সেদিন এই বিকট ধ্বনি হবে সেদিন তার আওয়াযের চোটে কানের পর্দা ফেটে যাবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার আপনজন থেকে দূরে পালাবে। আত্মীয়তার কারণে যাদের উপরে মানুষের দয়া ও মায়া করা উচিত, তাদের থেকে সে পালিয়ে যাবে। তাদের থেকে পালানোটাই একথার দলীল যে, সেদিনের অবস্থাটা কতই না সংকটময় হবে। পালাবার মানে হল এই যে, একে অপর থেকে দূরে থাকবে এবং নিজের চিন্তায় বিভোর থাকার ফলে অপরের চিন্তাই করবে না। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তার ভাই থেকে পালাবে সে হল হাবীল এবং মা-বাপ

থেকে যিনি পালাবেন তিনি হলেন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম। আর স্ত্রী থেকে যারা দূরে সরে যাবে তারা হলেন নূহ ও লূত আলায়হিমাস সালাম। নিজ পুত্র থেকেও নূহ (আ:) সরে যাবেন। কিন্তু সবাই পালাবে এই ব্যাপকভাবটা গ্রহণ করা অধিক সংগত। এই পলায়ন এই কারণে হবে যে, যাতে কেউ কারোর কাছে নিজের ব্যাপারে সাহায্য না চেয়ে বসে। অথবা কেউ যেন কারো কষ্ট ও আযাব না দেখে ফেলে। কিংবা সবাই জানে যে, আজকে তার কোন আত্মীয় কোনই কাজে আসবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন, ইয়াওমা লা-য়্যুগনী মাওলান্ আন্ মাওলান্ শাইয়্যান—অর্থাৎ সেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুরই কাজে আসবে না (সূরারে দুখান ৪১ আয়াত)।

ইবনে তাহের আযহারী বলেন, সেদিন আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে প্রত্যেকেই একে অপর থেকে পালাবে। দুনিয়াতেও যদি আজ ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে সবাই আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপরে ভরসা করবেনা। সেদিন সবাইতো নিজের জ্বালায় অস্থির থাকবে। তখন কোথায় বাপ ও মা এবং কোথায় ছেলেমেয়ে ও ভাইবোন, আর কোথায় স্ত্রী? কে কার খবর নেয়? এরপর আল্লাহ্ তাআলা ভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের পরিণাম বর্ণনা কোরে বলছেন যে, কিয়ামতের ঐ সংকটে পড়েও কিছু লোক হাসিখুশী ও আনন্দিত থাকবে। এরা হল মুমিন বা আল্লাহ্ বিশ্বাসী। এরা হিসাব নিকাশের পর নিজের সফলতা জানতে পেরে এবং বিরাট পুণ্য পেয়ে খুশীতে নাচতে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র মেহেরবানী ও সন্তুষ্টি দেখে উৎফুল্ল হোয়ে উঠবে। যাহ্হাক বলেন, অযুর কারণে তাদের চেহারায় চমক সৃষ্টি হবে। কিংবা রাতে নামায পড়ার ফলে অথবা আল্লাহ্‌র রাহে ধুলোবালি মাখার ফলে তাদের মুখ উজ্জল হবে। আর কিছু লোকের মুখ কালিমাময় ও মলিন হবে। যার উপরে বিষন্নভাব ফুটে উঠবে। ধুলোবালি ও কালিমার একত্রে সমাবেশের চেয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের জিনিস আর কি আছে? আসমানের দিকে যে ধুলো উড়ে যায় তাকে ক্বাতারাহ বলে এবং যা যমীনে এসে পড়ে তা হল গাবারাহ। ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ হল লাঞ্ছনা ও অবমাননা। যাদের এই অবস্থা হবে তারা হল কাফির ও ফাজির। তারা কুফ্‌রী ও ফাজিরী কাজের কাজী। সেজন্য তাদের চেহারাতে কালিমাও পড়বে এবং ধুলোবালিও জমা হবে। ফাজির বলা হয় মিথ্যাবাদী ও দুষ্কৃতিকারীকে। আল্লা-হু আ'লাম।

সংযোজন

এই সূরাটি মক্কী। এতে হিজাযীদের মতে বিয়াল্লিশটি এবং কূফীদের গণনায় একচল্লিশটি ও বাসারীদের মতে চল্লিশটি আয়াত আছে। এতে শব্দ আছে দুশো

http://islaminonesite.wordpress.com

তেত্রিশ এবং বর্ণ আছে পাঁচশো তেত্রিশটি। তিনটি আয়াতের গণনায় মতভেদ আছে। এর শুরুতে আবাসা শব্দ থাকায় সূরাটির নাম হয়েছে আবাসা (বাসা-য়িরু যাভিত তাময়ীয ৫০১ পৃষ্ঠা)।

এই সূরাটিতে চার রকম বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। প্রথমথেকে ষোল আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে তাঁকে একটি পদস্খলন থেকে সতর্ক কোরে দেওয়া হয়েছে। তা হল এই যে, একদা তিনি মক্কার কতিপয় হোমরা চোমরা পাণ্ডাদেরকে ইসলামের দাঅত দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক অন্ধ গরীব মুসলিম তাঁর নিকটে এসে ইসলাম সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে চান। তখন তিনি নিজ কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি মনে করে অন্ধটির প্রতি কিছুটা উপেক্ষার ভাব দেখান। তাঁর এই উপেক্ষা ভাবটা তাঁর মত বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। তাই আল্লাহ্তাআলা কুরআন নাযিল কোরে তাঁকে সাবধান কোরে দেন।

উক্ত ঘটনাতে দুটি শিক্ষা রয়েছে। এক—একজন মানুষ যতই ব্যস্ত থাকনা কেন এমতাবস্থায় তাঁর নিকট যে কেউ হাযির হোক তাকে পারতপক্ষে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা চলবেনা। দুই—প্রত্যেকেরই নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দাঅত পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর যারা আগ্রহ দেখাবে তাদেরই প্রতি বেশী ঝুঁকতে হবে এবং যারা মোটেই আগ্রহ দেখাবে না তাদের প্রতি কম ঝুঁকলে দোষ হবে না।

এই সূরার একাদশ আয়াতে একটি শব্দ আছে—কাল্লা—অর্থাৎ কখনই না, বা মোটেইনা। সমগ্র কুরআনে এই শব্দটি নাবী (সঃ) এর শানে এই একটিবার ছাড়া আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, ইসলামের দাঅত্টা এতই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ যে, তাতে কোন রকম ভুলচুক হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ কোন ভুল করে ফেলে তাহলে ঐ ভুলকারী যতই প্রিয়পাত্র হোক না কেন তাকে তক্ষুনি সতর্ক কোরে দেওয়া উচিত।

১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের দাঅত নিছক উপদেশমূলক। অতএব যে এই উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে সে-ই তা গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে গরীব ও বড়লোকের কোন ব্যাপার নেই এবং নামী ও অনামীর কোন কারবার নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই মহা মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করে না। বরং এটাকে অমান্য করে থাকে।

তাই ১৭ থেকে ২৩ নং আয়াতে ঐ না-ফরমানীর দিকে ইঙ্গিত কোরে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষই কতই না নেমকহারাম। অথচ সে ভেবে দেখেনা যে, তাকে কিরূপ দুর্গন্ধ যুক্ত ও ঘৃণ্য পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। যে-পানি

একজনের পেশাবের দ্বার দিয়ে বের হোয়ে অন্যের পেশাবের দ্বারে ঢুকেছে। অতঃপর কতিপয় স্তর পার হবার পর ঐ ঘৃণ্য বীর্যে প্রাণ সঞ্চার করা হলে তার খোরাক হয় আরো জঘন্য ও ঘৃণ্য বস্তু অর্থাৎ মায়ের ঋতুর রক্ত। তারপর ঐ হাড়গোড় ও মাংসের সমষ্টি ছোট শিশুটি এরূপ সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে গর্ভের জগৎ থেকে মর্তের জগতে বেরিয়ে আসে যা কল্পনাও করা যায় না। তার এই বেরোবার পথকে অত সহজ কোরে দেন কে? এই ইঙ্গিত রয়েছে ২০ নং আয়াতে। অতঃপর ঐ শিশুটি যখন কচি হোক বা জোয়ান, কিংবা বুড়ো হয়ে মারা যায় তখন তাকে জন্তুদের মত মাঠে ফেলে দেওয়া হয় না। যাতে কোরে তার মৃত দেহটি পচে যাবে এবং শিয়াল, কুকুর ও বাঘ ভাল্লুক তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। বরং তার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকই তাকে মেরে ফেলেন ও তাকে সসম্মানে কবরে রাখবার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ার প্রথম মৃতব্যক্তি হাবীলকে মাটি দেবার পদ্ধতি দুটি কাকের মাধ্যমে এবং তারপর আদম (আঃ)-কে কবর দেবার নিয়ম ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ শিখিয়ে দিয়েছেন (ফতহুল আযীয, আমপারা ৬৬ পৃষ্ঠা)। তারপর তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাকে পুণর্জীবন দান কোরে একটি বিশেষ মাঠে জড় করবেন। মানুষের প্রতি এত ইহ্সান করা সত্ত্বেও সে তার প্রতিপালকের সামান্যতমও নেমক হালালের পরিচয় দেবে না? সে তাঁর হুকুম মত চলবে না। বরং ঘৃণ্য পানি থেকে জন্ম তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও অতি নগণ্য মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করবে? এবং স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করবে?

সূরাটির দ্বিতীয় অংশে মানুষকে তার জন্ম বৃত্তান্তের দিকে ইঙ্গিত কোরে তৃতীয় অংশে ২৪ থেকে ৩২ নং আয়াতে নেমকহারাম মানুষকে তার দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নেমক হালালের পরিচয় দিতে বলা হয়েছে। তাই বলা হচ্ছে যে, মানুষ তার খাদ্যের প্রতি একটু খেয়ান দিক। তার খাদ্য তৈরীর জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে কে? তারপর যমীনের বুক চিরে বীজগুলো উৎপন্ন করে কে? অতঃপর ঐ সব অংকুরকে গাছে পরিণত কোরে তাথেকে বিভিন্ন রকম শস্য ও ফলপাকড় এবং তরিতরকারী তৈরী করে কে? যা মানুষের এবং তাদের পালিত পশুদের খোরাক হয়? কিছু খাদ্য এমন থাকে যা জন্তুদের জন্য খাস। যেমন পাতা ও ঘাস। কিছু খাদ্য জন্তু ও মানুষের উভয়েরই জন্য। আর কিছু এমন আছে যা মানুষ খায় এবং ওর খোসা ও ছিবড়াগুলো পশুরা খায়। তারপর ঐসব খাদ্যগুলো খাবার পর তা কতই না ঘৃণ্য হোয়ে যায় যখন তা পায়খানা হোয়ে বের হয়। ঐসব খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য কোরে মানুষ উপলব্ধি করুক যে, এক সময় ঐ খাদ্যগুলোর মান ইয্যত কত ছিল। এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ সম্মানীয় বস্তুগুলোর দাম কত তুচ্ছ, বরং ঘৃণ্য ও জঘন্য। যাকে মানুষ দুচোখে দেখতেও চায় না।

http://islaminonesite.wordpress.com

তেমনি মানুষের দামও দুনিয়ার সাময়িক জীবনে অনেক হলেও এক সময়ে তার মান ও দাম পায়খানার মত হতে পারে। আর ঐ সময়টাই হল পরকালের তুমুল হট্টগোল ও চেঁচামেচির সময়। যার বর্ণনা এই সূরাটির চতুর্থ অংশে ৩৩ থেকে ৪২ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ে এত বিকট শব্দ হবে যে, সবারই কানে তালা লেগে যাবে। ফলে সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের নিকট থেকে ভয়ে পালাতে থাকবে।

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জ্বালায় অস্থির থাকবে এবং সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারো উপকারে আসবে না। তবে ওরই মধ্যে কিছু ব্যক্তি হাসিখুশী থাকবে এবং তাদের চোখমুখ চমকাতে থাকবে তাদের ঈমান ও নেক আমলের জন্য। তেমনি বেশিরভাগ মুখ মলিন থাকবে এবং তাদের মুখে চুনকালি পড়ে থাকবে। এরাই তারা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে মানতো না। ফলে তারা স্বেচ্ছাচার জীবন যাপন করতো এবং মস্তানী ও গোঁয়ার্তুমি কোরে বেড়াতো।

সূরা না-যিআ'-ত

একে সূরায়ে সা-হিরাও বলা হয়। এতে ৪৫ বা ৬৪টি আয়াত আছে। সবারই মতে সূরাটি মক্কী। ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর বলেন, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। ইবনে কাসীরও বলেন, এটা মক্কী।

বাংলা উচ্চারণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু করছি)

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ تَرْجُفُ
الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠
ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢
فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤ هَلْ اَتٰىكَ
حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٥ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝١٧ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ
تَزَكّٰى ۝١٨ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝١٩ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ
الْكُبْرٰى ۝٢٠ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝٢١ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝٢٢ فَحَشَرَ
فَنَادٰى ۝٢٣ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝٢٤ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ
الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝٢٥ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٢٦ ءَاَنْتُمْ
اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَا ۝٢٧ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝٢٨ وَ
اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝٢٩ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ
دَحٰىهَا ۝٣٠ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۝٣١ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۝٣٢
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٣ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝٣٤
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝٣٥ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ
لِمَنْ يَّرٰى ۝٣٦ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝٣٧ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝٣٨

http://islaminonesite.wordpress.com

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾
إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

১। অন্ না-যিআ তি গারক্বান। ২। অন্ না-শিত্বা-তি নাশ্ ত্বান। ৩। অস্ সা-বিহা-তি সাব্হান। ৪। ফাস্ সা-বিক্বা-তি সাব্ক্বান। ৫। ফালমুদাব্বিরা-তি আম্রান। ৬। ইয়াওমা তারজুফুর র-জিফাহ্। ৭। তাতবা উহার র-দিফাহ। ৮। কুলুবুই ইয়াওমায়িযিই ওয়া-জিফাহ। ৯। আব্সা-রুহা খ-শিআহ। ১০। ইয়া কূলুনা আইন্না লামারদূদূনা ফিল হা-ফিরাহ। ১১। আইযা-কুন্না ইযা-মান্ নাখিরাহ। ১২। ক্বা-লু তিলকা ইযান্ কার্রতুন খ-সিরাহ। ১৩। ফাইন্নামা-হিয়া যাজ্রতুঁও ওয়া-হিদাহ। ১৪। ফাইযা-হুম্ বিস্সা-হিরাহ্। ১৫। হাল্ আতা-কা হদিসু মূসা। ১৬। ইয্ না-দা-হু বিলওয়া-দিল মুকাদ্দা-সি তুওয়া। ১৭। ইযহাব্ ইলা ফিরআওনা ইন্নাহূ ত্বগা। ১৮। ফাকুল হাল্ লাকা ইলা আন্ তাযাক্কা। ১৯। ওয়া আহ্দিয়াকা ইলা রব্বিকা ফাতাখ্শা। ২০। ফাআরাহুল আ-য়াতাল কুব্রা। ২১। ফাকায্যাবা ওয়া আসা। ২২। সুম্মা আদ্বারা ইয়াস্আ। ২৩। ফাহাশারা ফানা-দা। ২৪। ফাক্ব-লা আনা রব্বুকুমুল আ'লা। ২৫। ফাআখাযাহুল্লা-হু নাকা-লাল আ-খিরাতি অলউলা। ২৬। ইন্না ফী যা-লিকা লাইব্রতাল্ লিমাঁই ইয়াখ্শা। ২৭। আআনতুম আশাদদু খাল্কান আমিস্ সামা-উ বানা-হা। ২৮। রফাআ সাম্কাহা ফাসাওওয়া-হা। ২৯। ওয়া আগত্বশা লাইলাহা অআখ্ রাজা যুহা-হা। ৩০। অল্আরযা বা'দা যা-লিকা দাহা-হা। ৩১। আখ্রজা মিনহা মা-আহা অমার-আ-হা। ৩২। অল্জিবালা আরসা-হা। ৩৩। মাতা-আল লাকুম অলিআন্ আ-মিকুম। ৩৪। ফাইযা জা-আতিত ত্ব-ম্মাতুল কুব্রা। ৩৫। ইয়াওমা ইয়াতাযাক্কারুল ইনসা-নু মা-সাআ। ৩৬। অবুররিযাতিল জাহীমু লিমাঁই ইয়ারা। ৩৭। ফা-আম্মা-মান

ত্বগা। ৩৮। ওয়া আ-সারাল হাইয়াতাদ্দুনয়্যা। ৩৯। ফাইন্নাল জাহীমা হিয়াল মাওয়া। ৪০। অআম্মা-মান খ-ফা মাকা-মা রব্বিহী অনাহান্ নাফ্সা আনিল হাওয়া। ৪১। ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। ৪২। ইয়াস্আলুনাকা আনিস সা-আতি আইয়্যা-না মুরসা-হা। ৪৩। ফীমা আন্তা মিন যিক্রা-হা। ৪৪। ইলা রব্বিকা মুন্তাহা-হা। ৪৫। ইন্নামা আন্তা মুনযিরু মাঁই ইয়াখ্শা-হা। ৪৬। কাআন্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারওনাহা লাম্ ইয়ালবাসু ইল্লা আশিয়্যাতান-আও যুহা-হা।

তরজমা

১। (বেঈমানদের শিরায় শিরায়) ডুব মেরে টেনে হিঁচড়ে রূহ বেরকারীদের (ফিরিশ্তাদের) কসম! ২। এবং (মুমিনদের রূহের বাঁধন) ধীরে ধীরে আলগাকারীদের কসম! ৩। আর (ঐ রূহ নিয়ে আসমানের দিকে) ছুটে সাঁতার দানকারীদের কসম! ৪। অতঃপর দৌড়াদৌড়ি কোরে একে অপরের চেয়ে আগে যেতে আগ্রহীদের কসম! ৫। তারপর (আল্লাহ্র) প্রতিটি হুকুম মোতাবেক কার্য সম্পাদনকারীদের কসম! ৬। (ওদের সবার কসম খেয়ে আমি আল্লাহ্ বলছি) যেদিন বিশ্ব কম্পনকারী (ইসরাফিলের প্রথম শিঙ্গাধ্বনি সারা বিশ্বকে) কাঁপিয়ে তুলবে। ৭। (এবং) তার পরেপরেই আর একটি ধাক্কা আসবে (অর্থাৎ লাগাতার ভূমিকম্প হতে থাকবে)। ৮। সেদিন মানুষের হৃদয় (ভয়ে) ধড়ফড় করবে। ৯। তাদের চোখগুলো (লজ্জায়) নীচু হোয়ে থাকবে। ১০। (কিয়ামতের ঐ বিবরণ শুনে) তারা বলছে, তাহলে (মরার পরও) আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনের দিকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে কি? ১১। যখন আমরা পচাগলা হাড়ে পরিণত হোয়ে যাব (তখনও কি?) ১২। তাই তারা বলছে, (যদি তাই হয়) তাহলে তো ঐ প্রত্যাবর্তন (আমাদের পক্ষে) খুবই ক্ষতিকারক হবে। ১৩। (তারা জেনে নিক যে, তাদের জন্য) এটা কেবলমাত্র একটি ধমক স্বরূপ হবে। ১৪। ফলে অমনি তারা (হাশরের) ধূলপাড় ময়দানে (জড় হোতে) থাকবে। ১৫। তোমার নিকট মূসার কোন বিবরনী এসেছে কি? ১৬। যখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালক পবিত্র তোয়া উপত্যকায় ডেকে বলেন। ১৭। তুমি ফিরআওনের কাছে যাও। কারণ, সে উচ্ছৃংখল হোয়ে পড়েছে। ১৮। অতঃপর (তাকে) বল, তোমার কি শুদ্ধাচরী হবার (কোন) আগ্রহ আছে? ১৯। তাহলে আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ বাতলে দিই। যাতে তুমি ভীতচিত্ত হও। ২০। অতঃপর মূসা তাকে (তাঁর নবুঅতীর) সবচেয়ে বড় নিশানী দেখালো। ২১। কিন্তু সে তা মিথ্যা মনে করলো এবং (মূসার কথা) অমান্য করলো। ২২। তারপর সে পিছন ফিরে প্রতিকূল চেষ্টায় রত হল।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফলে সে (একদা সবাইকে এক জায়গায়) জমায়েত করলো, তারপর চেঁচিয়ে ডাক দিল। ২৪। অতঃপর বললো, আমি তোমাদের সর্বোপরি প্রভু। ২৫। ফলে আল্লাহ্ তাকে পরকাল ও ইহকালের সাজায় পাকড়াও করলেন। ২৬। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বিশেষ শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে তার জন্যে যেব্যক্তি (আল্লাহ্কে) ভয় কোরে থাকে। ২৭। কিগো সৃষ্টির দিক দিয়ে তোমরাই বেশী শক্ত, না আসমান? তিনিই তো ওটা বানিয়েছেন। ২৮। তিনি ওর ছাদকে খুব উঁচু করেছেন। অতঃপর ওর ভারসাম্য ঠিকঠাক কোরে দিয়েছেন। ২৯। আর ওর রাতকে তিনি (অন্ধকারে) ঢেকে দিয়েছেন এবং দিনের আলোও বের কোরে দিয়েছেন। ৩০। তারপরে যমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। ৩১। যাথেকে তিনি পানি ও আহারাদি বের করেছেন। ৩২। আর পাহাড়গুলোকে তিনি নোঙ্গরের মত গেড়ে দিয়েছেন। ৩৩। (এসব) তোমাদের এবং তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য (তৈরী করেছেন)। ৩৪। অতঃপর যখন সেই মহাবিপদ এসে পড়বে। ৩৫। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা সে (দুনিয়াতে) করে গেছে। ৩৬। এমতাবস্থায় জাহান্নাম খুলে দেওয়া হবে তার সামনে যে তাকে দেখতে চাইবে। ৩৭। অতএব যেব্যক্তি (পৃথিবীতে) বাড়াবাড়ি করেছে। ৩৮। এবং পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ৩৯। তার ঠিকানা নিশ্চয়ই জাহান্নাম হবে। ৪০। আর যেব্যক্তি নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করেছে এবং মনকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রেখেছে। ৪১। তার ঠিকানা নিশ্চয়ই জান্নাত হবে। ৪২। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামতের ঐ সময় কখন সংঘটিত হবে? ৪৩। সে আলোচনায় তোমার কি দরকার? ৪৪। (কারণ) তোমার প্রভুর কাছেই তো রয়েছে তার চরম জ্ঞান। ৪৫। (সুতরাং) যেব্যক্তি ওকে ভয় করে তুমি কেবল তাকেই সতর্ক কোরে দিতে পার। ৪৬। যেদিন তারা ওকে দেখবে সেদিন তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা যেন দুনিয়াতে মাত্র এক সাঁঝ অথবা এক সকাল অবস্থান করেছিল।

তাফসীর

ইবনে কাসীর বলেন, ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস ও সুদ্দী প্রমুখ বলেছেন, না-যিআ-ত্ হল সেইসব ফিরিশ্তা যারা বেইমানদের রগশিরায় ডুব মেরে তাদের প্রাণকে টেনে হিঁচড়ে বের করে। আর না-শিতা-ত ঐ ফিরিশ্তা যারা মুমিনদের দেহের বাঁধন খুলে দেয়। ফলে তাদের রূহ আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়ে। ইবনে আব্বাসের অন্য উক্তি এই যে, কাফিরদের প্রাণকে টানাটানি করা হয়। অতঃপর তা বেরিয়ে আসে। ফের তাকে আগুনে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। মুজাহিদ বলেন, না-যিআত্ এর অর্থ মৃত্যু। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, না-যিআত্ ও না-শিতাত্

এর অর্থ তারকা। আতা বলেন, এগুলো হল তীর, যা যুদ্ধের সময় চলে। এর মধ্যে প্রথম অর্থটাই সঠিক। অধিকাংশের মত তাই।

আলীর মতে সা-বিহা-ত, সা-বিকা ত ও মুদাব্বিরাত এর ভাবার্থ ফিরিশ্তা। হাসান বলেন, ঐসব ফিরিশ্তারা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত তাদের প্রভুর হুকুম মোতাবেক সব কাজ করে থাকে। তাই তাদেরকে মুদাব্বিরাত বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন, রা-জিফাহ ও রা-দিফাহ এর অর্থ প্রথম শিঙ্গাধ্বনি ও দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি। এই উক্তিই হল মুজাহিদ ও হাসান প্রমুখের। সুফয়্যান সওরী থেকে মরফূ রিওয়ায়াত আছে যে, রাতের তিন ভাগের দুভাগ যখন চলে যেত তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) দাঁড়িয়ে বলতেন, ওগো লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর! কারণ, র-জিফাহ এসে গেছে। তার পেছনে আছে র-দিফাহ। যে তাদের মরণকে নিয়ে এসেছে যারা ওর মধ্যে আছে (তিরমিযী, ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতিম)। ইবনে আব্বাস বলেন, ওয়া-জিফাহ এর অর্থ খা-যিফাহ বা সন্ত্রস্ত। এটা হল মুজাহিদ ও কাতাদার উক্তি। খা-শিআহ এর ভাবার্থ লাঞ্ছিত ও পদদলিত। আখিরাতের সংকটজনক অবস্থা দেখে তাদের চোখ লজ্জায় নত হোয়ে যাবে। কুরাইশদের মুশরিক এবং তাদের সম-মনোভাবী লোকেরা পরকালকে অস্বীকার করতো এবং মরণের পর পুনরুত্থানের ব্যাপারটা গাঁজাখুরি মনে করতো।

মুজাহিদ বলেন, হা-ফিরাহ এর অর্থ কবর। তারা বলতো, দেহ যখন পচেসড়ে যাবে, হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হোয়ে যাবে তখনও আমরা পুনর্জীবিত হব কি? ইবনে আব্বাস বলেন, হাড় যখন পুরানো হয়ে যায় এবং তার ভেতর দিয়ে বাতাস আসে যায় তখন তাকে নাখিরাহ বলে। এই শব্দটি না-খিরাহও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্তঃসার শূন্য ও ফাঁপা হাড়। ইকরিমা, সুদ্দী ও কাতাদাহ বলেন, হা-ফিরার ভাবার্থ মরার পর পুনর্জীবন। ইবনে যায়দ বলেন, আগুন। আগুনের অনেক নাম আছে। তন্মধ্যে একটি এই নামও। এছাড়া না-র, জহীম, সাকার, হা-ভিয়া, হুতামাহ প্রভৃতি ওর আরো নাম আছে। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেন, কুরাইশরা বলতো, আল্লাহ্ যদি মরণের পর আমাদের পুনরায় জ্যান্ত করেন তাহলে তা তো বড়ই ক্ষতিকারক হবে। তার জওয়াবে আল্লাহ্ বলেন, একটিমাত্র ধমকানিতে তোমরা সবাই আল্লাহ্র হুকুমে হাশরের ময়দানে এসে জড় হবে। আল্লাহ্ তাআলা ইসরাফীল (আঃ)-কে হুকুম দেবেন সূরে (শিঙ্গাধ্বনিতে) ফুঁক দাও। অর্থাৎ পুনরুত্থানের জন্য ফুঁক দাও। ফলে আগেকার ও শেষকার সমস্ত লোকই বিশ্বপ্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, সেদিন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে ডাক দেবেন। ফলে তোমরা প্রশংসা করতঃ তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং মনে

http://islaminonesite.wordpress.com

করবে যে, সামান্যক্ষণ মাত্র তোমরা (দুনিয়ায়) ছিলে (সূরায়ে বানী ইসরাইল ৫২ আয়াত)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, কিয়ামতের ব্যাপারটা চোখের পলক বা তার চেয়ে আরো কম সময়ের মত হবে (সূরায়ে নাহ্ল ৭৭ আয়াত)।

মুজাহিদ বলেন, 'যাজ্রা-য়ে ওয়াহিদার' অর্থ সাইহায়ে-অ-হিদাহ অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ। ইবরাহীম তাইমী বলেন, আল্লাহ্ তাআলার রাগ মখলুকের উপর সবচেয়ে বেশী ঐদিনে হবে যেদিন তিনি তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। হাসান বলেন, এই ডাঁট সবচেয়ে বেশী ঐদিনে হবে যেদিন তিনি তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। হাসান বলেন, এই ডাঁট রাগের হবে। আবূ মালিক ও রবী বলেন, এই যাজ্র বা ধমকের ভাবার্থ শেষ শিঙ্গাধ্বনি। ইবনে আব্বাস বলেন, সা-হিরাহ এর অর্থ সমগ্র যমীন। ইবনে যায়দ বলেন, ভূপৃষ্ঠ। মুজাহিদ বলেন, যমীনের নীচে পানি, যা উপরে এসে গেছে। সওরী বলেন, সা-হিরাহ হল সিরিয়ার যমীন। আবুল আ-লিয়াহ বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের যমীন। কাতাদাহ বলেন, সা-হিরাহ্ জাহান্নাম। ইবনে কাসীর বলেন, এইসব উক্তিগুলো অভিনব। সঠিক, এই যে, সা-হিরাহ্ হল ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ।

ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্তাআলা তাঁর রসূল মুহাম্মাদ (সঃ-কে খবর দিয়ে বলেন যে, আমি আমার বান্দা মূসাকে ফিরআওনের কাছে রসূলরূপে পাঠিয়ে ছিলাম এবং মু'জিযা (অলৌকিক বিষয়াদি) দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়েছিলাম। তথাপি ফিরআওন কুফ্রির উপরে জমে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করেন। ঠিক এইরূপ অবস্থা ঐসব লোকদেরও হবে যারা তোমার বিরোধিতা করবে এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। তাই ঐ কাহিনী বর্ণনার পর আল্লাহ্ বলেন, এর মধ্যে বহু শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে আল্লাহ্ভীরুদের জন্যে।

'তোয়া' একটি উপত্যকার নাম। 'ত্বগা'—শব্দের অর্থ উদ্ধত হওয়া, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। মূসা (আঃ) ফিরআওনকে বলেছিলেন, তুমি কি এটা চাও যে, তুমি এমন পথে চলবে যার ফলে শুদ্ধাচারী হবে? তাহলে আমি তোমাকে প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদতের নিয়ম কানুন বাতলে দেব? যা করলে তোমার মনে ভয় হবে এবং তুমি তাঁর অনুগত হবে। এখনো পর্যন্ত তোমার মন শক্ত ও অপবিত্র এবং কল্যাণ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এই দাঅত দেবার সাথে সাথে মূসা (আঃ) তাকে একটি বড় নিশানী দেখালেন এবং তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণে একটি অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল পেশ করলেন। কিন্তু ফিরআওন তাঁকে মিথ্যুক মনে করলো। তার কথা অমান্য করলো এবং আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করলো। তার মন কাফির হোয়েই থাকলো। প্রকাশ্যে ও গোপনে তাতে কোনরূপ প্রভাব পড়লো না। ফিরআওন জানতো যে, মূসা (আঃ) যা কিছু আল্লাহ্র তরফ

থেকে পেশ করেছেন তার সবটাই সত্য। এদ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, সে মুমিন ছিল। কারণ, মনের জানাকে জ্ঞান বলে, এবং ঐ জ্ঞান মোতাবেক বিনয় ও ভয়ের সাথে আমল করাকে ঈমান বলে। ফিরআওন তা করেনি, বরং সে পিছন ফিরে বাতেল দ্বারা হকের মোকাবেলা করতে থাকে। ঐ মোকাবেলা এই যে, সে একদিন যাদুকরদের জমা করলো। যাতে তারা তাদের যাদু দিয়ে মূসা নাবীর মুজিযার মোকাবেলা করে। সে লোকদের জড় কোরে নিজ কওমকে ডেকে বলল, আমি তোমাদের প্রভু। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন ফিরআওন প্রথমে একথা বলেছিল: মা আলিমতু লাকুম মিন ইলা-হিন গায়রী—অর্থাৎ আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা (সূরায়ে কাসাস, ৩ আয়াত)। এর ৪০ বৎসর পর সে বলে: আনা রব্বুকুমুল আ'লা অর্থাৎ আমিই তোমাদের সর্বোপরি প্রভু। যার ফলে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবে গ্রেফতার করেন এবং তাকে এমন শাস্তি দেন, যা শিক্ষার উপকরণ হয় তাদের জন্য যারা তার মত উদ্ধত ও উচ্ছৃংখল হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, আমি তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতেও তারা কোনরূপ সাহায্য পাবে না (সূরায়ে কাসাস ৪১ আয়াত)। ইব্রাত শব্দের ভাবার্থ উপদেশ গ্রহণ করাও ডাঁট খেয়ে সাবধান হওয়া।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের পয়দা করা বেশি শক্ত, না আসমান সৃষ্টি করা? ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্তাআলা পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করেছেন। অন্যত্রে তিনি বলেন, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টির চেয়ে কঠিনতর (সূরায়ে মুমিন ৫৭ আয়াত)। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের মত জিনিষ তৈরীর ব্যাপারে পুনরায় সক্ষম নন কি? নিশ্চয়ই, তিনিই তো মহাস্রষ্টা জ্ঞানী (সূরায়ে ইয়াসীন ৮১ আয়াত। বানা-হা শব্দটির ব্যাখ্যা 'রফাআ সাম্কাহা ফসাও ওয়া-হা'। অর্থাৎ তিনি আসমানকে সুউচ্চ ও সুবিশাল কোরে অন্ধকারে তারকাপুঞ্জ দিয়ে বানিয়েছেন। এবং রাতকে গাঢ় কালো করেছেন। আর দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় ও ঝলমলে করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, 'আগ্-ত্বশা লাইলাহার অর্থ অন্ধকার। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর তাই বলেন। যুহা বেরকরণের অর্থ দিনকে ঝলমলে করা। সূরায়ে হা-মিম সিজদায় আছে, আসমানের আগে যমীনকে পয়দা করা হয়েছে। কিন্তু যমীনের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ আসমান তৈরীর পরে হয়েছে। ইবনে আব্বাস একথা বলেন। ইবনে জরীর এই মতটি গ্রহণ করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্তাআলা যমীন চিরে নদী তৈরী করেছেন এবং টিবি ও পাহাড় তৈরী কোরে তাতে বালু ও ঝরনা তৈরী কোরে দিয়েছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি পাহাড়গুলোকে এমন শক্ত কোরে জমিয়ে দিয়েছেন, যাতে যমীন নড়াচড়া না করতে পারে। এসব কারিগরি হাকীম (বিজ্ঞানময়) আলীম (জ্ঞানী) রউফ (দয়াবান) রহীম (করুণাময়) আল্লাহ্‌র।

আনাস ইবনে মালিক মরফুভাবে বলেন, যখন আল্লাহ্ তাআলা যমীন তৈরী করেন তখন সে বাড়তে থাকে। তাই আল্লাহ্ তাআলা পাহাড়গুলো পয়দা কোরে যমীনের উপরে ফেলে দেন। ফলে সে দাঁড়িয়ে যায়। পাহাড় সৃষ্টির ফলে ফিরিশ্‌তারা আশ্চর্যবোধ করে এবং জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্! তোমার সৃষ্টিজীবের মধ্যে এইসব পাহাড়ের চেয়ে আর কোন শক্ত ও কঠিন চিজ আছে কি? বললেন হাঁ, লোহা। তারা বললো, লোহার চেয়েও কোন কঠিনতর জিনিষ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আগুন। তারা বললো, আগুনের চেয়ে কোন্ বস্তু কঠিন? বললেন, পানি। তারা বললো, পানির চেয়ে শক্তিশালী কি আছে? বললেন, হাওয়া। তারা বললো, হাওয়ার চেয়ে বেশী শক্তিধর কোন্ জিনিষ? বললেন, আদম সন্তান দান করে ডান হাতে। সে তাকে বাম হাত থেকে গোপনে রাখে (মুসনাদে আহ্‌মাদ)। তারপর আল্লাহ্ বলেন, এই সব জিনিষ তোমাদের এবং তোমাদের পশুদের জীবন ধারণের জন্য। তিনি তোমাদেরই জন্যে ঝরনা প্রবাহিত করেছেন, ক্ষেত খামার ফলমুল ও গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। তোমরা পশুদের গোশ্‌ত খাও। তাদের উপর সওয়ারও হও।

ত্বা-মমায়ে কুবরার ভাবার্থ কিয়ামতের দিন। ইবনে আব্বাসের উক্তি তাই। কারণ, ঐদিনে প্রত্যেকটি বিষয় ভয়ানক ও বিপজ্জনক হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন: অস্‌সা-আতু আদহা-ওয়া আমার—অর্থাৎ কিয়ামতের সময়টি অতি বিপজ্জনক ও খুবই তিক্ততাসূচক (সূরায়ে কামার ৪৬ আয়াত)। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ভালমন্দ আমলের কথা মনে করবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তার স্মরণের সময় কোথায় (সূরায়ে ফাজ্‌র)।

মানুষ সেদিন জাহান্নামকে তার সামনে প্রকাশ্যে দেখবে। যারা উদ্ধত হয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে পরকালের তুলনায় বেছে নিয়েছিল তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম। তারা কাঁটাওয়ালা ফল যাক্‌কূম খাবে এবং গরম পানি পান করবে। আর যারা আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে জওয়াবদিহী করবার ভয়ে নিজের মনকে খেয়াল খুশিমত চলা থেকে বিরত রেখেছিল এবং পাপ থেকে বেঁচে পুণ্যের দিকে ফিরেছিল তাদের পরিণতি জান্নাত হবে।

ইবনে কাসীর লিখেছেন, আল্লাহ্ বলেন, এরা তোমাকে কিয়ামতের কথা জিজ্ঞেস করছে যে, তা কবে হবে? কিন্তু ওর জ্ঞান তো তোমারও নেই এবং কোন সৃষ্টিজীবেরও নেই। বরং ওর জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে আছে।

তিনিই ওর নির্দিষ্ট সময়ের কথা জানেন। অন্যত্রে আল্লাহ্ বলেন, তুমি বল, ওর এল্‌ম আল্লাহ্‌রই কাছে আছে (সূরায়ে আ'রাফ)। এখানে আল্লাহ্ বলেছেন, ওর চরম জ্ঞান আল্লাহ্‌রই কাছে। জিবরাইল (আঃ) নাবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিয়ামতের সময় কখন? তিনি (সঃ) বলেন, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী কিছু জানে না। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নাবীরা ও ফিরিশ্‌তারা গায়েবের খবর জানেন না। গায়েবের খবর জানা একমাত্র আল্লাহ্‌রই বৈশিষ্ট্য। তবে হাঁ, তোমার কর্তব্য এতটুকু যে, যেকেউ কিয়ামতের ভয় রাখে তুমি কেবল তাকেই আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি থেকে সতর্ক কোরে দাও। অতঃপর যেব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং তাঁর সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে, আর তোমার অনুসরণ করবে সে সুপথ পাবে। নৈরাশ্য ও সর্বনাশ তার, যে তোমাকে মিথ্যা মনে করবে এবং তোমার বিরোধিতা করবে। যখন তারা কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে আসবে তখন তারা পৃথিবীর জীবনকে খুব সামান্যক্ষণ মনে করবে। যেমন একটি দিনের সাঁঝ বা সকাল। ইবনে আব্বাস বলেন, যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আশিইয়্যাতুন এবং উদয় থেকে অর্ধেক দিন পর্যন্ত যুহা। অর্থাৎ তারা মনে করবে যে, আমরা পৃথিবীতে মাত্র দুটি প্রহর কাটিয়েছিলাম। চায় তা দিনের প্রথমার্ধ হোক, কিংবা শেষার্ধ। কাতাদাহ বলেন, যখন তারা আখিরাত দেখবে তখন দুনিয়ার সময়টিকে তারা অতি সামান্যক্ষণ মনে করবে।

ফতহুল বায়ান বলে, নাযিআত এর অর্থ সেই ফিরিশ্‌তা যারা মানুষের রূহকে ঐভাবে টানে যেমন তীর চালনাকারী ধনুকে টান দেয় এবং খুব জোর লাগায়। এইরূপ সা-বিহাত ও সা-বিকাত প্রভৃতি শব্দগুলির ভাবার্থ ও ফিরিশ্‌তা। এই শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। যদিও এগুলো ফিরিশ্‌তাদের গুণবাচক শব্দ। অথচ ফিরিশ্‌তারা স্ত্রীলিঙ্গ নয়। এর কারণ, এই যে, এটা এক একটি দলের গুণ। দলকে আরাবীতে ত্ব-য়িফাহ বলে। যার বহুবচন ত্বওয়া-য়িফ। এই ত্বাওয়া-য়িফেরই গুণ হল না-যিআত প্রভৃতি। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবা-তাবিয়ীদের মত তাই। নাশ্‌তের অর্থ দেহ থেকে প্রাণকে অতি সহজে বের করা। যেমন উটের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। না-যিআত কাফিরদের জন্য এবং না-শিতাত মুমিনদের জন্য। মুআয ইবনে জাবালের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, হে মুআয, তুমি লোকদেরকে ফেড়ে খেয়োনা। যদি খাও তাহলে আগুনের কুকুর তোমাকে ফেড়ে খাবে। কারণ, আল্লাহ্ বলেন, অন্‌নাশিতা-তি নাশ্‌তান—তুমি জান কি, এর অর্থ কি? তিনি বললেন, আপনি বলুন। নাবী (সঃ) বললেন, এরা হল আগুনের কুকুর, যারা গোশ্‌ত ও হাড়কে ফাড়াফাড়ি করে (ইবনে মারদোওয়াহে)।

http://islaminonesite.wordpress.com

সা-বিহাত সেইসব ফিরিশ্‌তা যারা ডুব মেরে সহজে প্রাণ বের করে। তারপর তাকে আরাম নেবার জন্য ছেড়ে দেয়। কিংবা ঐসব ফিরিশ্‌তা যারা ডুব মেরে সহজে প্রাণ বের করে। তারপর তাকে আরাম নেবার জন্য ছেড়ে দেয়। কিংবা ঐসব ফিরিশ্‌তারা যারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের জন্য আসমানের উপর থেকে ছুটে বেড়ায়। কিংবা মুমিনদের রূহ যা ফিরিশ্‌তাদের সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে আসমানে সাঁতার দেয়। সা-বিকা-ত সেইসব ফিরিশ্‌তা যারা নাবীদের কাছে অহী পৌঁছানোর ব্যাপারে শয়তানের উপরে টেক্কা মারে। অথবা আদম সন্তানের কাছে কল্যান ও সৎকর্ম নিয়ে এগিয়ে আসে। কিংবা মুমিনদের রূহকে বেহেশ্‌তের দিকে জলদি নিয়ে যায়। অথবা এইসব ফিরিশ্‌তারা সব কাজই করে থাকে।

মুদাব্‌বিরাত সেইসব ফিরিশ্‌তা যারা মানুষের এক বছরের কার্যাবলীর বন্দোবস্ত করে থাকে। কিংবা সেই সব ফিরিশ্‌তা যারা আজরাইলের সাথে মরণাপন্ন লোকের রূহ বার করবার সময় হাযির থাকে। কোন ফিরিশ্‌তা রূহকে উপরে নিয়ে যায়। কেউ দুআতে আমীন বলে। কেউ মোরদার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরিশেষে তার জানাযা পড়া হয় এবং তাকে দাফন করা হয়। কুশাইরী বলেন, এ ব্যাপারে ইজ্‌মা বা সবারই মত এক যে, ঐ শব্দগুলোর ভাবার্থ ফিরিশ্‌তা। মা-ওয়ার্দী বলেন, এ ব্যাপারে দুটি উক্তি আছে—এক জম্‌হুর বা অধিকাংশ আলিম বলেন, ফিরিশ্‌তা এবং অন্য মতে সাতটি গ্রহ। মুআয ইবনে জাবালের উক্তিও তাই। গ্রহের তদবীরের ভাবার্থ দুটি। এক উদয় ও অস্ত এবং দ্বিতীয় তাদের যা হুকুম দেওয়া হয় তা পালন করা। ফিরিশ্‌তাদের তদবীর হারাম ও হালালের বিশদ বিবরণ নিয়ে নামা। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তদবীরকারী হলেন আল্লাহ্‌তাআলা। যাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। কেউ কেউ বলেন, ফিরিশ্‌তাদের হুকুম দেওয়া আছে যে, তারা যেন হাওয়া ও বৃষ্টি প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে। তাই তাদেরকে মুদাব্‌বিরাত বলা হয়। আবদুর রহমান ইবনে সাবাত বলেন, দুনিয়ার কার্যাবলী সম্পাদনের ভার চারজন ফিরিশ্‌তার উপরে আছে। ১। জিবরাঈল ২। মীকাঈল ৩। আযরাঈল ৪। ইসরাফীল। জিবরাঈল (আঃ) এর উপর হাওয়া ও সৈন্যদের ভার। মীকায়ীলের উপর গাছপালা উৎপন্নের ভার। আযরায়ীলের উপর মানুষের জান কবযের ভার। এবং ইসরাফীলের উপর আল্লাহ্‌র হুকুম নিয়ে নামার ভার। উক্ত কসমগুলোর জওয়াব এই যে, তোমাদেরকে মরার পর পুনরায় উঠতে হবে।

ফতহুল বায়ানে আছে, এখানে র-জিফার অর্থ ভয়ংকর ও বিকট শব্দ। যার মধ্যে দ্বিধা ও বিচলিত ভাব আছে বিদ্যুতের মত। এটা হল প্রথম শিঙ্গাধ্বনি। যার ফলে সারা সৃষ্টি জগত মরে যাবে। একথা বলেন ইবনে আব্বাস। আর র-দিফার অর্থ দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি। যা পুনরুত্থানের সময় হবে। দুই সূরের মাঝে

৪০ বৎসরের ব্যবধান হবে। ইবনে যায়দ বলেন, র-জিফাহ্‌ হল ভূকম্পন এবং র-দিফাহ্‌ কিয়ামত। মুজাহিদ বলেন, র-জিফাহ্‌ ভূমিকম্প এবং র-দিফাহ্‌ বিকট শব্দ। ওয়া-জিফাহ্‌ হৃদয়ের গুণবাচক শব্দ। সেদিন মানুষের দিল বিচলিত, ভীত ও ধড়ফড় করা অবস্থায় হবে। অধিকাংশ মুফাসসির এই মত পোষণ করেন। তারা কিয়ামতের সংকটময় পরিস্থিতি দেখে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে। আতা বলেন, এরা হল অমুসলিমের দল। কারণ, আয়াতটি বর্ণনা করা হয়েছে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে। তাদেরকে যখন বলা হোত যে, তোমরা পুনরুত্থিত হবে তখন তারা ইয়ার্কি মারতো এবং বলতো, আমরা কি মরার পর আবার পূর্ব অবস্থায় পুনর্জীবিত হব? যদি এরূপ হয় তাহলে তো বড়ই ক্ষতি হবে। কারণ, হাড় গলেসড়ে একাকার হয়ে গেলেও আমরা কেমন করে জ্যান্ত হব? ওদের জওয়াবে আল্লাহ্‌ বলেন, তোমরা মরার ও কবরস্থ হবার পর একটি ধমকে আবার যমীনের উপরে উঠে দাঁড়াবে। ওয়াহিদী বলেন, সা-হিরাহ্‌ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ বলেন, ঐ যমীন রুপোর হবে। কিংবা সপ্তম যমীন, যার উপরে আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের হিসাব নিকাশ নেবেন। অথবা মক্কার যমীন। কিংবা কিয়ামতের মাঠ। অথবা জাহান্নাম।

ফতহুল বায়ানের শব্দ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ঐ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে সান্ত্বনা দেন যে, তুমি তোমার কওমের মিথ্যারোপের জন্য মন খারাপ করোনা। ওরাও ঐরূপ শাস্তি পাবে যেমন ওদের আগেকার উম্মতরা পেয়েছিল। যদিও তারা তোমার কওমের চেয়ে বহু শক্তিশালী ছিল। 'তোয়া'-কে পবিত্র উপত্যকা বলার কারণ এই যে, ঐ উপত্যকায় নবুওঅত ও বরকত নাযিল হয়েছিল। এই সম্মান আল্লাহ্‌ তাআলা ঐ উপত্যকাকে দান করেছেন। ফার্রা বলেন, এই উপত্যকা মদীনা ও মিসরের মাঝখানে। এর নাম 'তোয়া' এই জন্য যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বানী ইসরাইলদের পাপগুলো এখানে লেপটে দেন। কারণ, মুসা (আঃ) এই উপত্যকাটি রাতে অতিক্রম কোরে উঁচু উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন। কিংবা এটা সিরিয়ায় তূর পাহাড়ের কাছাকাছি ঈলা ও মিসরের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। অথবা হিব্রু ভাষায় 'তোয়া'র অর্থ হে লোকটি। কিংবা ঐ উপত্যকায় পুনর্বার বরকত দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটাই অধিক সঙ্গত।

ত্বগার অর্থ আল্লাহ্‌র নাফরমানী, কুফরী, ও অহংকার প্রভৃতিতে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ্‌ একথা বলেননি যে, তার সীমা লংঘন কোন্‌ বিষয়ে ছিল। আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীর ব্যাপারে, না সৃষ্টিজীবের উপর যুলুমের ব্যাপারে। যাদেরকে সে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। 'তাযাক্কার' অর্থ শির্ক থেকে মুক্ত হওয়া। ইবনে আব্বাস বলেন, ঐ আয়াতটির ভাবার্থ হল লাকা আন তাকূলা

http://islaminonesite.wordpress.com

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্। অর্থাৎ তুমি কি একথা বলতে চাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ মাবুদ (উপাস্য) নেই। কিংবা ওর ভাবার্থ এই যে, তুমি কি চাও যে, মুসলমান হোয়ে ভাল ভাল কাজ করবে? একবার আল্লাহ্তাআলা মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন যে, তুমি ফিরআওনের সাথে নরম নরম কথা বলবে (সূরায়ে ত্ব-হা ৪৪ আয়াত)। এবং সম্মানের সাথে সাক্ষাৎ করবে। এই আয়াতটি যেন ঐ আয়াতের তাফসীর। তারপর মূসা বলেন, আমি কি তোমাকে তোমার প্রভুর পথ দেখিয়ে দেব, যাতে তুমি তার শাস্তি থেকে ভয় পাও। ইবনে আতা বলেন, খাওফের চেয়ে 'খাশিয়্যাতের' মধ্যে ভয়ের আধিক্য ও পূর্ণাঙ্গতা আছে। কারণ, খাশিয়্যাত শব্দটি আমিলদের গুণস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন।

انما يخشى الله من عباده العلمؤ

ওয়াসিতী বলেন, জ্ঞানের প্রথম হল খাশিয়্যাত (ভয়)। তারপরে ইজ্লা-ল (সমীহ)। তারপরে তাযীম (সম্মান প্রদর্শন)। তারপর হায়বাত (অধিক ভীতি)। তারপর ফানা (অনির্বান)। কেউ কেউ বলেন যার মধ্যে ভয় ঢুকে যায় সে প্রত্যেক খুশীর জিনিষ থেকে গাফেল হোয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা তার জীবন সাথীতে পরিণত হয়। পরিশেষে সে ভয় থেকে নিরাপদ হোয়ে যায়। 'আয়া-তে কুব্রা' বা সবচেয়ে বড় নিশানীর ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। কেউ বলে মূসার ছড়ি। কেউ বলে, য়্যাদে-বাইযা- (সাদা হাত)। কেউ বলে দরিয়ার চিরে যাওয়া। কেউ বলে, ৯টি নিশানী। তবে প্রথমটাই অধিক সঙ্গত। তারপর সাদা হাত।

অধিকাংশ আলিম বলেন, মূসা (আঃ) ফিরআওনকে 'আসা ও য়্যাদে-বাইযা' অর্থাৎ লাঠি ও সাদা হাত দেখিয়েছিলেন। ভাবার্থের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে ঐক্য থাকায় আয়াতে কুবরা দুটোকেই বলা হয়েছে। কিংবা শুধু লাঠি। তিনি এই নিশানীটা প্রথমে দেখিয়েছিলেন। তারপরে য়্যাদে-বাইযা। একটি আয়াত—'আমি তাকে আমার সব নিশানীই দেখিয়েছিলাম'—(সূরায়ে ত্বা-হা ৫৬ আয়াত)। এটি আয়াতে-কুব্রার বিপরীত নয়। কারণ, এখানে শুধু প্রথম নিশানী প্রদর্শনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যা ফিরআওনের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় দেখানো হয়েছিল। আর তা হল লাঠি ও সাদা হাত। তারপর একটার পর একটা কোরে সমস্ত নিশানী সময় মত দেখানো হয়েছে। যাদুকরদের পরাজিত হবার পর বাকি নিশানী দেখানো হয়েছিল ২০ বছরে। যেমন সূরায়ে-আ'রাফ দ্বারা বোঝা যায়। ফিরআওন ঐ বড় নিশানী দেখা সত্বেও তাকে মিথ্যা মনে করে এবং বিদ্রোহাচরণ করে। তারপর অশান্তি সৃষ্টির জন্য সে চেষ্টা করতে থাকে এবং সে যেকোন উপায়ে হোক মূসার সাথে বাদানুবাদ কোরে লড়াইয়ের জন্য স্বীয় সৈন্য জমা করতে

থাকে। সে যাদুকরদের সমবেত করে এবং তামাশা দেখার জন্য লোকদের ডাকে। অতঃপর সে বলে যে, আমি তোমাদের সর্বোপরি প্রভু।

মূসা (আঃ) বলেছিলেন যে, আমাকে আমার প্রতিপালক তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তখন সে বলেছিল: আমার উপরে আর কোন প্রভুই নেই। সবার উপরে তো আমিই আছি। আতা বলেন, ফিরআওন ছোট ছোট বুত বানিয়ে হুকুম দিয়েছিল যে, আমি এইসব বুতের প্রভু। কিংবা 'রব্বের' অর্থ আমি তোমাদের পরিচালক ও সর্দার। কিন্তু প্রথম অর্থটাই ঠিক। এই আয়াত অনুযায়ী—আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভুর খবর তো আমি জানিনা—এই কথা বলার পর আল্লাহ্ তাকে ধরেন এখানে এবং ওখানে। 'নাকাল'-এর অর্থ সাজা। আখিরাতের নাকাল জাহান্নামের আযাব এবং নাকালে-উলা দুনিয়ার শাস্তি। যার ফলে সে নীল দরিয়ায় ডুবে মারা যায়। তারপর আল্লাহ্ বলেন, ফিরআওনের এই ঘটনার মধ্যে সেইসব লোকদের জন্য মহান শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে।

আসমান তৈরীর চেয়ে তোমাদেরকে তোমাদের মরার পর পুনরায় পয়দা করা বেশী কঠিন কি? এই আয়াতের সম্বোধিতগণ মক্কা শরীফের কাফিররা। এর উদ্দেশ্য ডাঁট দেওয়া ও ধমকানো। কারণ, আসমানের মত বিস্ময়কর জিনিষ আল্লাহ্ পয়দা করেছেন। তাহলে তিনি মানুষের দেহকে মরার পরে জ্যান্ত করতে অক্ষম কি? মোটেই না। তারপর আল্লাহ্ তাআলা আসমান তৈরীর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, আমি যমীনের উপরে আসমান তৈরী করেছি। তার উচ্চতাকে হাওয়ার মধ্যে শূন্যে রেখেছি। সুতরাং যমীন থেকে আসমান পাঁচশো বৎসরের পথ উঁচুতে। বাগাভী বলেন, সাম্কুন এর অর্থ ছাদ। আসমান যেমন যমীনের ছাদ। তেমনি এক আসমান অন্য আসমানের ছাদ যে তার নীচে আছে। তারপর তিনি সব আসমানকে এক সমান কোরেছেন। সবারই আকৃতি পরিমিত। কারো মধ্যে কোন তফাত নেই। কোনরূপ বাঁকাচোরা ও ফাটল নেই।

'আগ্ত্বশার' অর্থ অন্ধকার। রাতকে আসমানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কারণ, রাত সূর্য ডোবার পর আসে। আর সূর্য আসমানে থাকে। দিনকে 'যুহা' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ 'যুহা' বা প্রথম প্রহরই হল দিনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সময়। দিনের সম্পর্কও আসমানের দিকে এইজন্য করা হয়েছে যে, দিনের অভ্যুদয় সূর্য উদয়ের সাথে হয়। আর সূর্যের সম্পর্ক আসমানের সাথে জড়িত। আসমানের পর আল্লাহ্ তাআলা যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তিনি আসমান সৃষ্টির দু'হাযার বছর পরে যমীনকে মক্কা মুআয্যামা থেকে ছড়িয়ে দেন। এই আয়াত এবং সূরায়ে হা-মীম সিজদার আয়াত—সুম্মাস তাওয়া ইলাস্

http://islaminonesite.wordpress.com

সমা-য়ি—এর মধ্যে কোনরূপ টক্কর নেই, বরং সমন্বয় আছে। কারণ, প্রথমে আল্লাহ্ যমীন তৈরী করেন, তারপরে আসমান। তারপরে যমীনকে ছড়িয়ে দেন এবং আসমানকে সমান কোরে দেন। কিংবা এখানে 'বাদ' (পরে) শব্দের অর্থ 'মাঅ' বা সাথে, অথবা কাব্‌ল বা আগে। প্রথম সমন্বয়টি উত্তম। ইবনে আব্বাসও তাই বলেন। ইবনে জরীর ঐমত গ্রহণ করেছেন। পানি বের করার অর্থ নদী, সমুদ্র ও ঝরনা প্রভৃতি। মারআর অর্থ উদ্ভিদ। শিহাব বলেন, মারআ ঐসব তৃণ লতাদি যা জন্তুরা খায়। পাহাড় জমিয়ে দেবার আগে খাওয়া ও পান করার বর্ণনা প্রথমে করার কারণ এই যে, যাতে ওর গুরুত্ব বর্ধিত হয়। আনআম-এর ভাবার্থ গরু, বকরী ও উট প্রভৃতি।

ত্ব-শ্মাহ হল সেই বিপদ যা সব বিপদ ও মুসীবত থেকে বড়। এই সূরায় বর্ণিত ফিরআওনের সেই বিপদের চেয়েও বহু বড় হবে তিনি যিনি দাবী করতো—আমি সর্বোপরি খোদা। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা পরকালের বর্ণনা বিবৃত করেছেন ইহকালের অবস্থা বর্ণনার পরে। হাসান বলেন, এখানে ত্বা-শ্মার ভাবার্থ দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি। মুবার্রাদ বলেন, আরবদের নিকট ত্বা-শ্মাহ সেই মহাবিপদ যা কেউ সহ্য করতে পারে না। মুজাহিদ বলেন, সেদিন জান্নাতীকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীকে জাহান্নামে সোপর্দ করা হবে। ইবনে আব্বাস বলেন, এটা কিয়ামতের একটি নাম। মানুষ তার পাপ ও পুণ্যকে ঐদিনে খাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাবে।

সেদিন আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামকে খুলে সবার সামনে প্রকাশ করে দেবেন। ফলে ওর তাপ ও গরমভাব সবাই জানতে পারবে। সমস্ত সৃষ্টিজীব তা দেখবে। বিশ্বাসীরা তা দেখে আল্লাহ্র ন্যা'মতের কদর বুঝবে এবং কাফিরদের দুঃখের উপরে দুঃখ বেড়েই চলবে। যেব্যক্তি খেয়াল খুশীমত চলে দুনিয়ার জীবনকে পরকালের তুলনায় প্রাধান্য দিয়েছিল এবং দুনিয়াতে পাপ থেকে বেঁচেছিল আর নিজ কু-প্রবৃত্তিকে অন্যায় ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা বেহেশ্‌তে হবে। মুকাতিল বলেন, এটা হল সেই ব্যক্তি যিনি কোন পাপ করার ইচ্ছা করেছিলেন। আবার তার মনে পড়ে যে, আমাকে এর হিসাব আল্লাহ্র সামনে দিতে হবে। এই ভেবে সে ঐ পাপ করেনি তারই জন্য জান্নাতের ঐ বাগান।

হে মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাকে কাফিররা কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন। তোমাকে ওর জবাব দেবার কোন প্রয়োজনই নেই। কারণ, তুমি তো জানই না যে, তা কবে হবে। তা তো কেবল আল্লাহ্ই জানেন যে, তিনি কবে একে সংঘটিত করবেন। তুমি শেষ নাবী এবং কিয়ামতের নিদর্শনের একটি

নিদর্শন। মা আয়িশা (রাঃ) বলেন, এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে ক্ষান্ত হয়। যখন কোন দেহাতী নবীজীর (সঃ) কাছে আসতো সে এই সওয়ালই করতো। নাবী (সঃ) কোন নব যুবককে দেখে বলতেন, যদি এ বেঁচে থাকে তাহলে তোমাদের কিয়ামত কায়েম হোয়ে যাবে (ইবনে মারদোঅয়হে)। এটা এই জন্য যে, যেব্যক্তি মরে যায় তার কেয়ামত কায়েম হোয়ে যায়। কারণ, আলমে-বারযাখের অবস্থাবলী তার উপর জারী হয়। এটা হল কিয়ামতের পূর্বাভাষ। কিয়ামতের চরম জ্ঞান আল্লাহ্র কাছে আছে। তিনি জানেন কিয়ামত কোন্ দিনে, কোন্ মুহূর্তে কতদিন পরে সংঘটিত হবে। অন্য কেউ কি জানে? যেমন আল্লাহ্ বলেন,—'ইন্নাল্লা-হা ইনদাহূ ইলমুস সা-আহ্'—অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্রই নিকটে কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে (সূরায়ে আ'রাফ)। সুতরাং ঐ ব্যাপারে তোমাকে প্রশ্ন করা বেকার। তোমার কাজ হল ওদেরকে ঐদিনের ব্যাপারে সতর্ক কোরে দেওয়া। এইসব কাফিররা যেদিন কিয়ামতকে নিজ চোখে দেখবে। তখন তারা মনে করবে যে, আমরা দুনিয়াতে মোটেই ছিলাম না। কেবল এই সকালে, কিংবা এই সন্ধ্যা পর্যন্ত। অর্থাৎ আখিরাতের দীর্ঘদিনের মোকাবেলায় দুনিয়ার সমগ্র জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মনে হবে। কারণ, সেদিনটি ৫০ হাজার বছরের হবে। তার তুলনায় দুনিয়ার দিনের কোন মুহূর্তেরই তুলনা হয় না।

সংযোজন

এই সূরাটি মক্কী। কুফী বিদ্বানদের গণনায় এতে ছেচল্লিশটি এবং বাকী অন্যান্যদের গণনায় পঁয়তাল্লিশটি আয়াত আছে। এতে শব্দ আছে একশো উনআশিটি এবং হরফ আছে সাতশো পঁয়ত্রিশটি। দুটি আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ আছে (বাসা-য়িরু যাভিত্ তাম্‌য়ীয ৪৯৯ পৃষ্ঠা)।

কুরআনের পাঁচটি সূরা গুণবাচক শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। তা হল এই সূরা না-যিআত্ এবং সূরা স্ব-ফ্ফা-ত্, যা-রিয়া-ত্, মুরসালা-ত্ ও আ-দিয়া-ত্। এদের মধ্যে স্ব-ফ্ফা-তে তিনটি ও যা-রিয়া-তে চারটি এবং বাকী তিনটি সূরাতে পাঁচটি গুণবাচক শব্দ এসেছে। সূরা মুরসালা-তে কিয়ামত সংক্রান্ত আলোচনা আছে। ওর পরের সূরা নাবা-তেও কিয়ামতের বিবরণ এসেছে। তাই নাবা-র পরের সূরা না-যিআ-তের সূচনাও কিয়ামতেরই বর্ণনা দিয়েই আরম্ভ করা হয়েছে (ফাতহুল আযীয, উর্দু তরজমা আমপারা ২৮—২৯ পৃষ্ঠা)।

যে ব্যক্তি মারা গেল তার কিয়ামত তখনই শুরু হল। মানুষ তখনই মারা যায় যখন তার রূহ বের হয়ে যায়। তাই রূহ বেরকারী পাঁচ রকম গুণসম্পন্ন

http://islaminonesite.wordpress.com

ফিরিশ্‌তার বর্ণনা এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এই শব্দগুলো যেমনই ছন্দময় তেমনই ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টিকারী। তাই বুক ধড়ফড় কারী ও পিলে চমকানো বর্ণনা দানকারী। কিয়ামতের কিছু বিবরণ ৬ষ্ঠ থেকে ১৪শ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেন, তা হল প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি। এই শিঙ্গা সংক্রান্ত আলোচনায় আবূ হুরাইরার এক প্রশ্নের উত্তরে একদা নাবী (সঃ) বলেন, সূর হচ্ছে এক বিরাট শিং। যাতে তিন বার ফুঁক দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁকটা হবে ঘাবড়ানো ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবার এবং দ্বিতীয়টা হবে বেহুশ হোয়ে মারা যাবার। আর তৃতীয়টা হবে পুনরুত্থানের (তাফসীরে তাবারী ৩০ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা)।

মক্কার মুশরিকরা পরকালের কথা এবং পুনরুত্থানের ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতো না। যেমন তাদের বক্তব্য এই সূরার ১০ম থেকে ১২শ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাই তাদেরকে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার জন্য হজরত মূসা ও ফিরআওনের কিছু কাহিনী শোনানো হয়েছে ১৫শ থেকে ২৬শ আয়াতে।

মহানাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর আগেকার এক উদ্ধত ও আত্মগর্বী রাজা মিশরের ফিরআওন তাঁর যুগের নাবী মূসা (আঃ) এর উপদেশে মোটেই কান দেননি। তাই মূসা (আঃ) তাকে কতিপয় বাস্তব নিদর্শন দেখান। যেমন লাঠিকে বিরাট অজগর সাপে পরিণত করা এবং হাজার হাজার লোকের সামনে ফিরআওনের যাদুকরদের অগণিত সাপগুলোকে ঐ অজগরের গিলে ফেলা ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষমতায় উন্মত্ত ফিরআওন মূসা (আঃ)-কে গ্রাহ্যই করেনি। বরং সে একদা কিব্‌তীদের বাহাত্তর জন এবং বানী ইসরাইলদের সত্তর জন যাদুকরকে ডাকে। সেই সাথে সে ছ লাখ সত্তর হাজার বানী ইসরাঈল এবং ষোল লাখ সৈন্যকে এক জায়গায় জড় করে বলে যে, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু (হা-শিয়া সা-ভী ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা)। তার এই দাম্ভিকতার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে সাগরে ডুবিয়ে চুবিয়ে চুবিয়ে ধ্বংস করেন এবং পরবর্তীদের জন্য তার এই শাস্তিকে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেন।

মূসা (আঃ)-এর লাঠির মুজিযা কয়েক রকম ছিল। যেমন বিরাট অজগর সাপে পরিণত হওয়া। কুঁয়ো থেকে পানি তোলার সময় কূপের গভীর পর্যন্ত তা বেড়ে যাওয়া এবং দড়িতে আপনাআপনি বেঁধে যাওয়া। অন্ধকারে ওর দুটি শাখা মশালের মত আলোকময় হওয়া। মূসা (আঃ) এর ঘুমের সময় তা খাড়া অবস্থায় চৌকি দেওয়া। বকরী চরাবার সময় লাঠিটি রেখে এলে তা নেকড়ে বাঘের মত কোন হিংস্র পশুকে বকরিদের কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া। কারো

কারো মতে ঐ লাঠিটিতে নাকি এক হাজার মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। যার দুটি বর্ণনা কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঐ লাঠির মারে সাগরের দু ভাগ হওয়া এবং ওর আঘাতে পাহাড় থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া। (ফাত্‌হুল আযীয, আমপারা, ৪৪ পৃষ্ঠা)।

এইসব বাস্তব উদাহরণের কথা জেনেও মক্কার মুশরিকরা এবং ওদের মত ধারণা পোষণকারীরা যখন পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেনা তখন তাদেরকে প্রত্যহ চোখে দেখা কিছু প্রাকৃতিক উদাহরণ দিয়ে ২৭ থেকে ৩৩ নং আয়াতে আসমান ও পাহাড়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। উক্ত জিনিষগুলো একথা প্রমাণ করে যে—আসমান, যমীন ও পাহাড়ের মত বিশাল, বিস্তীর্ণ ও সুউচ্চ মহাসৃষ্টির নেপথ্যে একটি শক্তি আছে। যিনি ঐসব অভিনব ও মহাসৃষ্টির তুলনায় একটি ছোট্ট সৃষ্টি মানুষকে অতি সহজেই পুনর্জন্ম দিতে পারেন।

পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থান কখন হবে এবং তার পরিণতি কি হবে তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৩৪ থেকে ৪১ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, দুনিয়াকে ভালবাসা সমস্ত পাপের জড়। এই ভালবাসা তখনই হয় যখনই কেউ তার মনের দাসে পরিণত হয়। মনের গোলাম হলে নিজের প্রত্যেক কাজটা তার নিজের চোখে ভাল দেখায়। যেমন নাবী (সঃ) বলেন, তিনটি জিনিষ ধ্বংসকারী। এক—প্রবৃত্তির অনুসরণ। দুই—অতি কৃপণতা। তিন—মানুষের নিজেকে ভাল লাগা (বাইহাকী)। তাই যেব্যক্তি তার নিজের মনের গোলাম হোয়ে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় এবং মনের বিরুদ্ধে না গিয়ে পরকালের চিরস্থায়ী সুখকে ভুলে যায় তার ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কি হতে পারে? এই কথাই বলা হয়েছে ৩৭—৩৯ আয়াতে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, ৪০ ও ৪১ নং আয়াত দুটি আবূ ওয়াইর ইবনে ওমাইর ও মুসআব ইবনে ওমাইরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ ওয়াইর ছিলেন উদ্ধত ও পার্থিব জীবন নিয়ে মত্ত এবং মুসআব ছিলেন আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীতচিত্ত ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত। উহুদের যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কিরাম যখন ছত্রভঙ্গ হোয়ে যান তখন এই মুসআবই নাবীজীর সামনে ঢাল হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর বহু তীর তাঁর পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। ফলে তিনি শহীদ হন। তারপর নাবীজী যখন তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা পান তখন বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার পুণ্যের আশা করছি। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বলেন, আমি একে দুটি চাদর পরা অবস্থায় দেখেছিলাম। তোমরা কি ঐ দুটির দাম জান? এর জুতার ফিতা ছিল সোনার। (রূহুল মাআনী, আমপারা, ৩৭ পৃষ্ঠা)। ইনি যখন শহীদ হন তখন এঁর পরনে একটি লুঙ্গি ছাড়া

http://islaminonesite.wordpress.com

আর কিছু ছিল না। তদুপরি ঐ লুঙ্গিটিও এত ছোট ছিল যে, কাফন হিসেবে তা পরাবার সময় মাথা কিংবা পা ঢাকা যাচ্ছিল না। ফলে নাবীজীর হুকুমে মাথাটা লুঙ্গি দিয়ে ঢাকা দিয়ে পা-টা ইয্খার ঘাস দিয়ে ঢাকা হয়। এই হল প্রবৃত্তির দাস না হোয়ে পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য না-দেবার উত্তম আদর্শ।

পুনরুত্থান ও প্রতিফল দান হবে কিয়ামতের দিনে। এই তথ্যটি বোঝাবার জন্য বিভিন্ন রকম বলিষ্ঠ তথ্য ও অকাট্য উদাহরণ পেশ করার পর মক্কার মুশরিক ও নাস্তিকরা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হোয়ে পড়ে। ফলে তারা জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, কিয়ামতের ঐ মুহূর্তটি কখন সংঘটিত হবে? তাই ৪২ থেকে ৪৬ নং আয়াতে কিয়ামত সংক্রান্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঐ মুহূর্তের খবরটি আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানেনা। তথাপি ওর তুলনায় দুনিয়ার জীবন কিরূপ মনে হবে তারই একটি ধারণা দিয়ে শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবন একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যার মত সামান্যক্ষণ হবে।

অতএব এরূপ ক্ষণস্থায়ী—যা সকাল কিংবা সন্ধ্যার মত হবে এবং পরকালের মোকাবেলায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হবে তারই পেছনে মানুষ পড়ে থাকবে এবং ওরই মোহে পড়ে চিরস্থায়ী জান্নাতকে জলাঞ্জলি দেবে কি?

সূরা নাবা

বাংলা উচ্চারণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছি)

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِىْ هُمْ
فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ
نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا ۝٨ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّ
جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦ اِنَّ
يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ
فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝١٨ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝١٩ وَّ
سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ
مِرْصَادًا ۝٢١ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝٢٢ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝٢٣
لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝٢٤ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝٢٥
جَزَآءً وِّفَاقًا ۝٢٦ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝٢٧
وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝٢٨ وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝٢٩
فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝٣٠ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝٣١
حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝٣٢ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝٣٣ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝٣٤
لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝٣٥ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً
حِسَابًا ۝٣٦ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝٣٧ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

http://islaminonesite.wordpress.com

صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾
ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا
أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

১। আম্মা ইয়াতাসা-আলুন। ২। আনিন্ নাবায়িল আযীম। ৩। আল্লাযী হুম্ ফীহি মুখ্তালিফূন। ৪। কাল্লা সাইয়া'লামূন। ৫। সুম্মা কাল্লা সাইয়া'লামূন। ৬। আলাম্ নাজ্আলিল আরযা মিহা-দা। ৭। অল্জিবা-লা আওতা দা। ৮। অখালাক্না-কুম আয্ওয়া-জা। ৯। অজাআল্না নাওমাকুম সুবা-তা। ১০। অজাআল্নাল্ লাইলা লিবা-সা। ১১। অজাআল্নান নাহা-রা মাআ-শা। ১২। অবানাইনা ফাওক্বাকুম সাব্আন শিদা-দা। ১৩। অজাআল্না সিরাজাঁও অহ্হা-জা। ১৪। অঅানযাল্না-মিনাল মু'সিরা তি মা-আন্ সাজ্জা-জা। ১৫। লিনুখরিজা বিহী হাববাঁও অনাবা-তা। ১৬। অজান্না-তিন আলফা-ফা। ১৭। ইন্না ইয়াওমাল ফাস্লি কা-না মীক্বা-তা। ১৮। ইয়াওমা ইয়ুনফাখু ফিস সূরি ফাতাতূনা আফ্ওয়া-জা। ১৯। অফুতিহাতিস সামা-যু ফাকা-নাত আবওয়া-বা। ২০। অসুয়্যিরাতুল জিবা-লু ফাকানাত সারা-বা। ২১। ইন্না জাহান্নামা কা-নাত মিরসা-দা। ২২। লিত্ত-গীনা মাআ-বা। ২৩। লা-বিসীনা ফীহা আহ্ক্বা-বা। ২৪। লা ইয়াযূকূনা ফীহা বারদাঁও অলা শারা-বা। ২৫। ইল্লা হামীমাঁও অগাস্সা-ক্বা। ২৬। জাযাআঁও ভিফা-ক্বা। ২৭। ইন্নাহুম কা-নু লা-ইয়ারজূনা হিসা-বা। ২৮। অকাযযূ বূ বিআ-য়া-তিনা কিয্যা-বা। ২৯। অকুল্লা শাইয়িন আহ্স্বইনা-হু কিতা-বা। ৩০। ফাযূক্বূ ফালান নাযীদাকুম ইল্লা আযা-বা। ৩১। ইন্না লিলমুত্তাক্বীনা মাফা-যা। ৩২। হাদা-য়িক্বা ওয়া আ'না-বা। ৩৩। অকাওয়া-য়িবা আত্রা-বা। ৩৪। অকাসান দিহা-ক্বা। ৩৫। লা-ইয়াস্মাউনা ফীহা লাগ্ওয়ান অলাকিয্যা-বা। ৩৬। জাযা-আম্ মির রব্বিকা আত্বা-আন হিসা-বা। ৩৭। রব্বিস সামা-ওয়া-তি অল্আরযি অমা-বাইনাহুমার রহমা-নি লা-ইয়াম্লিকূনা মিনহু খিত্বা-বা। ৩৮। ইয়াওমা ইয়া কূমুর রূহু অল্মালা-য়িকাতু স্বফফা-লা-ইয়াতা কাল্লামুনা ইল্লা-মান আযিনা লাহুর রহমা-নু অক্বা-লা স্বওয়া-বা। ৩৯। যা-লিকাল্ ইয়াওমুল হাক্কু ফামান শা-আত্তাখাযা ইলা-রব্বিহী

মাআ-বা। ৪০। ইন্না-আনযারনা-কুম আযা-বান ক্বারীবা ০ ইয়াওমা ইয়ানযুরুল মারয়ু মা-কাদ্দামাত য়্যাদা-হু ওয়া ইয়াকূলুল কা-ফিরু ইয়া-লাইতানী কুনতু তুরা-বা।

তরজমা

১। কোন্ বিষয়ে তারা (পরকালে অবিশ্বাসীরা) পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? ২। সেই মহাসংবাদ (কিয়ামত) সম্পর্কে? ৩। যে বিষয়ে তারা মতভেদ কোরে থাকে? ৪। না, (মতভেদ) মোটেই না, অচিরেই তারা (মৃত্যুর পর এর প্রকৃতি) জানতে পারবে। ৫। পুনরায় (বলছি) না, না, (তাদের ধারনা কখনই ঠিক নয়) তারা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে। ৬। আমি কি যমীনকে বিছানাস্বরূপ তৈরী করিনি? ৭। এবং পাহাড়গুলোকে পেরেকস্বরূপ (ঠুঁকে দিইনি?) ৮। আর আমিই তো তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। ৯। এবং তোমাদের ঘুমকে ক্লান্তি দূরীকরণের উপাদান বানিয়েছি। ১০। আর আমিই রাতকে পরদায় পরিণত করেছি। ১১। এবং দিনকে রুযী রোজগার করার জন্য তৈরী করেছি। ১২। আর তোমাদের উপরে সাতটি শক্ত আকাশ নির্মাণ করেছি। ১৩। এবং (তাতে সূর্যের মত) একটি উজ্জ্বল প্রদীপও বানিয়ে দিয়েছি। ১৪। আর আমি বর্ষণকারী মেঘ হতে মুসলধারে বৃষ্টিপাতও করি। ১৫। যদ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্যাদি ও গাছগাছালী। ১৬। এবং ঘন ঘন সারি সারি বাগানাদি। ১৭। নিশ্চয় (পরকালে) শেষ ফয়সালার দিন নির্ধারিত করা আছে। ১৮। সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে তোমরা (কবর থেকে) দলে দলে বেরিয়ে আসবে। ১৯। এবং আসমানকে খুলে দেওয়া হবে। ফলে তা বহু দুয়ারে পরিণত হবে। ২০। আর পাহাড়গুলোকে চালনা করা হবে। ফলে তা মরীচিকার মত হোয়ে যাবে। ২১। নিশ্চয় জাহান্নাম শিকারের তাকে আছে। ২২। (কারণ) এটা হল উদ্ধত লোকদের ফিরে যাবার স্থল। ২৩। যেখানে তারা যুগযুগান্ত ধরে পড়ে থাকবে। ২৪। সেখানে তারা কোনরূপ ঠাণ্ডা জিনিষের আস্বাদ পাবেনা এবং কোন পানীয়ও না। ২৫। কেবলমাত্র গরম পানি ও জাহান্নামীদের পুঁজ ছাড়া। ২৬। এটাই (তাদের কর্মের) উপযুক্ত প্রতিফল হবে। ২৭। কারণ, তারা কোন হিসাব দেবার আশাই রাখতোনা। ২৮। এবং আমার নিদর্শনগুলোকে তারা ডাহা মিথ্যা মনে করেছিল। ২৯। অথচ আমি প্রত্যেক জিনিষটিকে (আমলনামায়) গুণে গুণে লিখে রেখেছি। ৩০। সুতরাং (আমলনামা দেখিয়ে আমি বলবো) এবার তোমরা তোমাদের প্রতিফলের মজা চাখো। অতঃপর আমি তোমাদের শাস্তি ছাড়া আর কোন জিনিষই বাড়াবো না। ৩১। নিশ্চয় আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য (পরকালে) রয়েছে মহাসাফল্য। ৩২।

http://islaminonesite.wordpress.com

(তা হল বেড়াবার জন্য) ফুলের বাগানাদি এবং (খাবার জন্য) আঙ্গুর ফলমূলাদি। ৩৩। (আর স্ফূর্তির জন্য) সমজুটি বহু নবযুবতী। ৩৪। এবং পেয়ালাসমূহ শরাবভর্তি। ৩৫। সেখানে তারা শুনতে পাবেনা কোন রকম আজেবাজে কথা, আর না মিথ্যা কথা। ৩৬। (তোমাদের জ্ঞানে) এগুলো প্রতিদানস্বরূপ (কিন্তু) তোমার প্রভুর তরফ থেকে এটা পর্যাপ্ত অনুদান স্বরূপ। ৩৭। সেই প্রভু, যিনি আসমান ও যমীনের এবং ওদের মধ্যবর্তী সব কিছুরই করুণাময় প্রতিপালক। যাকে তারা সম্বোধন করতে সাহসই পাবেনা। ৩৮। সেদিন রূহুল আমীন (জিব্রাঈল) এবং সমস্ত ফিরিশ্‌তাগণ লাইন দিয়ে দাঁড়াবে। তারা কেউই কথা বলতে পারবেনা। তবে হাঁ করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং সে সঠিক কথাই বলবে। ৩৯। ঐ দিনটি নিশ্চিত সত্য দিন। অতএব যেব্যক্তি চায় সে যেন তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় কোরে নেয়। ৪০। নিশ্চয় আমি সতর্ক কোরে দিলাম তোমাদেরকে সেই নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে। যেদিন প্রত্যেক মানুষই দেখতে পাবে যে, তার দুটি হাত কি সম্বল আগে পাঠিয়ে রেখেছে। এবং (তা দেখে) অবিশ্বাসী কাফিররা বলতে থাকবে—হায়, হায়! আমি যদি (মানুষ না হোয়ে) মাটি হতাম।

তাফসীর

খাযিন ও খতীব বলেন, এই সূরার নাম সূরায়ে আম্মা। একে সূরায়ে তাসা-উল ও সূরায়ে নাবাও বলে। এতে ৪০ বা ৪১টি আয়াত আছে। সবার মতে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর তাই বলেন।

প্রলয় দিবস সংগঠিত হবার কথা বেদ্বীনরা অস্বীকার করে থাকে। অথচ এটা এক ভয়ংকর সংবাদ। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা কাফিরদের উক্ত মনোভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ বলেন, 'নাবায়ে-আযীম বা মহাসংবাদ হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। মুজাহিদ বলেন, কুরআনে-কারীম। ইবনে কাসীর বলেন, প্রথম মতটাই অধিক সঙ্গত। কারণ, ওর সংগঠন হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কাফিররা মতভেদ করে থাকে। কেউ ওতে বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। মূযিহুল কুরআনে বলা হয়েছে, কেউ স্বীকার করে, কেউ অস্বীকার করে। কেউ বলে, দেহ পুনরুত্থিত হবে। কেউ বলে, আত্মার উপরে সুখ ও দুঃখের প্রতিফলন হবে। তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা ঐ নাস্তিকদের এই ভয় দেখান যে, তোমরা অতি শীঘ্র ব্যাপারটা জানতে পারবে। এটা তাদের জন্য শক্ত ডাঁট। যাজ্‌জাজ বলেন, এই শব্দটি জিজ্ঞাসাসূচক। কিন্তু ওর ভাবটা বিষয়টির মাহাত্ম্য প্রকাশক। এই জিজ্ঞাসার মধ্যে ভীতি প্রদর্শন, বিষয়টির দৃঢ়ীকরণ ও আশ্চর্যবোধের প্রকাশ রয়েছে। ওয়াহিদী বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ যখন নাবী হোয়ে লোকদেরকে একত্ববাদের

দাঅত দিলেন ও মরণের পর পুনরুত্থানের কথা বললেন, এবং কুরআন পড়ে শোনালেন তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এটাকি জিনিষ এনেছেন? ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। একে অপরকে কিছু জিজ্ঞেস কোরে কথাবার্তা বলাকে তাসা-উল বলে।

নাবার ভাবার্থ যদি কুরআন হয় তাহলে ওকে আযীম বা মহান এইজন্য বলা হয়েছে যে, সে একত্ববাদ ও রসূলের সত্যতা এবং পুনরুত্থানের খবর দিয়ে থাকে। যাহ্‌হাক বলেন, ওর অর্থ কিয়ামত বা প্রলয় দিবস। খৃষ্টানরা বলে, পুনরুত্থান আত্মার হবে। ইহুদীদের একটি দল বলে, দেহের পুনরুত্থান হবে। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতে জান্নাতের (স্বর্গের) বর্ণনা হিব্রু ভাষায় 'জানয়ীরা' শব্দ দ্বারা করা হয়েছে এই বাইবেলেও বহু জায়গায় পরকালের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সেখানে আল্লাহ্‌র ফর্মাবর্দারগণ আরাম পাবে এবং অবাধ্যরা শাস্তি পাবে। আরবের কিছু কাফিরও পরকালের অস্বীকার করতো। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, কাফিররা বলে, পরকাল তো আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা মরি ও বাঁচি। আর আমাদেরকে কেবলমাত্র যুগই ধ্বংস করে ফেলে (সূরায়ে জা-সিরায়া ২৪ আয়াত)। আমরা পুনরুত্থিত হব না (সূরায়ে মুমিনুন ৩২ আয়াত)। আর কিছু দল পরকালের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো। যেমন আল্লাহ্‌ তাদের উক্তি উদ্ধৃতি কোরে বলেন, আমরা তো ঐ ব্যাপারে একটা ধারণা রাখি অথচ আমরা বিশ্বাসী হতে পারিনা (সূরায়ে জাসিয়াহ ৩২ আয়াত)। এভাবে কাফিরদের মতভেদ ছিল। কিংবা 'ইয়াতা-সা-আলুন' শব্দের সর্বনামের মধ্যে আল্লাহ্‌দ্রোহী কাফির ও আল্লাহ্‌ বিশ্বাসী মুমিন উভয়েই আছে। মুসলমানরা পরকালকে বিশ্বাস করতো। তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হোত এবং কাফিরদের ঠাট্টা-তামাশা আরো বেড়ে যেত। একদল আলিম বলেন, 'নাবায়ে আযীম' এর ভাবার্থ মহান কুরআন।

তারা অচিরেই জানতে পারবে—আল্লাহ্‌র এই উক্তিটি তাদের জন্য ডাঁট ও ধমকস্বরূপ। অতঃপর এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি ধমকের উপর কড়া ধমক স্বরূপ। কিংবা প্রথম জানাটা মরণকালে হবে এবং দ্বিতীয় জানাটা পুনরুত্থানের পর হবে। অথবা প্রথম জানা পুনরুত্থানের সময় এবং দ্বিতীয়টা প্রতিফল পাবার সময় হবে। তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা অভিনব জিনিষ সৃষ্টি ও আশ্চর্যজনক বস্তু তৈরীর ব্যাপারে নিজের কুদ্‌রত ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ঐগুলো একথার দলীল যে, ঐসব কল্পনাতীত বস্তু সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন তিনি সক্ষম, তেমনি পরকাল সংঘটিত করার ব্যাপারেও তিনি সমর্থ। মিহা-দ-এর অর্থ বিছানা। অর্থাৎ তিনি যমীনকে বিছানার মত বিছিয়ে দিয়েছেন এবং পাহাড়ের দ্বারা তাকে অটল ও অনড় কোরে

http://islaminonesite.wordpress.com

রেখেছেন। যাতে সে টলমল করতে না পারে এবং যারা যমীনের উপরে বাস করে তারা যেন বিচলিত না হয়। আয্ওয়াজ এর অর্থ নর ও মাদী। যাতে একে অপরের দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, তাঁর (আল্লাহ্র) একটি নিদর্শন তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরকে জোড়া জোড়া পয়দা করা। যাতে তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) কাছে আরাম পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে স্নেহ ও মমতা সৃষ্টি কোরে দিয়েছেন (সূরায়ে রুম ২১ আয়াত)।

সুবাত এর অর্থ দিনের বেলায় জীবিকা অর্জন থেকে কখনো বিরত হোয়ে আরাম গ্রহণ করা। এরূপ একটি আয়াত সূরায়ে ফুরকানেও আছে। রাতকে লেবাস বলা হয়েছে। কারণ, লেবাস পোশাক যেমন দেহকে ঢেকে দেয় তেমনি রাতের অন্ধকার সবকে ঢেকে দেয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, রাতের কসম! যখন তা ঢেকে দেয় (কুরআন)। কাতাদাহ বলেন, লেবাস এর অর্থ জীবিকা অর্জন থেকে বিশ্রাম নেওয়া। কারণ, দিনের বেলায় মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য কেউ ব্যবসা করে। কেউ চাষ করে। কেউ দর্জিগিরি করে ইত্যাদি। অতঃপর রাত হলে তা থেকে বিরত হয়।

সাব্য়ে-শিদাদ বা সাতটি শক্ত বস্তুর ভাবার্থ সাত আসমান। তাই আল্লাহ্ বলেন, আমি জগত আলোকিতকারী সূর্যরূপী একটি প্রদীপ সৃষ্টি করিছি। ইবনে আব্বাস বলেন, মু'সিরা-ত এর ভাবার্থ বাতাস। কারণ, হাওয়া পানিকে চারদিক থেকে ঘিরে আনে। ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখও তাই বলেন। অন্য মতে মেঘ। যাহ্হাক, সওরী ও হাসান এই মতের সমর্থক। ইবনে জরীর এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন। ফার্রা বলেন, মুসিরাত সেই বাদল যা পানিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তা বর্ষিত হয়নি। প্রসিদ্ধ মতে মু'সিরাত বাদল। যেমন আল্লাহ্ বলেন, সেই আল্লাহ্ যিনি হাওয়াকে পাঠান যা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তাকে যেভাবে চান আসমানে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে থরে থরে সাজিয়ে রাখেন। ফলে তুমি দেখতে পাও যে, তার ভেতর থেকে বৃষ্টি বের হয় (সূরায়ে নূর ৪৩ আয়াত)। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও রবীআহ বলেন, সাজ্জাজ এর ভাবার্থ বর্ষণশীল মেঘ। সওরী বলেন, আরাবী ভাষাতে 'সাজ্জ' শব্দটির ব্যবহার প্রচুর অর্থে মশহুর নয়। বরং অবিরাম বর্ষণকে সাজ্জ বলে। এই থেকেই নাবী (সঃ)-এর উক্তি—আফ্-যালুল হাজ্জ আলআ'জ্জ অস্সাজ্জ—অর্থাৎ শরীরের রক্ত বহানো উত্তম হজ্জ। ইবনে কাসীর বলেন, মুস্তাহাজার (প্রদর রোগীর) হাদীসে এসেছে: ইন্নামা আসাজ্জু সাজ্জান অর্থাৎ আমার ঐ রক্ততো খুব ঝরে। এগুলো এর প্রমাণ যে, 'সাজ্জ' শব্দটি অবিরত বর্ষনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লা-হু আ'লাম। তারপর

আল্লাহ্ তাআলা ঐ প্রচুর বর্ষণ দ্বারা মানুষের ও জন্তুদের জন্য আনাজ ও খাদ্যদ্রব্য তৈরী করেন এবং ভূচরদের জন্য তাজা তৃণাদি সৃষ্টি করেন।

জান্নাত এর অর্থ বাগানসমূহ যাতে রকমারি ফল ফলে এবং রং বেরং শস্যাদি উৎপন্ন হয়। যাদের স্বাদ ও গন্ধ বিভিন্ন রকমের হয়। যদিও তারা একই যমীনে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আর যমীনে বহু খেত রয়েছে এবং বাগানও আছে আঙ্গুরের ও শস্যের। আর জোড়া জোড়া ও বেজোড় খেজুরের। যাদের একই রকম পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হয় এবং আমি তাদের মধ্যে কিছুকে কিছুর উপর প্রাধান্য দান করি খাওয়ার স্বাদে। নিশ্চয় এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুদ্ধি রাখে (সূরায়ে রাদ ৪ নং আয়াত)।

আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, শেষ বিচারের দিন কিয়ামতের দিন। যার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করা আছে। যা তার আগেও হবেনা এবং পরেও না। তবে ঐ সময়ের খবর আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানেনা। যেমন তিনি বলেন—'অমা নুআখ্খিরুহূ ইল্লা লি-আজা-লিম মা'দূদ'—অর্থাৎ আমি ঐ প্রতিশ্রুতিকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেরী করে থাকি (সূরায়ে হূদ)। মুজাহিদ বলেন আফ্ওয়াজান এর অর্থ দলে দলে আসবে। ইবনে জরীর বলেন, প্রত্যেক উম্মত তাদের রসূলের সাথে আসবে। যেমন কুরআনে আছে, সেদিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতা সহকারে ডাকবো (সূরায়ে বানী ইস্রাইল)। আবূ হুরাইরার হাদীসে নাবী (সঃ) বলেন, দুই শিঙ্গার ফুঁক দেবার ব্যবধান চল্লিশ। আবূ হুরাইরা বলেন, আমি জানিনা যে, ঐ ৪০ বলতে ৪০ মাস, না ৪০ বৎসর। তারপর আল্লাহ্ তাআলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। পানি পেলে ঘাস যেমন জন্মায় তেমনি মানুষ আবার জন্ম নেবে। মানুষের প্রত্যেক জিনিষটি গলে পচে যায়, কেবল মেরুদণ্ডের একটি হাড় পচে না। ঐ হাড় থেকেই কিয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষের পুনর্জন্ম হবে।

আব্ওয়াব এর ভাবার্থ রাস্তা ও পথসমূহ, যেদিক দিয়ে ফিরিশ্তারা নামবে। আল্লাহ্র এই উক্তি—পাহাড়গুলো মরীচিকার মত হবে—ঐ উক্তির মত যাতে বলা হয়েছে, তুমি পাহাড়গুলো দেখে মনে করবে যে, তা জমে আছে। পক্ষান্তরে তা মেঘের মত অতিক্রম করছে (সূরা আনকাবূত)। অন্য আয়াতে আছে, সেদিন পাহাড়গুলো রঙীন তুলো-ধোনার মত হবে (সূরায়ে ক্বারিআহ)। এখানে ওটাকে সারাব বা মরীচিকা বলা হয়েছে। কারণ, যেকোন দর্শনকারী ঐ পাহাড়গুলো দেখে মনে করবে যে, ওটা মনে হয় কোন জিনিষ। কিন্তু আস্লে ওটা কোন জিনিষই নয়। তারপর তার কোন চিহ্নই থাকবেনা, না আসল। না তার কোন নিদর্শন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, হে নাবী! তারা তোমাকে পাহাড়গুলো

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে? তুমি বলে দাও, আমার প্রভু তাদেরকে উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন। তারপর তিনি তাকে ধুলপাড় সমতল ময়দান বানিয়ে ছেড়ে দেবেন। যার মধ্যে তুমি কোনরূপ উঁচুনীচু ও ঢিবি দেখা পাবে না (সূরায়ে ত্বা-হা)। অন্য আয়াতে আছে—সেদিন আমি পাহাড়গুলো চালনা করবো। ফলে তুমি যমীনকে সমতল ভূমিরূপে দেখতে পাবে। (সূরায়ে কাহ্‌ফ)।

মিরসা-দ্ এর ভাবার্থ শিকারের টকে থাকা। ত্ব-গীন এর ভাবার্থ পাপী ও রসূলদের বিরোধী। মাআ-ব্ এর অর্থ ফেরার জায়গা। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না সে জাহান্নাম পার হোয়ে যাবে। তখন যদি তার কাছে ছাড়পত্র থাকে তাহলে সে মুক্তি পাবে, অন্যথায় আটক পড়বে। সুফয়্যান সওরী বলেন, জাহান্নামের উপরে তিনটি পুল হবে।

আহকাব কালের একটি যুগ। যার সময় নির্ধারণে মতভেদ আছে। আলী (রাযিঃ) একদা হিলাল হাজারীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে (আহকাব এর একবচন) হুকবকে কিভাবে পাও? তিনি বলেন, আশী বছর। প্রত্যেক বছর বার মাসের। প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন হাজার বছরের। আবূ হুরাইরা, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, হাসান, কাতাদাহ প্রমুখ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। সুদ্দী বলেন, সত্তর বছর। ইবনে আম্‌র বলেন, হুকব চল্লিশ বছর। যার প্রত্যেক দিন হাজার বছরের হবে তোমাদের গণনায়। বাশীর ইবনে কা'ব বলেন, আমি শুনিছি যে, হুক্‌ব তিনশো বছরে হয়। যার প্রত্যেক বছর তিনশো ষাট দিন এবং প্রত্যেক দিন হাজার বছরের সমান। আবূ উমামার হাদীসে মরফুভাবে এসেছে, হুক্‌ব হাজার মাসে হয় এবং মাস ত্রিশ দিনে, আর বছর বার মাসে, যা তিনশো ষাট দিনে হয়। ঐ হাজার মাসের প্রত্যেক দিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের হয়। সুতরাং এই হিসেবে এক হুক্‌ব ত্রিশ কোটি বছর হয়। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন, এই দীর্ঘ হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ, এর রাবী কাসেম ও জা'ফর পরিত্যাজ্য। তবে ইবনে উমারের হাদীসে মরফুভাবে এসেছে যে, আল্লাহ্‌র কসম! কেউই আগুন থেকে বের হবেনা যতক্ষণ না সে তাতে 'আহকা-ব্' পর্যন্ত অবস্থান করবে। হুকব আশির কিছু বেশী বছর হয়। যার প্রত্যেক বছর তিনশো ষাট দিনে হয় তোমাদের গণনায় (মুসনাদে বায্‌যার)। সুদ্দী বলেন, আহকাব এর ভাবার্থ সাতশো হুক্‌ব। প্রত্যেক হুক্‌ব সত্তর বছরের। প্রত্যেক বছর তিনশো ষাট দিনের এবং প্রত্যেক দিন হাজার বছরের তোমাদের গণনা অনুযায়ী। মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান বলেন, এই আয়াতটি মনসুখ-রহিত—ফাযূক্ব ফালান নাযীদাকুম ইল্লা আযা-বা—আয়াত দ্বারা। খালিদ ইবনে মাদান বলেন, এই আয়াত এবং ইল্লা মা-শা-আ রব্বুক—আয়াতটি তাওহীদ

বা একত্ববাদীদের জন্য। ইবনে কাসীর বলেন, হতে পারে এই আয়াতটি —লা-য়্যাযূক্বনা ফীহা বারদাঁও অলা শারা-বা—আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তারপর আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অন্য রকমের শাস্তি দিতে পারেন। কাতাদাহ ও রবী ইবনে আনাসও এই মতের সমর্থক।

এরপর আল্লাহ্ বলেন, জাহান্নামীদের দিল ঠাণ্ডা হবেনা এবং তারা পবিত্র পানিও পাবেনা। যদ্দারা তাদের খোরাক হতে পারে। এইজন্য বলা হয়েছে যে, ঐ পানিই গরম ও ফুটন্ত হবে এবং নরকীদের প্রবাহিত পুঁজ তাদের খোরাক হবে। রবী বলেন, হামীম ঐ পানি যা অত্যন্ত গরম এবং গ্যাস্‌সাক সেই হলদে পানি, যা জাহান্নমীদের পুঁজ, অশ্রু ও জখম থেকে বের হোয়ে জমা হবে। তা এত ঠাণ্ডা হবে যে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও দুর্গন্ধের কারণে তাকে তারা পান করতে পারবেনা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ওথেকে বাঁচান—আ-মীন! ইবনে জরীর বলেন, বার্দ বা ঠাণ্ডার ভাবার্থে একটি উক্তি হল ঘুম। মুজাহিদ আবূ উবায়দা ও কাসায়ী থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে।

অতঃপর সৌভাগ্যবানদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়ে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত সম্পদগুলো তাদের জন্য তৈরী কোরে রাখা হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও যাহ্‌যাক বলেন, মাফা-য্ এর ভাবার্থ পার্ক ও বেড়াবার জায়গা। মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন, আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে সফল হওয়া। ইবনে কাসীর বলেন, এখানে অধিক সঙ্গত অর্থ ঐটি, যেটা ইবনে আব্বাস বলেন। কারণ, ওর পরে বাগানাদির উল্লেখ আছে। হাদা-য়িক সেইসব বাগান যেখানে খেজুর প্রভৃতি থাকে। 'কাওয়া-য়িবে-আত্‌রাব' এর অর্থ সুলোচনা রমনী। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, কাওয়া-য়িবের ভাবার্থ সেইসব নারী যাদের স্তন খাড়া, ঝুলে পড়া নয়। কারণ, তারা নবযুবতী ও কুমারী হবে। আত্‌রাব-এর অর্থ সমবয়সী। তারা একই বয়সের হবে। আবূ উমামার হাদীসে নাবী (সঃ) বলেন, জান্নাতীদের লেবাস আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে চমকাবে। একটি মেঘ আসবে এবং চিল্লে বলবে, ওহে স্বর্গবাসীরা, তোমরা কি চাও, আমি কোন্ জিনিষ তোমাদের উপর বর্ষণ কোরবো? তারপর ঐ মেঘ তাদের উপর সমজুটি নবযুবতী বর্ষণ করবে (ইবনে আবী হাতিম)।

ইবনে আব্বাস বলেন, কা'সে-দিহা-ক এর অর্থ শারাবান তহূরায় পরিপূর্ণ পেয়ালা। ইকরিমা বলেন, খাঁটি মদ। মুজাহিদ বলেন, উছলে পড়া পানপাত্র। সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, অনবরত পরিবেশন। তারপর আল্লাহ্ বলেন, ঐ স্বর্গে কোনরূপ আজেবাজে কথা এবং মিথ্যা ও পাপের ভাষা স্বর্গবাসীরা শুনতে পাবে না। বরং ঐ ঘর শান্তিনিকেতন হবে। ওখানকার কোন জিনিষ দোষযুক্ত ও অর্থহীন হবেনা। তারা যে এই প্রতিদান পাবে সে সব আল্লাহ্‌রই বখ্‌শিশ

http://islaminonesite.wordpress.com

হিসাবে পাবে। যা তিনি নিজের দয়ায় অনুদানস্বরূপ দান করবেন। এই দান পর্যাপ্ত, যথেষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে হবে। আরবরা বলে—আ'তা-নী ফাআহ্সাবানী—অর্থাৎ তিনি আমাকে এত দিয়েছেন, যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। এথেকেই বলা হয়—হাসবিয়া-ল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট।

এর পরের আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, তিনি আসমান, যমীন ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তুরই করুণাময় প্রতিপালক। যাঁর করুণা প্রতিটি বস্তুকে ছেয়ে আছে। অতঃপর তিনি বলেন, কোন ব্যক্তিই তাঁকে প্রথমে সম্বোধন করতে সাহস পাবে না, তাঁর অনুমতি ছাড়া। যেমন তাঁরই উক্তি—তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর কাছে কে সুপারিশ করতে পারবে? (আয়াতুল কুরসী)। রূহ শব্দের ভাবার্থে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস বলেন, আদম সন্তানের আত্মাসমূহ। হাসান বলেন, আদম সন্তান। কেউ বলেন, রূহ একটি সৃষ্টিজগৎ। যাকে আল্লাহ্ তাআলা আদম সন্তানের আকৃতিতে পয়দা করেছেন। তা ফিরিশ্তাও নয় এবং মানুষও নয়, কিন্তু সে পানাহার করে। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ এর সমর্থক। কেউ বলেন, ওর ভাবার্থ জিব্রীল। শাবী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও যাহ্হাক একথা বলেন। সূরা শুআরার এই আয়াত—তাকে নিয়ে তোমার হৃদয়ে রূহুল আমীন অবতীর্ণ হয়েছেন। যাতে তুমি ভীতি প্রদর্শনকারীদের মধ্যে হতে পারে—উক্ত মতের সমর্থক। মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান বলেন, রূহ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফিরিশ্তা। ইবনে মসউদ থেকে ইবনে জরীর উদ্ধৃত করেছেন যে, রূহ চতুর্থ আসমানে আছে। তা আসমান, পাহাড় ও ফিরিশ্তাসমূহের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। সে প্রত্যেকদিন বার হাজার বার তসবীহ পড়ে। প্রত্যেক তস্বীহ থেকে আল্লাহ্ একটি ফিরিশ্তা তৈরী করেন। তারা সবাই কিয়ামতের দিনে লাইন দিয়ে আসবে। ইবনে আব্বাস মরফূভাবে বলেন, রূহ হল আল্লাহ্র এক ফিরিশ্তা। তাকে যদি বলা হয় যে, তুমি সাত আসমান ও যমীনকে গিলে ফেল তাহলে সে তাদেরকে গিলে ফেলবে। তার তস্বীহ—সুবহা-নাকা হায়সু কুন্তা (তাবারানী)। এই হাদীসটিও অতি অভিনব। এর মরফূ হওয়াতে সন্দেহ আছে। এটা ইবনে আব্বাসের মওকূফ রিওয়ায়াত। যা ইহুদীদের রিওয়ায়াতের মধ্যে গন্য হয়। আল্লা-হু আ'লাম। উক্ত সমস্ত উক্তির মধ্যে একটি উক্তির উপরেও ইবনে জরীর আস্থা পোষণ করেননি। ইবনে কাসীর বলেন, আমার নিকট সবগুলোই সন্দেহজনক।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, সেদিন রসূলগণ ছাড়া আর কেউ তার সাথে কথা বলতে পারবেনা। স্বওয়া-ব এর ভাবার্থ হক কথা ও সঠিক কথা। ঐ হক কথারই একটি কথা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু। আবূ স্বলিহ ও ইক্রিমা একথা বলেন। আল্লাহ্ বলেন, ঐ দিনটি সত্য। অর্থাৎ দিনটি নিশ্চয়ই সংঘঠিত হবে। ওর সংঘঠনে

কোনও সন্দেহ নেই। অতএব যে চায় সে একটা পথ বানিয়ে নিক। যদ্দারা সে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছুতে পারে। আযাবে-কারীব বলতে কিয়ামতের দিন বোঝায়। কারণ, সংঘঠনের দিক দিয়ে এটা নিকটবর্তী হয়ে গেছে। প্রত্যেক আগমনকারী জিনিষই নিকটবর্তী হয়। সেদিন মানুষের সামনে তার সমস্ত কার্যাবলী ভাল ও মন্দ এবং নতুন ও পুরানো পেশ করা হবে আর বলা হবে যে, দেখ, তুমি এইসব কাজ করেছিলে? যেমন আল্লাহ্ বলেন, তারা তাদের কার্যাবলী সামনে হাযির করা অবস্থায় পাবে (সূরায়ে আলি ইম্রান ৩০ আয়াত)। অন্য আয়াতে আছে—সেদিন মানুষকে তার আগে ও পরে পাঠানো আমলের খবর দেওয়া হবে (সূরায়ে কিয়ামাহ ১৩ আয়াত)।

কাফিররা সেদিন এই আকাংখা করবে যে, হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে মাটি হতাম এবং পয়দা না হতাম! তারা তাদের বদ আমল ও অন্যায় কার্যাবলী এবং আল্লাহ্র শাস্তি দেখে ঐ কথা বলবে। ঐ আমলগুলো মহান ও পূতপবিত্র ফিরিশ্তাগণ লিপিবদ্ধ কোরে রেখেছেন। কেউ বলেন, তারা একথা সেই সময় বলবে যখন তারা জন্তুদের মধ্যে আল্লাহ্র ফয়সালা দেখবে যে, শিংওলী বকরী থেকে শিং-বিহীন বকরী বদলা নিচ্ছে। তারপর—ফয়সালার পর আল্লাহ্ তাআলা জন্তুদের বলবেন, তোমরা মাটি হোয়ে যাও। ফলে তারা মাটি হোয়ে যাবে। তখন কাফিররাও এই আকাংখা করবে, হায়! আমরা যদি ওদের মত মাটি হোয়ে যেতাম তাহলে কতই না ভাল হোত। শিঙ্গা সংক্রান্ত বিখ্যাত হাদীসেও এই বর্ণনা আছে এবং আবূ হুরাইরাহ্ ও ইবনে উমার থেকেও এ ব্যাপারে আ-সা-র বর্ণিত হয়েছে।

ফাতহুল বায়ানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, আমার শক্তি ঐসব জিনিষ তৈরীর চেয়েও বেশী। তাহলে পুনরুত্থানের ব্যাপারটি বেদ্বীনরা অস্বীকার করছে কেন? এখানে জাআলা শব্দের অর্থ নতুন তৈরী করা। মিহাদের অর্থ বিছানা। যেমন আল্লাহ্ বলেন, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন (আল কুরআন)। এখানে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতে যে পারস্পরিক জিজ্ঞাসার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা পুনরুত্থান সংক্রান্ত। তা কুরআন বা মহানাবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নাবীত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কিত নয়। আয্ওয়াজ এর ভাবার্থ নারী ও পুরুষ, কিংবা বিভিন্ন রং অথবা প্রত্যেক সৃষ্টির জোড়া। যেমন ভাল-মন্দ ও ছোট-বড়। সুবাত এর অর্থ আরাম, কিংবা মৃত্যু। কারণ, ঘুমানোও এক প্রকার মরণ। এইজন্য ঘুমকে মৃত্যুর ছোট ভাই বলা হয়। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মতো হয়। পার্থক্য শুধু এতটুক যে, তার দেহ থেকে আত্মা আলাদা হয় না। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ মানুষের আত্মাগুলোকে তাদের মরণের সময় বের করে নেন। আর যারা মরেনা তাদের ঘুমের সময় (সূরায়ে-যুমার

http://islaminonesite.wordpress.com

৪২ আয়াত)। অন্যত্র তিনি বলেন, তিনিই তোমাদেরকে রাতে পুরোপুরি নিয়ে নেন (সূরায়ে আনআম ৬০ আয়াত)।

সাব্‌য়ে শিদাদ-এর ভাবার্থ দৃঢ় ও সাত আসমান। যাতে কালের আবর্তনের কোন প্রভাব পড়েনা। এইজন্য ওর বিশেষণে 'শিদাদ' শব্দ আনা হয়েছে। প্রত্যেক আসমানের দূরত্ব পাঁচশো বৎসরের পথ। সিরাজের ভাবার্থ সূর্য এবং অহ্হা-জ্ এর অর্থ দীপ্তিময়। যাজ্জাজ বলেন, অহ্হাজ এর অর্থ অক্কাদ বা উজ্জ্বল। মুকাতিল বলেন, ওতে চমক ও তাপ দুই-ই আছে। অর্থাৎ ওটা জ্যোতি ও তাপ উভয়ের আধার। মুসিরাত-এর ভাবার্থ মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। সাজ্জা-জ-এর অর্থ মুষলধার বৃষ্টি। হাব্ব বা দানার অর্থ গম ও যব। নাবা-ত্ এর অর্থ ঘাস ও তৃণলতা, যাকে জন্তুরা খায়। আলফাফ্ এর ভাবার্থ ঘন ঘন সারি সারি গাছ। ফার্রা বলেন, যাতে গাছ থাকে তা হল জান্নাত এবং যাতে আঙ্গুর থাকে তাহল ফিরদাওস। এখানে ৯টি দলীল পেশ করা হয়েছে আল্লাহ্র কুদরত ও শক্তি প্রমাণের জন্য। প্রত্যেক দলীলটিই পুনরুত্থানের প্রমাণ।

ফাতহুল বায়ানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এখন তিনি মুমিনদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মাফা-য্ শব্দের 'মিম' বর্ণটি 'মাস্‌দারে-মীমী' বা ধাতুগত মীম। যার আসল হল ফওয বা সাফল্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। এর ভাবার্থ জান্নাত বা স্বর্গ। মুখতারে বলা হয়েছে যে, ফওয এর অর্থ মুক্তি ও ধ্বংশ দুইই। আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হল এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হল সে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হল (সূরায়ে আ-লি ইমরান, ১০৫ আয়াত)। এই আয়াতে ফওজ শব্দের প্রয়োগ দুই অর্থেই হয়েছে।

হাদীকাহ্ সেই বাগানকে বলে যার চারিদিকে প্রাচীর আছে এবং তাতে নানান রকম ফলমূলের গাছও থাকে। আ'না-ব্ এর অর্থ আঙ্গুর ফল। বাগানের পর আঙ্গুরের বর্ণনা, আঙ্গুরের মান বাড়ানোর জন্য করা হয়েছে। কাওয়া-য়িব্ এর অর্থ নবযুবতী যার স্তন চিকন ও গোল হোয়ে উঠে। অর্থাৎ তারা ঐরূপ নারী পাবে যাদের ছাতি গোল ও সামান্য উঁচু হবে। যাহ্হাক বলেন, কাওয়ায়িব এর অর্থ কুমারী এবং আত্‌রাব এর অর্থ সমবয়সী। ইবনে যায়দ বলেন, দিহাক এর অর্থ ছাপাছাপি পেয়ালা। ইবনে আব্বাস বলেন, ভর্তি, উছলে পড়া ও অনবরত পরিবেশিত পেয়ালা। যে পেয়ালায় মদ থাকে তাকে কা'স বলে। খালি পেয়ালাকে কা'স বলা হয় না। জান্নাতে শারাব পান করার সময় কেউ আজেবাজে কথা বলবে না এবং কেউ অপরকে মিথ্যাকথা বলবে না।

এই প্রতিদান আল্লাহ্র উপরে অপরিহার্য নয়। এইজন্য একে 'আতা' বা দান

বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটা তাঁর বিশেষ দান। হিসাব এর অর্থ যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত। এখানে আধিক্য প্রকাশের জন্য মাস্‌দার বা ধাতুজ্ঞাপক বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ইবনে কুতাইবা বলেন, হিসা-ব এর অর্থ প্রচুর। কাল্‌বী বলেন, হিসাব কোরে দিয়েছেন। অর্থাৎ এক পুণ্যের বদলে দশগুণ দান করেছেন? মুজাহিদ বলেন, হিসাব এর অর্থ পরিমাণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ অত দিয়েছেন যতটা দেবার তিনি ওয়াদা করেছেন, কারণ, তিনি একটি নেকীর বদলে দশগুণ বদলা দেবার অঙ্গীকার করেছেন। কাউকে তিনি সাতশো গুণ এবং কাউকে অগণিত ও বেহিসাব দেবার ওয়াদা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব পুরস্কার দেওয়া হবে। (সূরায়ে যুমার ১০ আয়াত)। কেউ কেউ হিসাব শব্দটির 'সীন' বর্ণটিকে তাশ্‌দীদ সহকারে ডবল সীন বানিয়ে হিসসা-ব্ পড়েছেন। যার অর্থ যথেষ্ট হয়।

সেদিন কোন সৃষ্টিজীবের এই সাহসই কুলাবেনা যে, সে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশের ব্যাপারে কোন কথা বলবে। তবে তাঁর অনুমতি পেলে পারবে। এটা হল কাফিরদের ব্যাপারে সুপারিশ। মুমিনরা শাফাআত করবে। 'রূহ' এর ভাবার্থে আটটি উক্তি আছে। এক এই যে, তা হল ফিরিশতা ছাড়া আল্লাহ্র সৈন্য। যাদের হাত ও পা আছে, কিংবা সম্ভ্রান্ত ফিরিশতা অথবা হিফাযতকারী ফিরিশতা। ইবনে নাজীহ্ একথা বলেন। কিংবা ওর ভাবার্থ কুরআন শরীফ। এটা হল যায়দ ইবনে আসলামের উক্তি। আর কিছু আলোচনা আগে হয়ে গেছে। ইমাম শওকানী এখানে কোন উক্তিকেই প্রাধান্য দেননি। ফলকথা সেদিন কিয়ামতের সংকটময় পরিস্থিতির কারণে কোন সৃষ্টিজীবই কথা বলবেনা এবং কারো সুপারিশের জন্য কেউ মুখ খুলবেনা। তবে হাঁ, যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন, সে সুপারিশ করবে এবং সঠিক কথাই বলবে। ওয়াহিদী বলেন, মুমিন ও ফিরিশতারা কথা বলার অনুমতি পাবে তাদের ব্যাপারে, যারা দুনিয়াতে একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছিল। বাইযাভী বলেন, যারা কথা বলবে তারা সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হবে এবং আল্লাহ্র অতি নিকটবর্তী হবে। কিয়ামতের এই দিনটি অতি অবশ্যই সংঘটিত হবে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে যেন ভাল আমল কোরে তার প্রভুর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। কারণ, মন্দ আমল তাকে তাঁর থেকে দূর সরিয়ে দেয়। কাতাদাহ বলেন, মাআ-ব্ এর অর্থ সাবীল বা পথ।

আযা-বে—কারীব এর অর্থ পরকালের শাস্তি। কারণ, প্রত্যেক আগামী বিষয়টি নিকটবর্তী হয়। কাতাহাদ বলেন এর ভাবার্থ দুনিয়ার আযাব। কারণ, এটা হল অতি নিকটবর্তী শাস্তি। সেদিন মুসলমান ও কাফির প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগাম পাঠানো আমল দেখবে যে, তা ভাল ছিল, না মন্দ। হাসান বলেন, মারয়ু

http://islaminonesite.wordpress.com

বা ব্যক্তি বলতে মুমিন বোঝায়। কারণ, সেদিন মুমিন তার আমলগুলো পাবে। থাকলো কাফির, সে তার কোন আমলই পাবেনা। এইজন্য সে মাটি হোয়ে যাবার আকাংখা করবে। এখানে আয়াতটিতে কাফির-এর ভাবার্থ আবূ জাহ্‌ল, কিংবা আবূ সাল্‌মা মাখ্‌যুমী, অথবা ইবলীস মাটি হবার আকাংখা করবে। কিন্তু প্রথমটাই ঠিক। আবূ হুরাইরার হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিনে সমস্ত সৃষ্টিজীবের হাশর হবে। জন্তু-জানোয়ার, পাখী ও প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহ্‌র আযাব আসবে। এমন কি শিংওয়ালা জানোয়ারের কাছ থেকে শিংহীন জন্তুকে বদলা দেওয়া হবে। তারপর তাকে বলা হবে যে, তুমি মাটি হোয়ে যাও। তখন ঐ ব্যাপারটি দেখে কাফিররা বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম! আব্দুবনু হুমাইদ, ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতিম ও বায়হাকী এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

আবুয যিনাদ বলেন, জিনও মাটি হোয়ে যাবে। উমার ইবনে আবদুল আযীয ও মুজাহিদ প্রমুখ বলেন, মুমিন জিন জান্নাতের পার্শ্ববর্তী ময়দানে থাকবে, জান্নাতের ভেতরে নয়। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত বলেন, জিনরাও শাস্তি ও পুরস্কার দুইই পাবে। তাদের মুমিনরা বেহেশতে যাবে এবং কাফিররা জাহান্নামে যাবে মানুষের মতই। একথার উল্লেখ খাতীব বাগদাদী করেছেন।

'ফা-বি আইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান' আয়াতটি একথা প্রমাণ করে।

সংযোজন

এই সূরাটি মক্কী। মক্কা ও বাসরার বিদ্বানদের গণনায় এর আয়াত সংখ্যা একচল্লিশ এবং বাকি অন্যান্যদের গণনায় চল্লিশ। এতে শব্দ আছে একশো তিয়াত্তরটি এবং বর্ণ আছে আটশো ষোলটি। আযাবান কারীরা আয়াতটিতে মতভেদ আছে। এই সূরার নাম দুটি। এক—আস্মা ইয়াতাসা-আলূন বা তাসাউল। এর প্রথম আয়াতে ঐ শব্দ থাকার কারণে। দুই—দ্বিতীয় আয়াতে 'নাবা' শব্দ থাকার কারণে এর নাম সূরা নাবা (বাসায়িরু যাভিত্‌ তাম্‌য়ীয ৪৯৭ পৃঃ)। খাতীবের মতে এতে হরফ আছে সাতশো সত্তরটি। কিন্তু খাযিনে আছে নয়শো সত্তরটি (আলাইক্‌লীল ৭ম খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটি—আন ও মা—অব্যয় দ্বারা গঠিত। হালকা করার উদ্দেশ্যে মা—অব্যয়ের মীমের পর আলিফটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আরাবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে আটটি হরফের পর মা-যে মউসুলার আলিফটি উড়িয়ে দেওয়া হয় ওদের অধিক ব্যবহৃত হবার কারণে। ঐ হরফগুলি এই—আন, মিন, বে, লাম, ফী, আলা, ইলা ও হাত্তা (ফাতহুল আযীয, উর্দু তরজমা, আমপারা ১০-১১ পৃষ্ঠা।

ইমাম হা-কিম ইবনে আব্বাস থেকে বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন সৃষ্টির ইচ্ছাপোষণ করেন তখন বাতাসকে পাঠান। ফলে তা পানিকে ওড়াতে থাকে। পরিশেষে একটি দ্বীপ বেরিয়ে পড়ে। এটাই হল কাবার তলদেশ। তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর ইচ্ছামত লম্বা ও চওড়া যমীন বাড়াতে থাকেন। তখন আবূ কুবাইস পাহাড়ই প্রথম পাহাড় যা যমীনের উপর রাখা হয় (দুররে মনসূর, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)।

দোলনায় কচি শিশুরা যেমন নিশ্চিন্তে ঘুমায় তেমনি যমীনকে আল্লাহ্‌ তাআলা দোলনার মত সমতল বানিয়েছেন। যাতে পাহাড়ের উচ্চতা এবং সমুদ্রের গভীরতার মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। ফলে প্রাণীজগত তাতে নিশ্চিন্তে অবস্থান করতে পারে। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আম্‌র ইবনে আ-স্‌ বলেন, সূর্য চতুর্থ আসমানে আছে (রূহুল মাআনী, আমপারা ৯ম পৃষ্ঠা)।

সুবাত শব্দের অর্থ কাটা ও ছাঁটা প্রভৃতি। ঘুম মানুষের ক্লান্তি দূর করে। মানুষের সমস্ত রকম আরামের মূল এই ঘুম। ঘুম না হলে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে। কখনো সে ঘুমের বড়ি খেতে বাধ্য হয়। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা ঘুমকে ক্লান্তি দূরকারী হিসেবে সৃষ্টি কোরে শুধু মানুষ নয়, বরং সমস্ত প্রাণীজগতের উপরে বিরাট দয়া করেছেন।

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-কে একজন লোক জিজ্ঞেস করেন যে, বিয়ের মজলিস রাতে করা উচিত, না দিনে? তিনি বলেন, রাতে। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা রাতকে লেবাস বানিয়েছেন। এবং বিয়ে করা বিবিকেও আল্লাহ্‌ লেবাস বলেছেন। তাই একটি লেবাসকে অন্য লেবাসের সাথে মিলিয়ে দেওয়া উচিত। ফলে রাতে বিবাহ বাসর হওয়া বাঞ্ছনীয় (ফাত্‌হুল আযীয, আমপারা, ১৪ পৃষ্ঠা)।

এই সূরার ৬ষ্ঠ থেকে ১৬ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নয়টি বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলেছেন। তা হল যমীনকে দোলনা ও পাহাড়কে পেরেক বানানো। মানুষকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করা' আরামের মহা উপাদান ঘুমকে সৃষ্টি করা। রাতকে অনেক কিছুর ঢাকনা ও দিনকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী এবং সাত আসমান ও তাতে জ্বলন্ত-দীপ্যমান সূর্য আর পানিতে পরিপূর্ণ মেঘপুঞ্জ সৃষ্টি করা প্রভৃতি। এ সমস্ত জিনিষ মানুষের উপকারের জন্যই আল্লাহ্‌ তৈরী করেছেন। যাতে মানুষ ওর দ্বারা উপকৃত হোয়ে তার প্রভুর বন্দনা করে এবং তারই সামনে মাথা নত করে। মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, সে লাগামহীন ঘোড়ার মত নিজ ইচ্ছায় যা চাইবে তা করবে। সে যদি যথেচ্ছাচারী হয় তাহলে তাকে তার প্রতিপালকের সামনে একা নির্দিষ্ট দিনে জওয়াবদিহী করতে হবে। উক্ত নয়টি অভিনব বস্তুর

http://islaminonesite.wordpress.com

সৃষ্টি একথা প্রমান করে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে কিয়ামতের সময় পুনরায় সৃষ্টি করতে নিশ্চয়ই সক্ষম।

ঐ নির্দিষ্ট দিনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ১৭ থেকে ২০ নং আয়াতে। শিঙ্গায় ফুঁক দেবার পরই সেদিন মানুষ দলে দলে আসতে থাকবে। নাসায়ী, হাকিম ও বাইহাকীতে বর্ণিত আবূ যরের (রাযিঃ) বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, কিয়ামতের দিনে লোকদেরকে তিনটি দলে জমা করা হবে। একটি দল উদরপূর্ণ-পোশাক পরিহিত-আরোহী অবস্থায়। আরেকটি দল পায়ে হাঁটা অবস্থায় এবং অন্য দলটি মুখ ঘেঁষড়ানো অবস্থায় হাশরের মাঠে জড় হবে (মায্হারী, ১০ম খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

ইবনে মারদোঅয়হে বর্ণিত মুআয ইবনে জাবালের এক প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, দশটি শ্রেণীতে লোকেরা হাশরের মাঠে জড় হবে। তাদের মধ্যে থেকে মুসলমানদের একটি জামাআতকে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর বাকীদের আকৃতি তিনি পাল্টে দিয়েছেন। তাই কিছু লোক বাঁদরের আকৃতিতে, কিছু শূকরের রূপে, কিছু পা উপরে ও মাথা নীচু কোরে মুখ ঘেঁষড়ানো অবস্থায়, কিছু অন্ধভাবে হাতড়ানো অবস্থায়, কিছু কালা ও বোবা অবস্থায়, কিছুর জিব বুকে ঝোলা ও লাল টপকানো অবস্থায়, যাদেরকে সবাই ঘৃণা করবে, কিছুলোক হাত ও পা কাটা অবস্থায়, কিছু লোক আগুনের ফাঁসি কাঠে ঝুলন্তভাবে, কিছু লোক পচা দুর্গন্ধ অবস্থায়, কিছু লোক ভুষা আলকাতরার বর্ম গায়ের চামড়ায় সাঁটানো অবস্থায় জড় হবে।

বাঁদর রূপীগণ কারো দুর্নাম কোরে ঝগড়া সৃষ্টিকারী। শূকরের রূপধারীগণ হারাম খাদ্য গ্রহণকারী। মুখ ঘেঁষড়ানো ওয়ালারা সুদ্খোর। অন্ধগণ তারা, যারা কোন সিদ্ধান্ত নিতে যুল্ম করতো। কালা তারা, যারা নিজের কাজে নিজেরাই খুশী হোত। জিভ ঝুলন্তগণ সেইসব আলিম ও বিচারক যাদের কাজ তাদের কথার বিপরীত হোত। হাত ও পা কাটা তারা যারা নিজেদের পড়শীকে কষ্ট দিত। আগুনের ফাঁসি কাঠে ঝুলন্ত তারা, যারা মানুষের কথা রাজা ও বাদশাহদের লাগাতো। পচা ও দুর্গন্ধ যুক্ত তারা, যারা মনের গোলাম হোয়ে সবরকম মজা লুটতো এবং নিজেদের মালধন থেকে আল্লাহ্ ও ফকীরদের হক মারতো। আলকাতরার জুব্বা পরিহিত তারা, যারা অহংকার ও দাম্ভিকতা করতো (দুররে মনসুর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা, নাযমুদ দুরার ২১ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, কাশশাফ ৪র্থ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, আলকা-ফিশ শা-ফ, ১৮১ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু নেককার ও সৎশীলগণের কেউ পূর্ণিমার চাঁদের মত এবং কেউ তারকার মত চমকাতে থাকবে। কেউ নূরের মেম্বারে বসে থাকবে। কেউ পালঙ্কে, কেউ

মেশক ও যাফ্রানী টিবিতে থাকবে (ফাতহুল আযীর আমপারা ১৮ পৃষ্ঠা)। মোটকথা বিভিন্ন প্রকার লোক বিভিন্ন দলে বিভিন্ন রূপে হাশরের মাঠে জড় হবে।

হাশরের মাঠে বিচারের পর জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে। তাই ২১ থেকে ৩০ নং আয়াতে জাহান্নামের বিভিন্নরকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

জাহান্নামের উপরে একটি পুল আছে। তা প্রত্যেককেই পার হতে হবে। ঐ পুলের বর্ণনায় ফায্ল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এ পুলটির দূরত্ব তিন হাজার বছর। তা চুলের চেয়েও সরু এবং তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। ওর খাড়াই হাজার বছর এবং নামাই হাজার বছর আর সমতায় তা হাজার বছর (ফাতহুল আযীয, আমপারা ১৯ পৃষ্ঠা)।

বাইহাকীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের পুলে সাতটি বাধা আছে। ওর প্রথমটিতে বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে 'লা-ইলা-হা' এর সাক্ষ্য সম্পর্কে। তাতে সে পুরাপুরি পাশ করলে সেটা অতিক্রম কোরে দ্বিতীয়তে পৌঁছুবে। এখানে তাকে নামায সম্পর্কে শুধানো হবে। তা যদি সে পুরাপুরি করে থাকে তাহলে সে তৃতীয়টায় পৌঁছুবে। সেখানে তাকে যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন হবে। এটা পুরাপুরি হলে চতুর্থতে পৌঁছুবে। সেখানে তাকে রোযা সম্পর্কে সওয়াল হবে। এটা পুরাপুরি হলে সে পঞ্চমটায় হাযির হবে। এটাতে তাকে হজ্জ সম্পর্কে প্রশ্ন হবে। এটায় পাশ করলে ষষ্ঠে উপনীত হবে। হেথায় তাকে উম্রার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। এটায় সে ছাড়া পেলে সপ্তমটায় পৌঁছুবে। এখানে তাকে যুল্ম ও অত্যাচার সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। এখান থেকে সে বের হবে, নতুবা তাকে বলা হবে যে, দেখ, তোমার কোন নফল এবাদত আছে কিনা, যদ্দ্বারা ঘাটতি পূরণ করবে। অতঃপর যখন সে এথেকে মুক্ত হবে তখনই সে জান্নাতে যাবে (বাগাভী ও খাযিন ৭ম খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, মায্হারী ১০ম খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, নায্মুদ দুরার ২১ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)।

জাহান্নামীরা জাহান্নামে কতকাল থাকবে সে সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা পাওয়া যায়। ইবনে মসউদের এক বর্ণনায় আছে, জাহান্নামীরা যদি জানতে পারে যে, দুনিয়ার কাঁকর সমান গণনার বছর পর্যন্ত তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে তাহলে তারা খুশী হবে। আর জান্নাতীরা যদি জানতে পারে যে, দুনিয়ার কাঁকর গণনার বছর পর্যন্ত তাদেরকে জান্নাতে থাকতে হবে তাহলে তারা দুঃখিত হবে (বাগাভী ও খাযিন ৭ম খণ্ড, ১৬৭—১৬৮ পৃষ্ঠা, হা-শিয়া সা-ভী ৪র্থ খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা)।

তাম্বীহুল গাফিলীনে আছে, জাহান্নামীরা যখন খুবই পিপাসিত হোয়ে পানি

http://islaminonesite.wordpress.com

চাইবে তখন একটি কালো মেঘ সৃষ্টি হবে। তাথেকে বিরাট উটের আকারে সাপ ও বিছা ঝরতে থাকবে এবং ওরা জাহান্নামীদেরকে চিরে ফেড়ে খাবে। ওদের বিষ এরূপ হবে যে, হাজার বছর ধরে ওর প্রভাব তাদের দেহ থেকে দূর হবে না (ফাতহুল আযীয, আমপারা, ২২ পৃষ্ঠা)।

আবদুবনু হুমাইদ ও ইবনুল মুনযির আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র থেকে বলেন, জাহান্নামীদের ব্যাপারে সূরা নাবার ৩০ নং আয়াত—ফাযূকূ ফালান নাযীদাকুম ইল্লা-আযা-বা—ছাড়া আর কোন কঠিন আয়াত নাযিল হয়নি। তাই আবূ বারযাহ আস্‌লামীর বর্ণনায় আছে, জাহান্নামীদের কোন এক ব্যক্তিকে যদি পূর্ব থেকে বের করা হয় তাহলে সমস্ত পশ্চিমবাসী মারা পড়বে। তেমনি ওদের কাউকে যদি পশ্চিম থেকে বের করা হয় তাহলে ওর দুর্গন্ধের কারণে সমস্ত পূর্ববাসী মারা যাবে (দুরবে মনসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্‌কে অমান্যকারীদের পরিণাম বর্ণনার পর তাঁর মান্যকারীদের পরিণতি কিরূপ হবে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ৩১ থেকে ৩৭ নং আয়াতে। ৩২ নং আয়াতে হাদা-য়িক্ এর উল্লেখ আছে। আরবীতে হাদায়ি-ক্ বলে সেই সব বাগানকে যার চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। বাগানের মধ্যে সবরকম ফল যদিও থাকে তথাপি আঙুরের উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করার কারণ এই যে, ঐ ঘেরা বাগানে হয়তো কোন বাংলো থাকবে না। বরং আঙুর গাছেরই ভারার ছায়াতলে জান্নাতীরা গল্পগুজব করবে। সেই সময় তাদের সাথে তাদের সমজুটি নব যুবতীরাও থাকবে।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, জান্নাতী নর ও নারীদের বয়স তেত্রিশ হবে। কারণ, এই বয়সেই সবরকম পূর্ণাঙ্গতা ও ফূর্তি বেশী হোয়ে থাকে। তাফসীরে যা-হিদী ও তাফসীরে ওয়া-হিদীতে আছে যে, জান্নাতী নারীরা সতের-আঠার বছরের হবে। কারণ, এই বয়সেই মেয়েদের সৌন্দর্য চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। তারপরেই তাতে অবক্ষয় শুরু হয়। সন্তান জন্ম দেওয়া ও সন্তানকে দুধ দেবার কারণে তাদের স্তন ঝুলে পড়ে। তাদের নারীত্ব-মেজাজের সজীবতা এই সময় কিছুটা শুষ্কতার কারণে পরিমিত পর্যায়ে থাকে। এ সময় তাদের দেহের সুঠামভাব ও লাবণ্য এবং অবলাভাব ও সারল্য তাদের প্রতি আসক্তদের নিকট বাঞ্ছনীয় হয়।

এরই বিপরীত নরগণ! কারণ, বুদ্ধিতে পরিপক্ক ও কাজে অভিজ্ঞ হওয়াটা পুরুষদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ও পছন্দনীয়, যা পাকা ফলের মত। কারণ, পাকা ফল ভাল হয়। আর নারীরা সেই কাঁচা ফলের মত, যা কাঁচাতেই সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়। যেমন শসা ও কাঁকুড় প্রভৃতি (ফাতহুল আযীয আমপারা, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)।

৩৬ নং আয়াতে জান্নাতের সম্পদগুলোকে প্রতিদান ও অনুদান দুইই বলা হয়েছে। অথচ একই জিনিষ দুরকম কি করে হতে পারে? তাই এর উত্তরটা জেনে রাখা ভাল। তা হল এই যে, মানুষ ভাবে যে, সে মেলাই নেকী করেছে। তাই সে তারই বিনিময়ে জান্নাত পাবে। মানুষের চিন্তার দিক দিয়ে জান্নাতপ্রাপ্তি প্রতিদান। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কারণ, একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা এবং জাহান্নাম থেকে তাকে বাঁচাতেও পারবেনা। এমন কি আমাকেও না। তবে একমাত্র আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া (মুসলিম, মিশকাত, ২০৭ পৃষ্ঠা)। এদিক দিয়ে জান্নাতপ্রাপ্তি প্রতিদান নয় বরং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুদান।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, সেদিন কাফিররা পছতে কূল পাবে না। তাই কাফিরদের ঐ করুণ অবস্থার কথা জেনে আল্লাহ্‌র বান্দারা দুনিয়াতে সতর্ক হবে না কি? এ কথাটাই বলা হয়েছে শেষ আয়াতে।

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুবাদকের সংযোজনের প্রমাণপঞ্জী (আরাবী তাফসীরসমূহ)

১। তাফসীর ইবনে কাসীর, রিয়ায ছাপা। ২। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর তাফসীর কাবীর, আ-মিরাহ শারফিয়্যাহ্ মিসরী ছাপা, ১৩২৪ হিজরী সংস্করণ। ৩। তাফসীরে আবুস সঊদ। পূর্বোক্ত তাফসীরে কাবীরের টীকায় মুদ্রিত। ৪। ইমাম হুসাইন ইবনে মসউদ বাগাভী (মৃত ৫১৬ হিঃ) এর তফসীর মাআ-লিমুত তানযীল। এটি নিম্নোক্ত তফসীরে খাযিনের টীকায় মুদ্রিত। ৫। আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ খাযিন এর লুবা-বুত তা-ভীল ফী মাআ-নিত তান্যীল ওরফে তাফসীরে খাযিন। আওক্বাদুল্ ইল্মিয়্যাহ, মিসর ছাপা। ৬। মজমূআহ তফসীর ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ। বোম্বাই ছাপা, ১৩৭৪ হিঃ সংস্করণ। ৭। ইমাম ইবনুল কাইয়িমের (মৃত ৭৫১ হিঃ) আত্তাফ্সীরুল কাইয়িম। মক্কা ছাপা, ১৯৪৯ সংস্করণ। ৮। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর আদ্দুররুল মানসূর ফিত তাফ্সীর বিল্মা-সুর। দা-রুল মা'রিফাহ্, বেরুত ছাপা। ৯। আল্লামা মাজ্দুদ্দীন ফীরোযাবাদীর বাসা-যিরু যাভিত্ তাম্যীয ফী লাতা-য়িফিল কিতা-বিল আযীয। কায়রো ছাপা, ১৩৮৪ হিঃ সংস্করণ। ১০। আল্লামা উমার ইবনে মুহাম্মাদ নাসাফীর মাদা-রিকুত তানযীল। হুসাইনিয়্যাহ মিসরী ছাপা, ১৩৪৪ হিঃ সংস্করণ। ১১। আল্লামা মাহ্মুদ ইবনে উমার যামাখ্শারী (মৃত ৫২৮ হিঃ) এর আল্ কাশ্শা-ফ আন গাওয়া-মিযিত তানযীল ওয়া উয়ুনিল আক্বা-ভীল ফী উজুহিত্ তা'ভীল—ওরফে তাফসীর কাশ্শাফ। মাকতাবাহ তুজ্জা-রিয়্যাহ কুবরা মিসর ছাপা, ১৩৫৪ হিঃ সংস্করণ। ১২। আল্লামা ইবরাহীম ইবনে উমার আল বুকায়ী (মৃত ৮৮৫ হিঃ) এর নায্মুদ্ দুরার ফী তানা-সুবিল আয়া-তি আস্সুঅর। দায়িরাতুল মাআ-রিফ, হায়দরাবাদ ছাপা, ১৪০২ হিঃ সংস্করণ। ১৩। আল্লামা আহমাদ সা-ভীর হা-শিয়াতুস্ সা-ভী আলা-তাফসীরিল জালা-লাইন। মাত্বাআতুল ইস্তিক্বা-মাহ, মিসরী ছাপা, ১৩৫৩ হিঃ সংস্করণ। ১৪। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথীর তাফসীরে মায্হারী। নদ্ওয়াতুল মুসান্নিফীন দিল্লী ছাপা। ১৫। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী শওকানী (মৃত ১২৫০ হিঃ) এর ফাতহুল কাদীর আলজা-মি বাইনা ফান্নাইর রিওয়ায্যাতি অদ্দিরা-য়াতি মিন ইল্মিত্ তাফসীর। দারুল ফিক্র, বেরুত ছাপা। ১৬। সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলুসী (মৃত ১২৭০ হিঃ) এর রূহুল মাআ-নী ফী তাফসীরিল কুরআ-নিল আযীম অস্সাব্য়িল মাসা-নী। মুনীরিয়্যাহ্ মিসরী ছাপা। ১৭। আল্লামা সুয়ূতীর লুবা-বুন নুকুল ফী আস্বা-বিন নুযুল। দা-রুল মা'রিফাহ, বেরুত ছাপা, ১৪০৩ হিঃ

সংস্করণ। ১৮। আল্লামা আবদুল হক দেহলভীর আলাইক্বলীল আল-মাদা-রিকিত তানযীল। ইকলীলুল মাতা-বি' বাহরা-ইচ ছাপা।

উর্দু তাফসীর : ১৯। আল্লামা শাহ আবদুল আযীর (মৃত ১২৩৯ হিঃ) রচিত ফার্সী তাফসীর ফাতহুল আযীর-এর উর্দু অনুবাদ। কাইয়ূমী কানপুর ছাপা, ১৩৭৪ হিঃ সংস্করণ। ২০। মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী প্রণীত তাফসীরে মাজিদী, তাজ কোম্পানীর ছাপা। ২১। আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ কুতুব রচিত ফী যিলা-লিল কুরআ-ন এর উর্দু তরজমা, দিল্লী ছাপা। ২২। মাওলানা শাম্স পীর যা-দার দা'অতুল কুরআ-ন্, বোম্বাই ছাপা।

http://islaminonesite.wordpress.com